শরীফুল হাসান

মৃত্যুফাঁদ



পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে এসেছিল ওরা পাঁচজন। গাইডের সাথে চলে আসে এমন এক জায়গার খোঁজে, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ। পাহাড়ের গুহায় আটকে থাকা প্রাচীন কোনো এক শক্তির মুখোমুখি হয় ওরা। অন্ধকারে ওদের তাড়া করে বেড়ায় কে?

বাঁচার লড়াইয়ে নেমে দেখতে পায় এই লড়াই শুভ-অশুভর লড়াই-ই শুধু নয়, এই লড়াই আরও অন্য কিছুর। আদ্রিতা, কঙ্কা, ফারহান, রবি আর সৌমিক কী এই লড়াইয়ে জিততে পারবে?

মৃত্যুফাঁদ! শরীফুল হাসানের লেখায় এই অদ্ভুত রোমাঞ্চের জগতে আপনাদের স্বাগতম!

মৃত্যুফাঁদ

মৃত্যুফাঁদ

শরীফুল হাসান



নালন্দা

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

মৃত্যু ফাঁদ	শরীফুল হাসান
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৩
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৫০০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

©	Shariful Hasan
Mrittu Fad	
(A Thriller Book By)	Shariful Hasan
Cover Design	Tania Sultana
Title	Suronjit Tanu
First Pubished	February 2023
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	500.00 Tk only
ISBN	978-984-97154-3-6
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

মনোয়ারুল ইসলাম

সুলেখক সুহৃদ

এই গল্পের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক।
বাস্তবের সাথে যদি কোনো মিল থেকে থাকে,
তাহলে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং কাকতালীয়।

প্রারম্ভ

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পায়ের নিচে পিচ্ছিল কাদামাটি, সেই কাদামাটির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে ধারালো পাথরের টুকরো। তাতে পা কেটে যে রক্ত বেরোচ্ছে সেটা পায়ের তলায় ঘন তরলে হাত দিয়েই বুঝেছে। এই পা নিয়ে হাঁটা যাবে না। অবশ্য হাঁটার জায়গাও নেই। হামাগুড়ি দিয়ে যতটা এগোনো যায়, চেষ্টা করে দেখবে। এমনিতেই জামা-কাপড়ের অবস্থা ভালো না। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে গিয়ে আরও ছিঁড়ে যাচ্ছে। কান্না পাচ্ছে নিশার। কিন্তু কাঁদলে চলবে না। যেভাবেই হোক বেরোতে হবে।

পরনের জিন্সের প্যান্ট পানিতে ভিজে ভারী হয়ে গেছে। সামনের জায়গাটা যেভাবে চাপা হয়ে আছে, তাতে মনে হচ্ছে পরনের এই জিন্সের প্যান্টটুকুও খুলে ফেলা দরকার। না হলে অতি চাপা এই জায়গাটা গলে বেরোতে পারবে না। অবশ্য এটাও নিশ্চিত নয়, এইটুকু জায়গা পার হলে সামনে কী আছে? সামনে হয়তো আর এগোনোর পথ নেই। আবার পেছনে ফিরতে হতে পারে। বড় করে নিঃশ্বাস নিতে গিয়েও নিল না। দম রাখতে হবে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কেটে ছড়ে গেছে। সেসব জায়গায় প্রচণ্ড জ্বলুনি হচ্ছে। কনুই দিয়ে ঘষে ঘষে অল্প অল্প করে এগোচ্ছে। মাথাটা ঘষা খাচ্ছে উপরের অসমান, ধারালো পাথরের ছাদে।

ঘন অন্ধকারে কিছু দেখার উপায় নেই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। বাইরের বিপুলা পৃথিবীটা হঠাৎ করেই কোনো স্বপ্নদৃশ্যে দেখা স্বর্গোদ্যানের মতো লাগছে। এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারলে জীবনটাকে উপভোগ করবে, তবে কখনো ঝুঁকি নেবে না। অল্প একটু অভিজ্ঞতার জন্য সামান্য একটু ঝুঁকি যে জীবনকে হুমকিতে ফেলে দিতে পারে এটা কল্পনাই করেনি নিশা। এখন এমন একটা পর্যায়ে আছে, সামনে-পেছনে সবখানেই ঝুঁকি। বেঁচে ফেরার আশাটা দুরাশা মাত্র।

নিশার বয়স আঠারো পার হয়েছে কিছুদিন আগে। ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছে ঢাকার একটা নামকরা কলেজে। কলেজে উঠেই মোটামুটি পাখা গজিয়েছিল। সারাদিন বন্ধু, আড্ডা, গ্রুপ চ্যাট, আস্যাইনমেন্ট আর প্রেম। এসব করতে করতে হাপিয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল একটা ছুটি দরকার। ছোটখাটো একটা ছুটি। অন্য সবাই যেভাবে ছুটি কাটায় তেমন ছুটি নয়, একটু ভিন্ন ধরনের ছুটি।

ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে আসার কথা শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল যারা, তারা কেউই আসেনি। মেয়েদের কেউ তো নয়ই। শুধু নিশা এসেছে, সাথে রাকিব আর আরশাদ। একা একটা মেয়ে হয়ে দুজন ছেলের সাথে এতদূর চলে আসাটা এই যুগেও অনেকটা অস্বাভাবিক। কিন্তু নিশার কিছু করার নেই। সে আসবেই। তার পরিবারের লোকজনের আপত্তি করার কিছু নেই। বাবা-মা ডিভোর্সড। নিশা থাকে বাবার সাথে। তিনি আকাশে আকাশে বিমান নিয়ে উড়ে বেড়ান, দেশ থেকে দেশান্তরে। মায়ের কাছ থেকে অনুমতি চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। মা কখনই অনুমতি দিতেন না। তাই বলা যায় কাউকে না বলেই চলে এসেছে নিশা। বাবার সাথে মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলতে পারলেই হলো। বনানীতে যে ফ্ল্যাটে থাকে, সেখানে সে একাই থাকে বলা যায়, বাবা দেশে থাকলে আলাদা কথা। কাজের একটা বুয়া মাঝে মাঝে এসে কাজ করে দিয়ে যায়। চাইলে মা'র কাছে গিয়ে থাকতে পারত। কিন্তু বাবা-মার সম্পর্ক ছেদের পেছনে সে সবসময় মাকেই দায়ী করে এসেছে। বাবা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হয়তো সেভাবে সময় দিতে পারেননি, কিন্তু মা'ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। যেটা নিশা কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি। তাই সে বাবার সাথে থেকে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল, মা'র জন্য এটাই ভালো হয়েছে। নতুন সংসার শুরু করার সময় পুরানো পরিবারকে টেনে আনা মায়ের জন্য হয়তো সুখকর হতো না।

এসব ভাবতে ভাবতে মা'র মুখটা মনে পড়ল। হঠাৎ করেই মা'র জন্য তার বুকের মধ্যে কেমন অস্থিরতা তৈরি হলো। ইচ্ছে করছিল এখনই মা'র সাথে কথা বলে। মা'র সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছে, দেখা করতে এলে দেখা করেনি, কথা বলেনি। আরেকবার সুযোগ পেলে মাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত। কিন্তু সে সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে?

আরশাদের কী দশা হয়েছে সেটা দেখেছে নিশা, নিজের চোখে। সেই ভয়ংকর দৃশ্য কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। ঐরকম একটা দৃশ্য দেখার পর কেউই নিজেকে স্থির রাখতে পারবে না। রাকিব তো তার বয়সি ছেলেই। তাকে একা রেখে রাকিবের পালানোটাতে তাই মোটেই মন খারাপ হয়নি নিশার। আগে নিজের প্রাণ বাঁচানো জায়েজ। কিন্তু রাকিব যে কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল, নিশা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। চরম বিপদের মুখে সেই রাকিবই কথাগুলো বেমালুম ভুলে গেছে, জীবন বাঁচাতে তাকে ছেড়ে পালিয়েছে। পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে কি না সন্দেহ আছে। কালো অন্ধকার এই জায়গাটায় যে মৃত্যু চিৎকারটি কিছুক্ষণ আগে হাড়ে কাঁপন জাগিয়েছে, সেটা যে রাকিবের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ চিৎকার শোনার পর থেকে নিজের প্রাণ বাঁচানোর অস্থিরতা আরও বেশি করে টের পেয়েছে। আরশাদ, রাকিব কেউ আর বেঁচে নেই। সে নিজেও এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে না।

নিশা আরেকটু এগিয়ে গেল। এক হাত সামনের অন্ধকারের দিকে বাড়ালো, হাতে কিছু আটকাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সামনে ফাঁকা জায়গা আছে। আলোর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। একটু আলো হলে...

পেছনে কোথাও পাথর গড়ানোর শব্দে থমকে গেল। একদম স্থির হয়ে গেল। নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। সামান্য একটু শব্দেও প্রাণ যেতে পারে। মাথার চুল বেয়ে কিছু একটা উঠছে। সম্ভবত কোনো পোকামাকড়। তেলাপোকা, চেলা এই জাতীয় প্রাণীগুলোকে দেখলেই গা রিরি করে ওঠে। এটাও নিশ্চয়ই ঐ জাতীয় কোনো পোকামাকড় হবে। মাথার চুল থেকে কপাল বেয়ে, গাল বেয়ে সেটা টি-শার্টের ভেতরে ঢুকে গেল। কিলবিল করতে করতে পোকাটা শরীরের আনাচে-কানাচে হাঁটছে। দমবন্ধ করে আছে নিশা। কিন্তু পারল না বেশিক্ষণ। হাত দিয়ে ঠেসে ধরল পোকাটাকে। পোকাটার নড়াচড়া বন্ধ হয়েছে, মরে গেছে নিশ্চয়ই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েই টের পেল ভুল হয়ে গেছে। হাতের নিচ থেকে একটা পাথরের টুকরো গড়িয়ে পেছনের দিকে নামছে। আর তাতেই পুরো অন্ধকার জুড়ে আলোড়ন শুরু হলো যেন। চারপাশ থেকে শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে।

নিশা প্রাণপণ সামনে এগোতে থাকল। দুহাতে খামচে ধরে সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করছে। আলোর চিহ্ন চোখে পড়ল এই সময়। একই সাথে টের পেল তার পায়ে খসখসে স্পর্শ। আতঙ্কে গতি বাড়াল। খসখসে স্পর্শটা তাকে টেনে পেছনের দিকে নিতে চাইছে। অনেক জোরে টানছে। কিন্তু বাঁচার তাগিদে নিশা আরও জোরে এগোলো সামনের দিকে। টের পেল শরীরের নিচে এখন আর কিছু নেই।

সে এখন ভাসমান।

ভাসতে ভাসতে পড়ছে। কোথায় পড়ছে কোনো ধারণা নেই। একপাশের উঁচু দেওয়ালের ছোট ছিদ্র থেকে সূর্যরশ্মি আলোকিত করেছে সামান্য কিছুটা অংশ।

খুব জোরে মেঝেতে পড়েছে নিশা। খুব বেশি উপর থেকে পড়েনি। ছয়-সাত ফুট উঁচু হতে পারে। মেঝেতে পড়েই নিশা টের পেল তার পিঠের দিকে কট করে একটা শব্দ হয়েছে। সম্ভবত ভেতরের কোনো হাড় ভেঙে গেছে। মাথাটা বাড়ি খেয়েছে একটা পাথরের সাথে। সেখানে ফেটে গেছে। মেঝের সাথে একদম আটকে গেছে সে। নড়াচড়ার শক্তি নেই।

পড়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল, এখন যন্ত্রণাটা নেশার মতো হয়ে গেছে যেন, চোখ খোলা রাখতে পারছে না নিশা। ডানে-বামে তাকাচ্ছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সেই শক্তিটাই তার নেই। একপাশের দেওয়ালে সরু ছিদ্র দিয়ে যে সূর্যরশ্মি আসছে সেদিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে। চিৎকার করার শক্তিও নেই। যে গর্তটায় পড়েছে কোনোমতে চোখের কোণা দিয়ে দেখল।

অজস্র কঙ্কাল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ঠিক তারই মতো ভাগ্যহীন শিকার।

কখনো কল্পনা করেনি মৃত্যু এরকম হতে পারে। যে গর্তের কার্নিশ থেকে এখানে পড়েছে সেখানে তাকাল। ভয়ংকর, বীভৎস একটা মুখ দেখা যাচ্ছে সেখানে। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শিকারকে অসহায় অবস্থায় পেয়েছে। যেকোনো সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এখানে আসার আগে স্থানীয় এক বৃদ্ধ বলেছিল, এখানে দৈত্য-দানো থাকে। সে কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি কেউ। এই আধুনিক যুগেও এসব কেউ বিশ্বাস করে!

এ কি সত্যিই সেই দৈত্য-দানো, রাক্ষস! মানুষখেকো প্রাণী!

নিশা চোখ বুজে আছে। চোখ বুজেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে চায়। বীভৎস সত্তাটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠিক তার পাশের জায়গাটায়। চুপচাপ শুয়ে আছে নিশা। টের পাচ্ছে খসখসে একজোড়া হাত, ধারালো নখ তার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। কী করতে চায় তাকে নিয়ে? হাতটা তার সারা শরীর পরখ করে দেখছে যেন। এমন সব জায়গায় হাত পড়ছে যে নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠছে নিশা। কিন্তু প্রতিরোধ করার সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট নেই শরীরে। সারা শরীর হাতড়ে মুখের উপর স্থির হলো হাতটা। গাল, ঠোঁট, নাক আর কপালে স্পর্শ করল। নিশার মনে হচ্ছিল তাকে মেপে নিচ্ছে যেন, পরখ করে নিচ্ছে।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পর গলার কাছে এসে ধারালো নখের খসখসে হাতটা থামল। নিশার শ্বাস আটকে আছে। সে চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু তার ঘাড় ভাঙার শব্দটা ভেতর থেকে আসা চিৎকারটাকে আটকে দিল। অন্ধকার সেই গর্তে, আরও অনেক কঙ্কালের সাথে নতুন আরেকটা মৃতদেহ যোগ হলো কঙ্কালে পরিণত হওয়ার জন্য।



ভোরের নতুন রোদে চোখ মেলল আদ্রিতা। জানালাটা খুলল, বাইরে থেকে আসা স্বচ্ছ বাতাস ভেতরে ঢেউ খেলে বয়ে গেল যেন। অনেকগুলো বছর পর ভোর দেখা। এমন না যে সে সারারাত জাগেনি, কিন্তু আজকের অনুভূতিটা অন্যরকম। বুকের মধ্যে কীসের যেন একটা আনন্দ খেলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে মুক্ত, স্বাধীন। তাকে আর ঢাকা নামক কোনো খাঁচায় ফিরে যেতে হবে না। এখানে, এই সবুজ আর স্বচ্ছ প্রকৃতির মাঝে সে মুক্ত, স্বাধীন। দলবল নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবে।

আদ্রিতার কাঁধে মাথা রেখে যে মেয়েটা এখনও ঘুমাচ্ছে ওর নাম কঙ্কা। শ্যামলা এই মেয়েটার বুক ভরা সাহস, আর চঞ্চলতায় মেয়েটা চড়ুই পাখিকেও হার মানায়। সারাক্ষণ কিচিরমিচির করতেই থাকে। ওর কারণেই এতদূর আসা। না হলে আদ্রিতা এসব ঘোরাঘুরির মধ্যে নেই।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনেই ওর সাথে পরিচয় হয়েছিল। প্রথম পরিচয়েই বুঝেছিল কঙ্কার সাথে তার বন্ধুত্ব হবে। সেটা হয়েছিল। সেই সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল আরও তিনজনের সাথে। পুরো ক্যাম্পাসে তাদের পাঁচজনের একটা দল। সারাক্ষণ হইচই, আনন্দ-ফুর্তি আর পড়াশোনা, সব একসাথে।

বন্ধুদের মধ্যে বাকি তিনজন হচ্ছে ফারহান, রবি আর সৌমিক। তিনটা ছেলে আর দুটো মেয়ের একটা দল থাকলে সেখানে যে-কেউ যে-কারও প্রতি দুর্বল হবে এটাই স্বাভাবিক এবং একসময় দলটা ভেঙে যাবে, এরকমটাই সাধারণত হয়ে আসছে। কিন্তু ফারহান, রবি আর সৌমিককে নিয়ে এই দুশ্চিন্তাটা আদ্রিতা আর কঙ্কার মধ্যে কাজ করে না। ওরা প্রেম-ভালোবাসা নামক ব্যাপার-স্যাপার থেকে অনেক দূরে থাকে। জীবনটাকে উপভোগ করতে হলে যে প্রেম-ভালোবাসা একটা বড় বাধা, এটা ওরা স্বীকার করে নিয়েছে এবং এজন্যই এখন পর্যন্ত দলটা টিকে আছে।

কঙ্কার বাবা-মা আছেন। ভদ্রমহিলার সাথে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। বেশ আধুনিক মানুষ। কঙ্কার উপর কোনোকিছু চাপিয়ে দেননি। বরং ছেড়ে দিয়েছেন। কঙ্কার বাবা বেশিরভাগ সময় বিদেশেই থাকেন, জাহাজে চাকরি করেন। বিদেশি জাহাজে কাজ করেন ছয় মাসে এক-দুবার দেশে আসার সুযোগ পান। কঙ্কার কোনোকিছুতেই নাক গলান না ভদ্রলোক। বলা যায় মা আর বাবার আদরে আদরে মেয়েটা একদম দুরন্ত হয়েছে। অন্যদিকে আদ্রিতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। তাকে পদেপদে সব কাজের জবাবদিহি করতে হয়। বাবা মারা গেছেন অনেক আগে। মা, সুমাইয়া বেগম, অনেক কষ্টে তাকে বড় করেছেন। চাকরি করেছেন, বাজার করেছেন, মেয়েকে পড়িয়েছেন। কোথাও ছাড় দেননি। চাকরিতে উন্নতি করেছেন বেশ, এখন ভালো বেতন পান। আদ্রিতাকে এখন টাকার জন্য চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু স্বাধীনতার বড় অভাব। ইচ্ছে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। কিন্তু পছন্দের সাবজেক্ট না পাওয়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছে। এতে অবশ্য ভালোই হয়েছে বলে মনে হয় আদ্রিতার কাছে। এখানে ভর্তি না হলে এত ভালো বন্ধু কোথায় পেত!

ডানদিকের সিটগুলোয় ফারহান আর রবি পাশাপাশি বসেছে, সৌমিক বসেছে সামনের সিটে। ওরা তিনজনই গভীর ঘুমে মগ্ন। জানালা দিয়ে আসা বাতাসে কঙ্কার চুলগুলো উড়ে এসে পড়ছিল আদ্রিতার মুখের উপর। খুব সাবধানে সরিয়ে দিচ্ছিল চুলগুলো, আবার যেন ঘুম না ভাঙে। প্রায় সারারাত সবাই মিলে গল্প করেছে, হেসেছে। পাশের সিটের যাত্রীদের বিরক্তির কারণ হয়েছে। কিন্তু কঙ্কা মেয়েটাই এমন, নিজের মতো করে ভাবে। কে কী ভাবছে, তাকে কেউ খারাপ ভাবছে কি না এগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে না।

এরকম একটা ট্যুর দেওয়ার স্বপ্ন অনেককাল ধরেই ছিল আদ্রিতার। শুধু সাহস ছিল না। মাকে একা ফেলে সে কোথাও যায়নি কখনো। প্রতিরাতে মা মাথায় হাত বুলিয়ে না দিলে তার ঘুম আসে না। অথচ আজ দিব্যি সে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে চলে এসেছে। সেটাও একদিন-দুদিনের জন্য নয়। পুরো সাতদিনের জন্য। বলতেই হবে সুমাইয়া বেগম বুকে পাথর বেঁধে তাকে পাঠিয়েছেন। ছেলেদের অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। এই বয়সের ছেলেরা অ্যাডভেঞ্চার করবে, এটাই স্বাভাবিক।

ফারহান, রবি আর সৌমিকের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে আর দুষ্ট হচ্ছে ফারহান। ওর মাথায় নানা ধরনের দুষ্ট বুদ্ধি চলতেই থাকে। এই ট্যুরের আইডিয়াটাও ওর। রবি বই পড়ুয়া ছেলে, কথা কম বলে। মাথাভরতি লম্বা

চুল, গানের গলা ভালো। সাথে করে ছোট একটা উকেলেলে নিয়ে এসেছে। তবে বাজানোর সুযোগ পায়নি। সুযোগ পেলেই বাজাবে। সৌমিক হচ্ছে বুদ্ধিমান ছেলে। সবকিছুতেই ওর খুব হিসেব-নিকেশ। কোথাও সিনেমা দেখতে যাওয়া, খেতে যাওয়া কিংবা এই ট্যুরের খরচাপাতি কেমন হবে, কে কত খরচ করবে, এসব দায়িত্ব সৌমিকের উপর। ওর বাবা বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় পদে চাকরি করে। ফারহানের বাবা ব্যবসায়ী, আর রবির বাবা সরকারি চাকরি করেন, ওর পরিবার থাকে খুলনায়।

ট্যুরের আইডিয়া ফারহানের হলেও ট্যুরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই প্ল্যান করেছিল সৌমিক। কিন্তু আদ্রিতা জানে সৌমিকের প্ল্যানমতো কিছু হবে না। ফারহান এরমধ্যে নাক গলাবে এবং যেখানে যেখানে ওদের যাওয়ার কথা নয়, যেখানে থাকার কথা নয়, ওরা সেখানেই যাবে, থাকবে। এসব ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত আদ্রিতা আর কঙ্কা। ভালোয় ভালোয় সব শেষ করে ঢাকায় ফিরতে পারলেই হয়।

ফারহান কোন ফাঁকে ঘুম থেকে উঠে গেছে টের পায়নি আদ্রিতা, সে জানালা দিয়ে বাইরের সুন্দর দৃশ্য দেখাতেই ব্যস্ত ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ফারহান এরমধ্যেই ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে সবার ঘুমন্ত অবস্থার ছবি তুলছে। আদ্রিতাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখে একটু বিরক্তই হলো যেন। ইশারা করল যেন চোখ বুজে থাকে, কিন্তু ওর দিকে চোখ পাকাল আদ্রিতা।

কাল রাত থেকে ছবি তোলা শুরু করেছে ফারহান। ট্যুর শেষ হতে হতে লক্ষ লক্ষ ছবি তোলা হয়ে যাবে, মনে মনে ভাবল আদ্রিতা। বাসের লোকজনের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। বান্দরবান শহরের আগে আগে কেউ কেউ নামছে। এই লোকগুলো এখানকার স্থানীয় বাঙালি। অনেক বছর ধরে এখানেই থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে চট্টগ্রাম আর কক্সবাজার যায়।

কঙ্কার ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভাঙতেই ফারহানকে দেখে ভেংচি কাটল। তারপর গুঁতো দিল আদ্রিতাকে।

'তুই আমাকে ডাকলি না কেন?' অনুযোগের সুরে বলল কঙ্কা।

'দেখলাম কত আরাম করে ঘুমাচ্ছিস, তাই আর ডাকলাম না।'

'আমি কি মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছিলাম?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল কঙ্কা।

হাসল আদ্রিতা, কিছু বলল না। এতে বেশ দ্বিধান্বিত হয়ে গেল কঙ্কা। কিন্তু সেও কিছু বলল না। ফারহানের দিকে তাকাল। সে এখন তার বাকি দুই বন্ধুর ঘুমন্ত মুখের ছবি তুলছে। দুজনের মধ্যে রবি বেশ নরম সুরে নাক ডাকছে।

বাস মাঝে মাঝে থামছে লোক নামানোর জন্য। সকাল আটটার মতো বাজে এখন। বান্দরবান শহর খুব কাছেই।

রবি আর সৌমিকও ঘুম থেকে উঠে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। ওদেরকে ঘুমন্ত অবস্থার ছবিগুলো দেখিয়ে খুব হাসছিল ফারহান, যা বাকি দুজনের কারও খুব একটা পছন্দ হচ্ছিল না। কিন্তু কিছু করার নেই। ফারহান এরকমই। ছবিগুলো মুছে দেওয়ার জন্য খুব বেশি চাপাচাপি করল না দুজনের কেউ। তাতে ছবিগুলো ফেসবুকে আর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট হয়ে যেতে পারে।

অল্প সময়ের মধ্যেই বান্দরবান এসে পৌঁছল ওরা। সাড়ে আটটা বাজে। আদ্রিতার বেশ খিদে পেয়েছে। বাসস্ট্যান্ডের পাশেই কিছু ছোট রেস্টুরেন্ট দেখা যাচ্ছে।

'এই ফারহান, তোরা আয়, আমি আর আদ্রিতা খেতে যাচ্ছি,' কঙ্কা বলল। ওর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ওরও বেশ খিদে পেয়েছে।

ছোট একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল। সেখানে পরোটা ভাজা হচ্ছে, সাথে আছে ডাল, ডিমভাজি। আদ্রিতা কখনো এসব রেস্টুরেন্টে খায়নি। মনে হচ্ছে আশপাশের সবকিছু বড় বেশি নোংরা, অপরিষ্কার। কিন্তু একই সাথে ভাজা পরোটা আর ডিমের যে ঘ্রাণ ভেসে আসছে সেটাকেও অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। কঙ্কারও একই অবস্থা। নাক কুঁচকে আছে, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠছে না।

দুজনের জন্য পরোটা আর ডিম অর্ডার করেছে আদ্রিতা। ছোট একটা ছেলে হাসিমুখে অর্ডার নিয়ে গেল। এরমধ্যে সৌমিক এসে ঢুকল রেস্টুরেন্টে।

'দুজনে তো বেশ অর্ডার দিয়ে খাচ্ছ, ওদিকে আমাদের তো বারোটা বাজছে।'

'বারোটা বাজার কী আছে?' কঙ্কা জিজ্ঞেস করল।

'তোরা এতগুলো ব্যাগ এনেছিস ক্যান? ওগুলো রেখেই খেতে চলে আসছিস নবাবজাদির মতো।'

'আমরা দুজন নবাবজাদিই, তোরা আমাদের প্রজা,' কঙ্কা বলল, 'যা তো খাওয়ার সময় বিরক্ত করিস না।'

সৌমিক ভেংচাল। কঙ্কাও।

'বিল দেওয়ার টাকা আছে তো?' সৌমিক হাসল বলে, 'সব টাকা কিন্তু আমার কাছে। বিল দিতে না পারলে ওদের বাসনকোসন মেজে দিতে হবে কিন্তু। কে নবাবজাদি আর প্রজা সব বের হয়ে যাবে।'

'আরে বাবা, রাগ করিস ক্যান?' কঙ্কা বলল, 'তোর জন্যও অর্ডার করি।'

'না, আমি যাই, তোরা খেতে থাক,' সৌমিক উঠে দাঁড়াল, 'আমরা কাজগুলো সারি।'

'কোন হোটেলে উঠছি জানি আমরা?'

'ঐ যে দেখা যাচ্ছে,' সৌমিক দেখাল হাতের ইশারায়, 'হোটেল বান্দরবান ইন। তিনতলায় আমাদের রুম বুক করা আছে।'

'আচ্ছা।'

'আমি যাচ্ছি, দেখিস, সব শেষ করে ফেলিস না আবার!' খোঁচা দিয়ে বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল সৌমিক। কঙ্কা কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

ছোট ছেলেটা এসে গরম পরোটা আর ডিম ভাজা দিয়ে গেল। খেতে গিয়ে আদ্রিতা টের পেল এরকম পরোটা সে অনেক বছর খায়নি। ছোটবেলায় একবার বাবার সাথে বেড়াতে গিয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল সেটা পরিষ্কার মনে নেই। কিন্তু বাবা তাকে ছোট একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে গরম পরোটা খেয়েছিল, সাথে ছিল রসগোল্লা। সেই স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে মনে হয়। আজকের স্বাদটাও অনেকদিন ভুলবে না এটা নিশ্চিত।

খেতে খেতে টেবিলের একপাশে পড়ে থাকা একটা পত্রিকার দিকে চোখ পড়ল আদ্রিতার। কাছে টেনে নিল। কিছুদিন আগের স্থানীয় একটা পত্রিকার পেছনের পাতা। খেতে খেতে পাতাটায় চোখ বুলাল। স্থানীয় কিছু সংবাদ যার কোনোকিছুই আদ্রিতার কাছে দরকারি নয়। তবে একটা খবরে চোখ চলে গেল। সেখানে লেখা :

নিখোঁজ তিন তরুণ-তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদক সম্প্রতি ঢাকা থেকে বেড়াতে আসা তিন তরুণ-তরুণী নিখোঁজ হয়েছেন। জানা গেছে ঢাকা থেকে বেড়াতে আসা আরশাদ মোহাম্মদ, রাকিব হোসেন এবং ফারজানা নিশি নামের কলেজ পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে বেড়াতে আসেন বান্দরবানে। কয়েকদিন তারা শহরেই ঘোরাঘুরি করেন। তারপর তারা মায়ানমার সীমান্তের...

বাকি অংশ (তৃতীয় পৃষ্ঠা কলাম ৭)

খবরের বাকি অংশটা পড়া হলো না। মাত্র এই একটা পাতাই ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে বাকিদের সাথে আলাপ করতে হবে। তিন তিনটা ছেলে-মেয়ে কি হারিয়ে গেল? নাকি পালিয়ে গেছে ওরা? হয়তো এদের মধ্যে একজনের সাথে নিশা মেয়েটির প্রেম? অন্যজন শুধুই বন্ধু। হয়তো ওরা এখানে এসে বিয়ে করে লুকিয়ে আছে। এরকম কিছুই হবে ধারণা করল আদ্রিতা।

'তোর এই স্বভাবটা পালটা? এই নোংরা কাগজটা পড়ার দরকার কী?' কঙ্কা বলল পত্রিকার পাতাটা আদ্রিতার হাতে দেখে।

আদ্রিতা হাসল। এটা ঠিক যে এখানে-সেখানে পড়ে থাকা ছেঁড়া কাগজপত্র পড়তে তার ভালো লাগে। কঙ্কার সাথে যতদিন ঝালমুড়ি খেয়েছে, সবসময় ঝালমুড়ি দেওয়ার ঠোঙাটা সে পড়ার চেষ্টা করেছে। এটা কঙ্কার চোখ এড়ায়নি বোঝা যাচ্ছে। বাজে একটা স্বভাব এটা, পালটানো দরকার। পত্রিকার পাতাটা সরিয়ে রাখল।

ঢাকা থেকে রওনা দেওয়ার সময় খুব দরকারি কিছু জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছু আনেনি আদ্রিতা, কঙ্কাও তাই। এটা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল। বান্দরবানে আসার প্রথম রাতটাই তারা হোটেলে কাটাবে, বাকি সব রাত কাটাবে বাইরে, তাঁবুতে। পোর্টেবল তাঁবু নিয়েছে দুটো, একটায় ওরা তিনজন থাকবে, অন্যটায় আদ্রিতা আর কঙ্কা। তাঁবুতে রাত কাটানোর কথা ভাবতেই কেমন যেন লাগছিল আদ্রিতার। কিন্তু কিছু করার নেই। অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় থাকার কোনো মানে নেই। প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে হবে। জীবনে এরকম সুযোগ আরেকবার আসবে কি না নিশ্চিত না। কাজেই এই সুযোগটাই পুরোপুরি নিতে হবে।

নাশতা শেষ করে ওরা ধীরে সুস্থে হোটেল বান্দরবান ইন-এর দিকে অগ্রসর হলো। ফারহান বাইরে দাঁড়ানো, ও ছবি তুলছে একের পর এক। এগুলো নিয়ে নাকি বড় একটা ভ্রমণ ব্লগ লিখবে। ওর লেখালেখির নেশা আছে, অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার নেশা আছে। তবে এসব ব্যাপারে রবি আরও বেশি ওস্তাদ। দুনিয়ার সব খবর ওর রাখা চাই। ওর ব্যাক-প্যাকে তিন-চারটা মোটাসোটা বিদেশি রহস্যোপন্যাস দেখেছে আদ্রিতা। বই পড়তে তারও ভালো লাগে, তবে রবির মতো না।

কঙ্কা ফারহানের সাথে হাসছিল আর কী কী যেন বলছিল। রবি আর সৌমিককে কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলের সামনে পাওয়া গেল। ওরা একটা চান্দের গাড়ি ভাড়া করেছে। বান্দরবানে দেখার মতো অনেক জায়গা আছে। সেগুলো এক এক করে দেখবে। সেভাবেই লিস্ট করা হয়েছে।

এরকম গাড়িতে আগে কখনো চড়া হয়নি। তাই হইহই করে কঙ্কা আর ফারহান উঠে পড়ল। রবি সিগারেট ধরিয়েছে আর সৌমিক ড্রাইভারের সাথে কিছু একটা নিয়ে আলাপ করছে। সম্ভবত ভাড়া নিয়ে দরকষাকষি এখনও বাকি আছে।

কিন্তু আদ্রিতার কাছে সবকিছু কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে সবাই খুব ধীরে ধীরে চলছে, কথা বলছে। সবকিছুই কেমন যেন ধীরে চলছে।

কাঁধে ধাক্কা খেয়ে সংবিৎ ফিরল। কঙ্কা ধাক্কা দিয়েছে। সে এখন গাড়ির সিটে বসা।

'তুই কি এখানেই থাকবি, না যাবি আমাদের সাথে?' জিজ্ঞেস করল কঙ্কা।

'যাব তো,' আদ্রিতা বলল।

'ওঠ তাহলে, এরকম তব্দা মেরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

আদ্রিতা উঠে পড়ল, পেছনের একটা সিটে বসল।

সৌমিক ড্রাইভারের পাশে বসল, আদ্রিতার সাথে বসল রবি। ওর হাতে ছোট উকলেলেটা দেখা যাচ্ছে। আদ্রিতা জানে না গন্তব্য কোথায়। তার মনে হচ্ছিল রুমে গিয়ে চোখে-মুখে পানি দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রওনা হলে ভালো হতো। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ওরা এতই উত্তেজিত হয়ে আছে যে এখানে এসে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না।

বাসায় একবার ফোন করে বলা দরকার ছিল যে সবাই নিরাপদে পৌঁছেছে। মা হয়তো চিন্তা করবেন। কিন্তু রওনা দেওয়ার সময়ই সবার মোবাইল ফোন সৌমিকের ব্যাগে ঢোকান হয়েছে। সেটার চাবি থাকবে একমাত্র সৌমিকের কাছে। খুব বিপদ না হলে কেউ ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। সৌমিকের নম্বর সবার অভিভাবকের কাছে দিয়ে আসা হয়েছে। তারা কোনো ঝামেলায় পড়লে সৌমিককে জানাবে, সৌমিক প্রতিদিন রাতে একবার করে তার মোবাইল ফোন চেক করবে।

এমনিতে সবসময় হাতে মোবাইল ফোন থাকে, একটু পরপর ফেসবুকের নোটিফিকেশন চোখে পড়ে, ইনস্টাগ্রামের ম্যাসেজের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু গতকাল রাত থেকে মনে হচ্ছে খুব ভালো একটা কাজ হয়েছে মোবাইল ফোন বন্ধ রেখে। একটা ভ্রমণ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য মোবাইল ফোনকে কিছুদিনের জন্য বিসর্জন দেওয়াটা মন্দ নয়।

চারপাশে সুন্দর বাতাস, চুল উড়ছে সেই বাতাসে। আদ্রিতা চোখ বুজে সবুজ এক স্নিগ্ধতাকে অবগাহন করছে। পাশে উকলেলে বাজাচ্ছে রবি।

'চলো না ঘুরে আসি,
অজানাতে...
যেখানে নদী এসে মিশে গেছে'

ওর সাথে তাল মেলাচ্ছে ফারহান, সৌমিক আর কঙ্কা। আদ্রিতার খুব ভালো লাগতে লাগল সবকিছু। জীবনটাকে হঠাৎ করেই মনোরম আর আনন্দময় মনে হতে লাগল।

আকাশটা ফুরফুরে বাতাসে ভরা, চারপাশে অসংখ্য মানুষ। আদ্রিতার একবার মনে হলো সে আর কখনো ঢাকায় ফিরে যাবে না। এখানেই থেকে যাবে।



মোহাম্মদ রফিকের রাত জাগার অভ্যাস অনেকদিনের। একা মানুষ। সময় কাটে না, ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে থ্রিলার বই পড়ে আর হাসে। বেশিরভাগ থ্রিলার গল্পের শুরুতেই সে আন্দাজ করতে পারে খুনি কে আর শেষে সেটা মেলে না। এই পর্যন্ত ত্রিশটা মার্ডার মিস্ট্রি পড়ে একটাও ঠিকঠাক আন্দাজ করতে পারেনি। এটা অবশ্য নিজের ব্যর্থতা বলে মানতে রাজি নয় সে। নতুন থ্রিলার লেখকরা যে ভালো লিখছে এটা তারই প্রমাণ।

বই পড়তে পড়তে যখন চোখ ব্যথা করতে থাকে, হাত-পায়ে খিল ধরে যায় তখন উঠে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে। তারপর ফেসবুক খুলে বসে। এখানে তার বেশ কিছু ফেইক আইডি আছে। সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন মেয়েদের সাথে রসালাপ করার চেষ্টা করে। রসালাপ জমে না। মানুষ হিসেবে রফিক মোটেও রসিক নয়। তার রসালাপগুলো শুরুতেই পাতলা হয়ে যায়। রসালাপ হতে হয় ঘন, ক্ষীরের মতো। তা হলে না মেয়েরা পটবে।

মেয়েদের পটানোর একশ এক কৌশলজাতীয় অনেকগুলো বইও সে কিনেছে। পড়েছে। কৌশলগুলো বাস্তব জীবনে খাটানোর চেষ্টা করেছে লাভ হয়নি। এজন্য ইদানীং আর খুব বেশি চেষ্টা করে না। মাঝে মাঝে রাতে ঘুম না এলে একটু চেষ্টা করা হয় আর কী!

রফিকের আরেকটা বড় শখ হচ্ছে কন্সপিরেসি থিয়োরি নিয়ে পড়াশোনা করা। দুনিয়াটা যে শীতল রক্তের একধরনের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী দিয়ে চালিত হচ্ছে এতে মাঝে মাঝে তার একদমই সন্দেহ থাকে না। রথচাইল্ড ফ্যামিলি কিংবা ইলুমিনাতিরা কীভাবে নতুন পৃথিবীর দখল নিচ্ছে সেটাতে তার মোটেও সন্দেহ নেই। ফ্রিম্যাসন হওয়ার কৌশলগুলো সব তার জানা। শুধু জানা নেই ঠিক কোথায় আবেদন করলে ফ্রিম্যাসন হওয়া যাবে। না হলে এতদিনে সে ফ্রিম্যাসন হয়ে যেত। সাধারণ, নিরুদ্বেগ এই জীবনযাপন তার আর ভালো লাগছিল না। পুলিশের কনস্টেবল হিসেবে চাকরি শুরু

করেছিল, এখনও কনস্টেবলই আছে। উন্নতি হয়নি। টাকা-পয়সাও রোজগার করেনি। শুধু একটা লাভ হয়েছে। ঝামেলাহীন একটা জীবন পার করতে পেরেছে। সমতলের মানুষ হয়েও পুরো জীবনটাই প্রায় পাহাড়ে কাটিয়েছে। বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। চেহারায় বোকাসোকা ভাব, শরীরটাও ঢিলেঢালা।

রাতে মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রফিক। সুন্দর হাওয়া হচ্ছে। থানায় এসে কিছুক্ষণ বসল, যদিও আজ রাতে তার কোনো ডিউটি নেই। তাই সহকর্মীদের সাথে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে বেরিয়ে এলো। গল্পগুজবের উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল। তিনটা ছেলেমেয়ে শহরে বেড়াতে এসে হাওয়া হয়ে গেছে। ওদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ নিয়ে বেশ তোলপাড় চলছে ভেতরে ভেতরে।

এই কেসের তদন্তের দায়িত্বে আছে ইশতিয়াক নামের এক এএসআই। বেচারা নতুন, এই শহরের কোথায় কী আছে সেগুলোই এখনও চিনে উঠতে পারেনি। তদন্ত করবে কী!

এরকম একটা তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার শখ তার অনেকদিনের। কিন্তু চাইলেই তো কেউ দায়িত্ব দেবে না। দায়িত্ব নিয়ে নিতে হবে। মোহাম্মদ রফিক তাই নিজ থেকেই দায়িত্ব নিয়েছে। এই তিন ছেলে-মেয়েকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব। চাকরিতে বলার মতো কিছু একটা অর্জন থাকা দরকার। এটাই হতে পারে সেই অর্জন।

মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে শহরের বেশ খানিকটা বাইরে চলে এলো রফিক। এখানে পাহাড় বেশ খাড়া হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। মোটরসাইকেলের যে হাল তাতে এটা নিয়ে পৌঁছানো বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই রাস্তার পাশে একটা ঝোপের আড়ালে মোটরসাইকেলটা লুকিয়ে রাখল। তারপর হাঁটতে থাকল। যেখানে যাচ্ছে সেখানে আনন্দ আছে, আর আছে তথ্য। এই মুহূর্তে তথ্য দরকার, সাথে আনন্দও।

পাহাড়ের ঠিক মাঝখানে ছোট একটা ঘর। এই ঘরে যে লোকটা থাকে সে সব কাজের কাজি। নাম ক্য চিং হ্লা। রফিকের কাছে কঠিন লাগে বলে সে লোকটাকে 'গুলটু মিয়া' বলে ডাকে। কাজী আনোয়ার হোসেনের এক বিখ্যাত চরিত্র ছিল 'গিলটি মিয়া' নামে, ঐ নামের সাথে মিলিয়ে এই নাম। ক্য চিং হ্লা গোলগাল একটা মানুষ। চোখ-মুখ, হাত-পা, পেট সব গোল গোল। ওর সাথে পাহাড়ি মদ খেতে খেতে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলাপ হয় রফিকের।

পাহাড়ে কোথায় কী ঘটছে তার সবকিছুই 'গুলটু মিয়া'র নখদর্পণে। ওর কাছ থেকে অনেক তথ্য পায় রফিক। কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই সে কাজে লাগায় না। কে মাদক বিক্রি করছে, কে ড্রাগ বিক্রি করছে আর চুরি-চামারি করছে সব তথ্যই তার সাথে খোলামনে বলে যায় গুলটু মিয়া। সেও জানে রফিক এসব এমনিই শোনে। ছোটখাটো এসব কেস নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই।

গুলটু মিয়া সবসময়ের মতো হাসিখুশি অবস্থায় অভ্যর্থনা জানাল। দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পসল্প করল। ভোর রাতের দিকে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল রফিকের। সেই সময় গুলটু মিয়া বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ যা বলল তাতে মুহূর্তেই চোখ থেকে ঘুম গায়েব হয়ে গেল।

'স্বর্ণ? স্বর্ণমুদ্রা? সত্যি?'

গুলটু মিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল সত্যি।

'কতগুলা?'

তিনটা আঙুল দেখাল গুলটু মিয়া। খেয়ে এত টাল হয়ে গেছে যে কথা বলার শক্তিও হারিয়েছে।

'নাম কী?'

গুলটু মিয়া নাম বলল না। তবে টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের এক কোণায় থাকা একটা মাটির কলসি এনে রাখল রফিকের সামনে। সেটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে গোলাকার কয়েকটা জিনিস বের করে আনল। ব্যস্ত হয়ে নিজের হাতে সেগুলো নিতে চাচ্ছিল রফিক। মাতাল হলেও এখনও টনটনে জ্ঞান আছে গুলটু মিয়ার।

'এইগুলা আমার কাছে রেখে দিছে, আরও নাকি পাবে,' গুলটু মিয়া বলল।

'তোমার কাছে কী মনে করে রাখছে, ঘটনা কী?'

'আমার কাছে থাকলে নিরাপদ থাকবে, এইজন্য।'

'কিন্তু তুমি তো আমার কাছে বইলা দিলা, এখন?'

'তো, কী হইছে? তুমি এগুলা নিয়া কী করবা?'

'তা অবশ্য ঠিক,' বলল রফিক। কিন্তু তার চোখ সরছে না গোলাকার জিনিসগুলোর উপর থেকে। এগুলো যে স্বর্ণমুদ্রা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পাহাড়ি এলাকায় স্বর্ণমুদ্রা আসবে কোত্থেকে? আর সেটা এই গুলটু মিয়ার কাছেই কে রেখে যাবে?

হঠাৎ রফিকের মনে হলো আশপাশে কোথাও কোনো শব্দ শুনতে পেয়েছে। গুলটু মিয়া তার পেছনের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিতে বিস্ময়!

ওর দৃষ্টি লক্ষ করে পেছনে তাকাতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেল রফিক। এমনিতেই মদ খেয়ে টাল অবস্থা, তার উপর এরকম একটা আঘাত সে সহ্য করতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। তবে জ্ঞান হারানোর আগে বিশেষ কিছু একটা তার চোখে পড়ল। যে হাত দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছে সেই হাতের কবজির উপর একটা মূর্তির ছবি। এরকম কোনো মূর্তি আগে কখনই দেখেনি বলেই হয়তো মূর্তির ছবিটা তার স্মৃতিতে চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়ে গেল।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন ভোরের আলো ফুটছে। বাইরে থেকে শীতল হাওয়া আসছে। প্রথমে তাকিয়েই যা দেখল তাতে হকচকিয়ে গেল সে। গুলটু মিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সেই দৃষ্টিতে কোনো প্রাণ নেই। গলাটা ছুরি দিয়ে কেউ দুভাগ করে দিয়েছে। চারপাশে রক্ত জমেছে, মাছি ভনভন করছে সেই জমাট বাঁধা রক্তের উপর। রক্ত গড়িয়ে এসে কিছুটা রফিকের শার্টেও লেগেছে।

তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল রফিক। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা নিরাপদ নয়। কেউ এখনও দেখে ফেলেনি। দেখলে তাকেই খুনি সাব্যস্ত করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পানির বোতল থেকে পানি দিয়ে যতটা সম্ভব শার্টের রক্তের দাগ উঠানোর চেষ্টা করল। পুরোটা উঠল না। পুরোটা উঠানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দৌড়ে নামতে গিয়ে হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল এই বুঝি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গড়িয়ে পড়বে। কোনোমতে সেই ঝোপের কাছে এলো যেখানে মোটরসাইকেল লুকিয়ে রেখেছিল। দ্রুত স্টার্ট নিয়ে কোনোমতে শহরে চলে এলো।

বাসায় ঢুকেই বাথরুমে ঢুকে শার্টটা পানিতে ভেজাল। ডিটারজেন্ট দিয়ে ইচ্ছেমতো ধুয়ে রক্তের দাগ পরিষ্কার করল। তারপর থিতু হয়ে বসল। গতরাতে সে গুলটু মিয়ার ওখানে গিয়েছিল এটা কেউ জানে না, খুনি ছাড়া। সেই খুনিও সাধারণ কেউ নয়। তিনটা স্বর্ণমুদ্রার মালিক। নিশ্চয়ই আরও অনেক আছে ওর কাছে। গুলটু মিয়া মদ খেয়ে সব বলে দেবে এটা জানলে নিশ্চয়ই ওর কাছে স্বর্ণমুদ্রাগুলো জমা রাখত না।

খুনি কে হতে পারে কোনো ধারণা নেই। বিছানায় বসে বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। খিদেয় পেট জ্বলছিল। এই মুহূর্তে রান্নাঘরে গিয়ে কোনো কিছু রান্না করে খাওয়ার মতো শক্তি নেই। তাই দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রফিক।

তার পরনে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট। সকাল হয়েছে, রাস্তায় অনেক লোকজন। এরমধ্যে হঠাৎ করেই দেখল চার-পাচজন পুলিশ বেশ হন্তদন্ত হয়ে তার বাসার দিকে যাচ্ছে। এরমধ্যে সদ্য যোগ দেওয়া এএসআই ইশতিয়াকও আছে।

আমার বাসায় ওদের কী কাজ? এই সাতসকালে আমাকে কী দরকার? এসব ভাবতেই রফিকের মনে হলো পালানো দরকার। সে খুন করেনি। কিন্তু গুলটু মিয়ার বাসায় সে যে প্রায়ই রাতে যায় এটা অনেকেই জানে। গতকাল রাতেও হয়তো কেউ না কেউ তাকে যেতে দেখেছে। তাকেই খুনি সন্দেহ করছে না তো ওরা?

একটা দোকানের আড়ালে চলে গেল রফিক। সিগারেট ধরাল। তাকিয়ে আছে বাসায় দরজার দিকে। এএসআই ইশতিয়াক বেশ কিছুক্ষণ দরজা ধাক্কাল। তারপর একজন কনস্টেবলকে ইশারা করল দরজা ভেঙে ফেলার জন্য।

এটুকু দেখেই যা বোঝার তা বুঝে ফেলল মোহাম্মদ রফিক। ইচ্ছে ছিল কোনো একটা কেসের তদন্ত করবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাকে নিয়েই তদন্ত করবে পুলিশের লোকজন। গুলটু মিয়ার মৃত্যুর দায় তার কাঁধেই আসবে। স্বর্ণ মুদ্রার গল্পকে ওরা আজগুবি গল্প বলে স্রেফ উড়িয়ে দেবে। এক্ষেত্রে একটাই উপায় আছে, আসল খুনিকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া। সেটা হাজতে বসে সম্ভব হবে না। কাজটা তাকে বাইরে থেকেই করতে হবে, পুলিশের নাগালের বাইরে থেকে। নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণের জন্য হলেও তাকে পালিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? অনেকগুলো বছর পার্বত্য অঞ্চলে থাকার ফলে একটা জায়গার কথাই মনে এলো রফিকের। সে জায়গায় কখনো যায়নি, কিন্তু অনেক গল্প শুনেছে গুলটু মিয়ার কাছে। ভয়ংকর সে জায়গা হতে পারে তার জন্য আপাতত নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গেল মোহাম্মদ রফিক। সাথে টাকা-পয়সা যা ছিল নিয়ে বের হয়েছে, রিভলভারটা নিতেও ভুলল না। এই রিভলভারটা তার নয়, অনেক আগে স্থানীয় এক সন্ত্রাসীকে ধরতে গিয়ে ওর বাসায় তল্লাশি করে পেয়েছিল, সেটা জমা না দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। বুলেটও আছে। এতদিনেও বুলেটগুলো তাজা আছে কি না কে জানে! গুনে দেখল পাঁচটা বুলেট আছে। কাজে লাগবে কি না কে জানে। হাতের কাছে থাকলে কিছুটা সাহস পাওয়া যাবে। টাকা নিয়ে কিছুদিন চিন্তা করতে হবে না। যেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে সেখানে অর্থের প্রয়োজন হবে বলেও মনে হচ্ছে না।

পুরো ব্যাপারটাকেই হঠাৎ করেই কেমন অদ্ভুত লাগছিল রফিকের কাছে। কাল যদি গুলটু মিয়ার ওখানে গল্প করতে না যেত, তাহলেই হয়তো আজ তাকে পালাতে হতো না। গুলটু মিয়াকেও মরতে হতো না। কিন্তু ভাগ্যে মৃত্যু থাকলে, পলাতক জীবন থাকলে তাকে এড়িয়ে চলে সাধ্যি কার! তবে এই সুযোগে জীবনে খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার যোগ হবে তা-ই বা মন্দ কী!

দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকল মোহাম্মদ রফিক। এই শহরে আবার একদিন ফিরে আসবে। কোনো একদিন ফিরবেই।



বান্দরবানে দেখার অনেক কিছু আছে। কিন্তু ঠিক সেসব দেখতেই যে ওরা এসেছে তা কিন্তু নয়। ওরা এসেছে সুন্দর একটা সময় কাটাতে, শহরের ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে, নিজেদের মতো করে।

এখানে আসার আগে দর্শনীয় জায়গাগুলোর একটা তালিকা করে এনেছে ফারহান। চিম্বুক, নাফাখুম, বগালেক, কেওক্রাডং, নীলগিরি, নীলাচল, আলীর গুহা, স্বর্ণমন্দির এই নামগুলো এক এক করে লেখা একটা কাগজে। সকালে হোটেলে ব্যাগপত্র রেখেই ওরা প্রথমে গিয়েছিল স্বর্ণমন্দিরে, তারপর সেখান থেকে নীলগিরি। দুপুরে স্থানীয় একটা হোটেলে খেয়েছে। সন্ধ্যার দিকে আবার ফিরে এসেছে শহরে।

এই মুহূর্তে সবাই জড়ো হয়েছে ছেলেদের রুমে। এই রুমে দুটো বিছানা, সে দুটোই জোড়া লাগিয়ে তিনজন থাকবে। মাঝখানে কে ঘুমাবে সে নিয়ে টসে হেরে গেছে ফারহান। ওর একপাশে ঘুমাবে রবি, অন্যপাশে সৌমিক।

এখন রুমে মেয়েরাও আছে। সবাই বসে গল্প করছে। নীলগিরি থেকে ফিরে রুমে গিয়ে সবাই গোসল সেরে এসেছে। এখন নভেম্বর মাস, ঢাকায় শীতের লেশমাত্র নেই। কিন্তু এখানে সন্ধ্যার পরপরই চারপাশে হালকা কুয়াশা পড়েছে।

এই কয়েকজনের সাথে আরও একজন আছে। এই ছেলেটাকে গাইড হিসেবে ধরে এনেছে ফারহান। ওর নাম মং সেন মারমা। বয়স কত বোঝা যায় না দেখলে, পঁচিশ হতে পারে আবার চল্লিশও হতে পারে। শ্যামলা গায়ের রঙ, পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। মাথায় ক্যাপ, পরনে গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট, সুন্দর টি-শার্ট। পেশিবহুল শরীর। বোঝা যায় নিয়মিত শরীর চর্চা করে। সকালে যে চান্দের গাড়ি ভাড়া করেছিল, সেই ড্রাইভারের ভাই।

মং সেন জমিয়ে গল্প বলতে পারে। সে বগা লেকের গল্প বলছে। এই লেক নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে কী কী মিথ চালু আছে তা নিয়ে গল্প করতে

করতে একদম জমিয়ে দিয়েছে সবাইকে। বগা লেকে যে ড্রাগন থাকত, এ নিয়ে মং সেন-এর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং তার ধারণা কোনো একদিন সেই ড্রাগন আবার ফিরে আসবে।

গল্প করতে করতে সময় গড়াচ্ছিল। পুরো রুমে সিগারেটের ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। ছেলেরা এরমধ্যেই বেশ টালমাটাল অবস্থায় আছে। মং সেন বেশ কাজি লোক বোঝা যাচ্ছে। ছেলেরা যা চায়, তা সে জোগাড় করে দিয়েছে। বিয়ারের ক্যান। ফারহান, সৌমিক কিংবা রবি, কারওই তেমন অভ্যাস নেই বিয়ার কিংবা মদের। কিন্তু ভ্রমণ করতে এসে একদম ভদ্র-সদ্র থাকাটা ঠিক মানায় না। আদ্রিতা আর কঙ্কা আছে রুমে। যদিও ওরা এসব নিয়ে চিন্তিত নয়। ওরা যতই টালমাটাল হোক, বন্ধুদের সাথে খারাপ কিছু করবে না এই বিশ্বাস আছে।

মং সেন লোকটাকে অবশ্য পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না আদ্রিতা। লোকটা বোকাসোকা একটা ভাব নিয়ে আছে। চোখে-মুখে সরলতা ঝরে পড়ছে। কিন্তু আদ্রিতার মনে হচ্ছে এসবই ভান। লোকটা লোভী। ট্যুরিস্ট পেয়ে ওদের কাছ থেকে অতিরিক্ত রোজগার করাই ওর মূল লক্ষ।

'আচ্ছা, মং ভাই, একটা কথা বলেন তো,' কঙ্কা জিজ্ঞেস করল, 'এই যে চাকমা, মারমা, রাখাইন জাতির লোকগুলো এখানে থাকে, তারা কী বাংলাদেশকে নিজেদের দেশ মনে করে?'

ওর প্রশ্ন শুনে বেশ ভড়কে গেল মং সেন। বাকিরাও সবাই তাকাল মং সেনের দিকে।

'আমরা বাংলাদেশি, এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই,' মং সেন বলল, 'কিন্তু বাঙালি সেটেলার আসার পর থেকে নিজ ভূমিতেই আমরা বহিরাগত হয়ে গেছি। আমাদের কত যে সম্পদ ওরা দখল করে নিয়েছে তার কোনো হিসাব নেই।'

'কঙ্কা, এসব রাজনৈতিক আলাপ শুরু করলি কী মনে করে?' ফারহান বলল, 'আমরা আনন্দ করতে এসেছি, আনন্দ করে চলে যাব। কি বলো ভাই মং সেন?'

'তা তো অবশ্যই,' বলে মং সেন হাসল। সেই হাসিতে খুব বেশি প্রাণ দেখা গেল না।

'এরচেয়ে আমরা অন্য কোনো ইন্টারেস্টিং টপিকে আলাপ করি, কি বলিস তোরা?' রবি বলল এবার।

'আমি বলি?' মং সেন হাত তুলল।

'হুঁ, বলেন ভাই,' রবি বলল।

'তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে?' কঙ্কা বলল।

'কী প্রশ্ন?'

'মং সেন ভাই এত সুন্দর উচ্চারণে বাংলা বলেন কীভাবে? আঞ্চলিকতার কোনো টানই নেই!'

'আসলে আমি ছোট থেকেই ঢাকায় বড় হয়েছি, ফার্মগেটের কাছে মণিপুরি পাড়া এলাকায়। পড়াশোনাও সব ঢাকায়, কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'আমি সব ছেড়েছুড়ে এই পাহাড়ে চলে এলাম। মনে হলো এটাই আমার আসল জায়গা। এখানেই আমার শান্তি।'

'আচ্ছা।'

'এখন একটা দরকারি কথা বলি। এই বান্দরবান জেলায় সবাই এসে ঘুরে যায়, সেই একই জায়গায় ঘোরে-ফেরে, ছবি তোলে, তারপর ঢাকায় ফিরে যায়, আর কোনোদিন আসে না। আসে না কেন বলেন তো?'

'কেন আসে না?'

'তারা যেসব জায়গা দেখে এইটা সবাই দেখে, তাই ফিরে আসার আগ্রহ পায় না। কিন্তু আমি এমন কিছু জায়গা বের করছি সেগুলো কেউ জানেও না।'

'বলেন কী? কেমন জায়গা?' কঙ্কা লাফিয়ে উঠল।

'সেসব জায়গায় বাঙালি সেটেলাররা যায়নি কোনোদিন,' মং সেন বলল, 'আর যারা ঢাকা থেকে আসে তারা তো চেনেই না।'

'আমাদের নিয়ে যান ভাই,' কঙ্কা বলল, 'এই নীলগিরি, নাফাখুম সবাই যায়। আমরা যদি একটু অন্যরকম জায়গায় যেতে পারি তাহলে তো বিশাল ব্যাপার হবে। কি বলিস তোরা?'

'অবশ্যই,' ফারহান বলল, 'এইসব জায়গায় গিয়ে দেখা যায় মানুষে গিজগিজ করছে। এরচেয়ে এমন জায়গায় যাওয়া ভালো, যেখানে আমরাই প্রথম।'

'এরকম জায়গা কি আর আছে?' সৌমিক বলল, সে সবসময় পরিকল্পনা করে চলে, আচমকা কোনো বদল তার তেমন পছন্দ নয়। কিন্তু সরাসরি সে কথা বলছে না, দেখতে চাচ্ছে বাকিদের মনোভাব কেমন।

'কিন্তু সেসব জায়গা তো দুর্গম হবে, তাই না?' আদ্রিতা বলতে বাধ্য হলো। শারীরিকভাবে অতিরিক্ত কষ্ট করতে হবে এমন জায়গায় যেতে খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছে না। কিন্তু বন্ধুরা যেমন উৎসাহী হয়ে উঠেছে, তাতে আপত্তি করতেও অস্বস্তি হচ্ছে।

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে...' উকলেলে বাজিয়ে গেয়ে উঠল রবি, ওকে হাত দিয়ে থামাল সৌমিক।

'আমরা পারব তো? সাথে আবার মেয়েরা আছে,' মং সেনকে প্রশ্ন করল, 'কয়দিন লাগতে পারে।'

'পারব মানে? অবশ্যই পারব,' কঙ্কা বেশ হুংকার দিয়ে উঠল।

'দুই দিনের বেশি লাগবে না যেতে, ফিরতে দুই দিন, চারদিনে হয়ে যাবে,' মং সেন বলল।

'চারদিন তো রিজনেবল,' সৌমিক বলল, 'ওখান থেকে ফিরেও আমরা কিছু কিছু জায়গায় যেতে পারব।'

'হ্যাঁ,' কঙ্কা বলল, 'আমরা তাহলে কাল সকালেই রওনা দেব।'

'সকাল সকাল রওনা দেওয়াই ভালো,' মং সেন বলল, 'তবে আমার কিছু শর্ত আছে।'

'কী রকম শর্ত?'

'একেকদিনের জন্য আমাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে,' মং সেন বলল, 'চারদিনে চার হাজার, আর খাওয়া ফ্রি।'

'আর?'

'জায়গাটা বার্মা সীমান্তের ওপারে, তবে ওখানের সীমান্তে কোনো পাহারা নেই...'

'এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যাব, সমস্যা হবে না?' প্রশ্ন করল সৌমিক।

'চোরাচালানিরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করে,' মং সেন বলল, 'কিন্তু এরকম একটা পথ ওরাও চেনে না।'

'তাহলে তুমি কীভাবে চেনো?'

'সেই গল্প পরে একসময় বলব,' মং সেন বলল, 'কিন্তু এর বাইরেও কিছু ব্যাপার আছে।'

'কী ব্যাপার?'

মং সেন কিছু বলতে গিয়েও বলল না। কিন্তু সবাই এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মুখ খুলল।

'আমাদের খুব চুপচাপ থাকতে হবে, শব্দ করা যাবে না, হইচই করা যাবে না। ঐ বনের দেবতা অসন্তুষ্ট হলে সমস্যা হবে।'

'বনের দেবতা? সে আবার কী?'

'সব বনেরই দেবতা থাকে,' মং সেন বলল, 'তোমরা জানো না?'

'জানি কিছু কিছু,' রবি বলল, 'কিন্তু সেগুলো তো শুধু উপকথা, বাস্তব কোনো ভিত্তি তো নেই।'

'আমি সেসব জানি না, শুধু জানি ওখানকার দেবতা জাগ্রত দেবতা,' মং সেন বলল, 'সেই দেবতা রেগে গেলে সব শেষ।'

'সব শেষ মানে?'

'জান নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না,' মং সেন বলল, 'এর আগে এরকম একটা দল ঐদিকে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।'

'সত্যি নাকি?'

'মিথ্যে বলে কী লাভ?' মং সেন বলল, 'ওখানে চমৎকার একটা ঝরনা আছে, বন আছে, সম্ভবত কোনো গুহাও আছে। সবচেয়ে বড় কথা জায়গাটা নিয়ে আমাদের একটা মিথ আছে।'

'কী মিথ?'

'ঝরনার উপরে পাহাড়ে একজন সাধু বাস করেন। তিনি সেই দেবতার প্রধান পুরোহিত। তিনি সপ্তাহে ছয়দিন ধ্যান করেন। তার ধ্যানে কোনো বিঘ্ন ঘটানো যাবে না।'

'ঘটালে কী হবে?'

'খারাপ কিছু হবে। আপনাদের জানিয়ে রাখার প্রয়োজনবোধ করলাম।'

'ঐসব কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না,' কঙ্কা বলল। 'তোর কী মত?' আদ্রিতার দিকে তাকাল।

'আমিও না,' আদ্রিতা বলল।

'মেয়েরা যেহেতু ভয় পাচ্ছে না, আমাদেরও ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' ফারহান বলল, 'আমি সব লাইভ রেকর্ড করে রাখব। ঢাকায় এসে ফেসবুক, ইউটিউবে দেব। একটা হুলস্থুল কাণ্ড হবে। নতুন বন আবিষ্কার করেছি আমরা পাঁচ জন। পত্রিকায়-টিভিতে আমাদের সাক্ষাৎকার নেবে। দারুণ হবে।'

'এত লাফাস না,' সৌমিক বলল, 'জীবনে পাহাড়ে উঠেছিস কোনোদিন? বনে ঘুরেছিস?'

'দোস্ত, ভয় পাইস না,' ফারহান বলল, 'আমি থাকতে তোর কোনো ভরসা নাই, হা হা হা,' বলে ফারহান ঘর কাঁপিয়ে হাসতে থাকল। সৌমিকের মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে গেল। তা দেখে বাকিরাও হাসতে থাকল। বিয়ারের প্রভাবেই সম্ভবত সেই হাসির রেশ চলতে থাকল অনেকক্ষণ।



খুব ভোরে রওনা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রাতে বিয়ার খেয়ে সবাই বেশ দেরি করে ঘুমাতে গিয়েছিল। উঠেছেও দেরিতে। মেয়েরা অবশ্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে। ওরা সকাল সকাল বান্দরবান শহরের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করেছে। মোবাইল ফোনগুলো সাথে থাকলে ছবিও তুলত অনেক। কিন্তু ট্যুরের অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার হচ্ছে ফারহান। সব ছবি তোলার দায়িত্ব ওর। সাতসকালে ওর ঘুম ভাঙানোর ঝামেলায় ওরা কেউ যেতে চায়নি।

এগারোটার দিকে যখন ঘুরেফিরে হোটেলে ফিরল আদ্রিতা আর কঙ্কা, তখন মাত্র ওরা ঘুম থেকে উঠেছে। হোটেলের পাশের রেস্টুরেন্টে সকালের নাশতা সেরে নিল।

মং সেনকে দেখা গেল হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট ফুঁকছে।

'সবাই ঠিক আছেন আপনারা?' মং সেন বলল।

আদ্রিতা লক্ষ করল সবার উদ্দেশে প্রশ্নটা করলেও মং সেন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আপনার ব্যবস্থা সব রেডি?' জিজ্ঞেস করল ফারহান।

'হ্যাঁ, একটা গাড়ি নিয়ে এসেছি,' মং সেন বলল, 'তাঁবু কয়টা নিয়ে এসেছেন?'

'দুটো,' ফারহান বলল।

'দুটোতেই হয়ে যাবে,' মং সেন বলল, 'আমি খোলা আকাশের নিচে ঘুমাব, কোনো অসুবিধা নেই।'

'আসলে আগে থেকে প্ল্যান ছিল না, না হলে আরেকটা বেশি নিয়ে আসতাম,' সৌমিক বলল।

'ও নিয়ে পরে ভাবা যাবে,' রবি বলল, 'এখন রওনা দেওয়া যাক।'

'রুম থেকে জিনিসপত্র সব নিয়ে আসি আগে,' সৌমিক বলল।

আদ্রিতা আর কঙ্কা ওদের ব্যাগপত্র আগেই নিয়ে এসেছিল নিচে। এবার সৌমিক, রবি আর ফারহান ওদের রুমে গেল। ওদের নিজস্ব ব্যাগপত্র কম, তবে তাঁবু আছে দুটো। ওগুলো বেশ ভারী। ব্যাগে করে ওগুলো নিয়ে নিচে নামল ওরা। হোটেলের সামনেই জিপ দাঁড়িয়ে আছে। জিপে জিনিসপত্র সব উঠাল ওরা। তারপর নিজেরা চড়ে বসল।

মং সেন ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে। পেছনের খোলা সিটগুলোয় বসেছে ফারহান আর আদ্রিতা, ওদের পেছনের সিটে বাকি তিনজন।

চারদিকে অনেক বাতাস আর রোদ। গাড়ি ছেড়ে দিল।

আদ্রিতা জানে না ওরা ঠিক কোথায় যাচ্ছে। মং সেনের নির্দেশনা মতো গাড়ি চলতে থাকল। রবি ওর উকলেলে বের করে গান ধরেছে। সেই গানের সাথে সুর মেলাচ্ছে বাকিরা। আদ্রিতাও সুর মেলাচ্ছে, তবে মনে মনে। সে বন্ধুদের সাথে উপভোগ করে, কিন্তু তার প্রকাশটা কম। অনেকেই মনে করে সে খুব গম্ভীর এবং অসামাজিক। হয়তো দুটোই সত্যি। কিন্তু স্বভাব তো আর সহজেই পালটানো যায় না।

গানের সুরে সুরে, বাতাসের স্রোত কাটিয়ে গাড়িটা চলছে। ফারহান একের পর এক ছবি তুলছে। টি-শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট পরে, মাথার খোলা চুল উড়িয়ে কঙ্কা একের পর এক গান গেয়ে যাচ্ছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে এরচেয়ে আনন্দময় দিন ওর আগে আসেনি।

আদ্রিতার ইচ্ছে করছিল জোরে গান গাইতে। সবসময়ের শান্ত রবিও গলা মেলাচ্ছে কঙ্কার সাথে, সৌমিক তাল দিচ্ছে। আদ্রিতাও গাইতে শুরু করল হঠাৎ করে। তাতে একটু অবাক হয়ে পরক্ষণেই তাকে জড়িয়ে ধরল কঙ্কা।

গান চলতে থাকল, গাড়ির চাকা চলতে থাকল।

ঠিক দুপুরের আগে আগে গাড়িটা থামল। না থেমে উপায়ও নেই। খিদে পেয়েছে সবার। সামনে ছোট একটা বাজার। সেখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সেরে নিতে হবে। এছাড়া এখান থেকেই টুকটাক জিনিসপত্র কিনে নেবে বলে প্ল্যান করেছে সৌমিক। জঙ্গলের খুব ভেতরে হয়তো নিজেদেরই রান্না করে খেতে হবে।

বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি খাবার হোটেল। ভাত, গরুর মাংস আর ডাল দিয়ে খাওয়া সারল ওরা। গরুর মাংসে খুব ঝাল ছিল, তবু খেয়ে খুব ভালো লেগেছে সবার। ফারহান ছবি তুলছে একের পর এক। রবি সিগারেট ধরিয়ে

কিছু একটা ভাবছে। আর সৌমিক বাজার থেকে এটা-সেটা কিনছে। কেনার তেমন কিছু নেই। কিছু বিস্কুটের প্যাকেট, চিপস, চানাচুর এসব।

খাওয়া-দাওয়া শেষে সবারই বেশ অলস লাগছিল। কিন্তু মং সেন তাড়া দিল। রওনা দিতে হবে এক্ষুনি। নইলে রাত হয়ে গেলে সমস্যা হবে।

গাড়ি নিয়ে আবার রওনা দিল ওরা। গাড়ির গতি খুব বেশি নয়। রাস্তায় অন্যান্য গাড়িও তেমন নেই। এখানে খুব বেশি লোকজন আসে বলে মনে হয় না।

সন্ধ্যার আগে আগে মং সেন গাড়ি থামাল।

'আজকে রাতটা আমরা একটা বাসায় থাকব,' মং সেন বলল, 'এটা আমার এক দাদার বাসা। দাদা শহরে থাকেন। বাসাটা ফাঁকা থাকে। রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালে আমরা আবার রওনা দেব।'

'গাড়ি?' ফারহান জিজ্ঞেস করল।

'এরপর আর গাড়ি যাবে না,' মং সেন বলল, 'ওর ভাড়া দিয়ে দিতে হবে।'

অর্থকড়ির দায়িত্বে আছে সৌমিক। সে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিল। ড্রাইভার ছেলেটা বাংলা বুঝলেও ভালো বলতে পারে বলে মনে হলো না। এরকম একটা রাস্তার পাশে ওদের রেখে যাচ্ছে বলে ছেলেটাকে খুব একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হলো না আদ্রিতার কাছে। ছেলেটা মং সেনের সাথে ওদের ভাষায় কিছু একটা নিয়ে তর্কাতর্কি করল। তবে মং সেন বেশ ঠান্ডা মাথায় ভাড়া বুঝিয়ে দিয়ে ওকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সরু রাস্তায় গাড়িটা বেশ কষ্ট করে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ড্রাইভার।

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর প্রথমবার নিজেকে খুব একা মনে হতে লাগল আদ্রিতার কাছে। কঙ্কার অনুভূতিও সম্ভবত একইরকম। মেয়েটা তার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে দূরের পাহাড়ের আড়ালে। মেয়েরা শুধু নিজেদের ব্যাগ নিয়েছে। তাঁবু আর অন্যান্য ব্যাগগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে ফারহান, রবি, সৌমিক আর মং সেন।

সামনের রাস্তাটা গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত নয়। খাড়া আর সরু রাস্তাটা ধরে ঠিক কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছে না আদ্রিতা। এটা যে একটা পাহাড়ের অংশ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। পাহাড়ের মাথায় কি মং সেন-এর দাদার বাড়ি! হতেই পারে।

ছেলেদের বেশ কষ্ট হচ্ছে জিনিসগুলো বয়ে নিতে। অভ্যাস নেই একেবারেই। তবে মং সেন বেশ স্বাভাবিক গতিতেই উপরে উঠছে। তার

পেছনেই রবি, সৌমিক আর ফারহান। আর এরপর আদ্রিতা আর কঙ্কা। ওরা কেউ নিজেদের মধ্যে কোনো কথা বলছে না।

কঙ্কা পাশে হাঁটছে। এরমধ্যেই ওর হাঁপ ধরে গেছে। আদ্রিতার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে।

'আদ্রি, আমার না কেমন জানি ভয় লাগছে,' চাপা গলায় বলল কঙ্কা।

ভয় আদ্রিতারও লাগছে। এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। সন্ধ্যার আগে যে আলোটুকু ছিল, সে আলোটুকু চলে গিয়ে পুরো পৃথিবীটাকে যেন কালো একটা চাদরে ঢেকে দিয়েছে। চারপাশে অনেক ধরনের শব্দ। সেসব শব্দ সবগুলোকে চেনা যাচ্ছে না। ঝিঁঝি পোকার ডাক আর ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে আদ্রিতার মনে হলো এখানে নিশ্চয়ই অনেক বিষধর সাপও আছে। যেকোনো সময় বেরিয়ে আসবে আশপাশের ঝোপঝাড় থেকে। পায়ের উপর দিয়ে সরসর করে চলে যাবে কিংবা প্যাঁচিয়ে ধরবে।

'ভয়ের কিছু নেই,' আদ্রিতা বলল, 'ওরা তো আছেই,' ছেলেদের দেখিয়ে বলল।

'হুঁ,' কোনোমতে উত্তর দিল কঙ্কা। বোঝাই যাচ্ছে ছেলেরা আছে বলেই তার ভয় কমেছে তা নয়।

'অ্যাডভেঞ্চার করতে এসেছিস, ভয় করলে চলবে?'

'আমার না সব ভূতের সিনেমার কথা মনে পড়ছে,' কঙ্কা বলল, 'সেসব সিনেমায় দেখা যায় বন্ধুরা মিলে কোথাও বেড়াতে যায়, তারপর ভূতুড়ে সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে।'

'আমাদের তো সেরকম কিছু ঘটেনি, তাই না?'

'ঘটতে কতক্ষণ?'

কঙ্কার আশঙ্কাকে সঠিক প্রমাণ করতেই যেন চিৎকার করে উঠল কেউ।

রবির কণ্ঠস্বর। পরিষ্কার চিনতে পারল আদ্রিতা। সেই চিৎকারে এমন এক আতঙ্ক মেশানো আছে যে শুনে গায়ের লোম সব দাঁড়িয়ে গেছে। কঙ্কা শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, পেছন থেকে দৌড়ে আসছে কিছু একটা।

আচমকা কী সব ঘটতে যাচ্ছে এসব!



আদ্রিতার মাঝে মাঝে মনে হয় ভয় জিনিসটা আসে নিরাপত্তাহীনতা থেকে। নইলে দুজন পাহাড়ি ছেলের দৌড়ে আসা দেখে ওরা সবাই কেন এতটা ভয় পাবে? ছেলেগুলো আর কেউ নয় মং সেনের পরিচিত। ওদেরকে মং সেন আগেই বলে রেখেছিল এখানে আসতে। তাই ওরা এসেছে।

এই মুহূর্তে আদ্রিতারা বসে আছে বাঁশ দিয়ে তৈরি একটা ঘরে। পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। ঠিক মাঝামাঝি একটা জায়গায় কিছুটা অংশ সমতল। সেখানে পাশাপাশি দুটো ঘর। সামনে ছোট একটা উঠোন।

ঘরগুলোতে ঢোকার দরজা একটাই। তবে জানালা আছে বেশ কয়েকটা। জানালাগুলো খোলা বলে বেশ শীতল বাতাস পাওয়া যাচ্ছিল। আদ্রিতা আর কঙ্কা ঘরে বসে আছে। ছেলেরা উঠোনে আগুন জ্বালিয়েছে। আগুনের পাশে বসে ওরা গল্প করছে। ওদেরকে এরকম নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনায় গল্প করতে দেখে ভালো লাগছে আদ্রিতার।

মং সেন আর তার দুই পরিচিত ছেলে, ওদের নামগুলো আদ্রিতার মনে আসছে না এই মুহূর্তে, উঠোনের একপাশে মাটির চুলোয় রান্না করতে ব্যস্ত। রবি বলল এই ছেলেগুলো তাদের সাথে যাবে। যে পরিমাণ মালপত্র আছে সাথে সেগুলো বহন করার জন্যই আগেভাগে ওদের ঠিক করে রেখেছে মং সেন।

দুটো ছেলেকে দেখে বেশ বোকাসোকা মনে হয়েছে আদ্রিতার কাছে। অপরিচিত মানুষদের সামনে আচমকা এভাবে উপস্থিত হওয়া যে ঠিক নয় এই বোধটাও ওদের নেই। এখন রান্নার কাজে মং সেনকে সাহায্য করছে।

রবি তার উকলেলে বাজিয়ে গান ধরেছে। ফারহান একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছে। আর সৌমিক যে কাজটা করছে সেটা ওর সাথে যায় না। অন্তত আদ্রিতার ধারণা ছিল না সৌমিক এরকম কিছু করবে কখনো। মং সেনের ছেলে দুজন কোত্থেকে যেন কাচের বোতলে পাহাড়ি মদ নিয়ে

এসেছে। ফারহান আর রবি তাতে গলা না ভেজালেও সৌমিক বেশ আনন্দ নিয়ে খাচ্ছে। দেখেই অস্বস্তি হচ্ছিল আদ্রিতার। মদ খেলে মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি হারায় এটা সে জানে, দেখেছে। ছোটবেলায় বাবার যে স্মৃতি মনে আছে, সেখানে মদ ব্যাপারটা ছিল। বাবা প্রায়ই মদ খেয়ে বাসায় ফিরতেন, তা নিয়ে মায়ের সাথে ঝগড়া হতো। এরপর তো একসময় বাবা মারাই গেলেন।

পাহাড়ে, এই অচেনা পরিবেশে ঘুমাতে হবে ভাবতেই অস্থির লাগছিল আদ্রিতার। কিন্তু এ কথা বলাও যাচ্ছে না। কঙ্কা সবসময় বেশ চঞ্চল। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে সেও খুব বেশি আনন্দে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

এই সময় ফারহান ঢুকল ঘরে। হাতে ক্যামেরা ছিল, সেটা দিয়ে পটাপট কিছু ছবি তুলে নিল। অপ্রস্তুত অবস্থায় কোনো ছবি তুলতে রাজি নয় আদ্রিতা, কিন্তু সেটা ফারহানকে কে বোঝাবে। 'ক্যানডিড ছবি' বলে নাকি একটা ব্যাপার আছে। তাতে নাকি ছবি ভালো আসে।

কঙ্কা চুপ করে বসে আছে। ফারহান চলে যাওয়ার পর সৌমিক ঢুকল ঘরে। আদ্রিতার মনে হচ্ছিল সৌমিকের পা কিছুটা টলছে। এরমধ্যে নিশ্চয়ই মদ তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

'তোরা এই অন্ধকারে বসে করছিস কী? বাইরে আয়,' সৌমিক বলল।

'তুই যা। আমরা আসছি।'

'তাড়াতাড়ি আয়,' সৌমিক বলল, 'আজ সারারাত গান আর গল্প হবে।'

এটুকু বলে সৌমিক বেরিয়ে গেল। ওর শেষের কথাগুলোয় উচ্ছ্বাস আর আনন্দ মেশানো ছিল। সেই আবেগটুকু আদ্রিতা আর কঙ্কা দুজনকেই বেশ স্পর্শ করেছে মনে হয়। দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

এমনিতে আজ চাঁদের দেখা নেই। কিন্তু উঠোনের মাঝখানে আগুন জ্বলছে বলে চারপাশ বেশ আলোকিত।

রবি উকলেলে বাজানো থামিয়ে আদ্রিতাকে পাশে বসার জন্য ইশারা করল। কঙ্কা বসল ফারহানের পাশে। সৌমিক কাচের বোতল থেকে ঘোলাটে সাদা পানীয় ঢেলে নিয়েছে ছোট একটা গ্লাসে, সেটা চালান করে দিল পেটে। এক গ্লাস বাড়িয়ে দিল রবির দিকে। রবিও সেটা এক ঢোকে খেয়ে নিল। খাওয়ার পর ওর চেহারার ভাবভঙ্গি দেখেই আদ্রিতা বুঝতে পারল জিনিসটা খেতে খুব সুখকর কিছু নয়। ফারহানই বা বাকি থাকবে কেন? সেও সৌমিকের কাছ থেকে এক গ্লাস খেল।

কঙ্কা উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠোন জুড়ে হাঁটছে এক পা দুই পা করে। ওকে খুব অস্থির দেখাচ্ছিল হঠাৎ করেই। তারপর হুট করে এসে বসল ফারহানের পাশে।

'ফারহান,' কঙ্কা বলল, 'চল আমরা ঢাকায় ফিরে যাই।'

সবাই তাকাল কঙ্কার দিকে। এতে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল কঙ্কা, সামলে নিল দ্রুতই।

'সত্যি বলতে কী, আমার কেন জানি ভালো লাগছে না।'

'তোকে তো আগেই বলেছিলাম,' ফারহান বলল, 'এসব জার্নিতে ফাইভ স্টার হোটেল পাওয়া যাবে না, সুইমিং পুল, জাকুজ্জি থাকবে না। সকালে ফ্রি ব্রেকফাস্ট থাকবে না, ঘুমাতে হবে মেঝেতে। বলিনি?'

'বলেছিলি, কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'আমার কেন জানি ভয় লাগছে।'

'কীসের ভয়?'

'জানি না,' চাপাকণ্ঠে বলল কঙ্কা।

'ভয়কে জয় কর দোস্ত,' ফারহান বলল, 'আমরা আছি না।'

ফারহানের শেষের কথাটাতেই যেন ভরসা ফিরে এলো কঙ্কার মাঝে।

'তাহলে আমাকেও দে এক গ্লাস,' কঙ্কা বলল।

'এক গ্লাস! পারবি?'

'তোরা পারলে আমিও পারব।'

ফারহান এক গ্লাস পানীয় এগিয়ে দিল কঙ্কার দিকে। সেটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কঙ্কা। তারপর এক ঢোকে পুরোটা গিলে ফেলল। সাথে সাথেই চোখ-মুখ কুঁচকে গেল ওর। উঠে দৌড়ে গেল এক ঝোপের পাশে। উবু হয়ে বসে বমি করে ফেলল। আদ্রিতা ওর পাশে গিয়ে বসল। সাথে করে এক বোতল পানি নিয়ে এসেছে। সেই পানির ছিটে দিল কঙ্কার চোখে-মুখে।

'এই জিনিস মানুষ খায়! ওয়াক থু।'

আদ্রিতা হেসে ফেলল ওর কথার ভঙ্গিতে। দুজনে এসে আবার বসল বাকিদের সাথে।

মং সেন উঠোনের অন্যপাশে স্থানীয় দুই ছেলের সাথে কথা বলছিল। তবে কথা বললেও ওর মনোযোগ যে তাদের দিকে সেটা বুঝতে পারছিল আদ্রিতা।

'রবি,' আদ্রিতা বলল চাপা স্বরে, 'এই ছেলেগুলোকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

'কেন বল তো?'

'মানে আমরা তো ওদের চিনি না, জানি না,' আদ্রিতা বলল, 'ওরাও আমাদের চেনে না। এখন যদি আমাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলে রেখে যায়, কেউ তো জানতেও পারবে না। সবাই জানবে আমরা পাহাড়ে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছি।'

'আরে না,' রবি বলল, 'সেটা হয় নাকি? ওরা সহজ-সরল মানুষ। দেখছিস না, ঐ ছেলে দুটো ঠিকমতো বাংলাও বলতে পারে না। কোনোদিন এখান থেকে শহরে যায় বলেও মনে হয় না। ওরা আমাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে কী করবে?'

'তাও ঠিক,' আদ্রিতা বলল।

'তুই বেশি ভাবিস,' ফারহান বলল, 'আমরা তিন তিনটা জোয়ান ছেলে, ওরা পারবে আমাদের সাথে? আর সৌমিক আর আমি তো জিম করি নিয়মিত। আমাদের মাসল দেখবি?'

'না রে ভাই, তোর মাসল দেখার কোনো শখ আমার নেই,' কঙ্কা বলল, 'ঐ শুকনো পাতলা শরীরে কতটুকু মাসল আছে জানা আছে।'

'তুই কিন্তু আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছিস,' ফারহান বলল, 'আমি কিন্তু এখুনি দেখাতে পারি। দেখবি? আচ্ছা, সৌমিক, তুই দেখা।'

'তোরটা তুই দেখা,' সৌমিক বলল, 'তবে আসলে চিন্তার কিছু নেই। আমাদের একটু চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। দুনিয়ার কোনো মানুষের উপরই ভরসা করা যায় না।'

'দোস্ত,' রবি বলল, 'অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে এত ভয় পেলে চলবে না। তাহলে ঘরের মধ্যে বন্দি থাকাই ভালো।'

'কিন্তু সাবধান হতে তো দোষ নেই, তাই না?' আদ্রিতা বলল।

'আচ্ছা, এসব আলাপ বাদ, ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য বলি,' রবি বলল, সবার দিকে তাকাল। দেখতে চাইছে কারও আগ্রহ আছে কি না। আদ্রিতা ছাড়া বাকি তিনজন বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'এই বান্দরবানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিমানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে,' রবি বলল, 'কিছুদিন আগেই পত্রিকায় একটা ফিচার পড়েছি। এছাড়া এই বান্দরবানেই কিন্তু দারুণ একটা গুপ্তধন আছে।'

'কীসের গুপ্তধন? কার গুপ্তধন?'

'পর্তুগিজ জলদস্যু তিবাও-এর নাম শুনেছিস?' রবি জিজ্ঞেস করল।

'জীবনেও না,' নির্দ্বিধায় বলে দিল ফারহান।

'তাহলে এবার শোন,' রবি বলল, 'এই লোক ছিল জলদস্যু। সন্দীপ এলাকা ছিল তার দখলে। সেখান থেকে সে পুরো বাংলায় ডাকাতি করে

বেড়াত আর তাকে আশ্রয় দিত সেই আমলের আরাকান রাজা। কিন্তু একসময় দুই পক্ষের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হলো। তিবাও তার সব সম্পদ এই বান্দরবানের কোথাও লুকিয়ে রাখল। সেই সম্পদ কিন্তু এখনও কেউ খুঁজে পায়নি।'

'এসব গালগল্প কেউ বিশ্বাস করে নাকি?' সৌমিক বলল।

'ধর, আমরা যদি এই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যাই, কেমন হবে?' রবি বলতে থাকল, 'আমি একটা মার্সিডিজ কিনব, তোকে গুলশানে সুইমিং পুলসহ একটা ফ্ল্যাট কিনে দেব...'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল না দিয়ে এখন একটা গান ধর,' কঙ্কা বলল।

রবি বুঝতে পারছে তার এইসব গল্পে কাজ হবে না। উকলেলে বের করে সে একটা লোকগীতি ধরল। সেই লোকগীতির তালে ফারহান নাচতে শুরু করল, তার সাথে কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগ দিল কঙ্কা। সৌমিকও বসে রইল না। সেও যোগ দিল। আদ্রিতার হাত ধরে বেশ কয়েকবার টানাটানি করল কঙ্কা। কিন্তু এসবে তার অস্বস্তি লাগে। সে বসে বসে বন্ধুদের নাচ আর গান উপভোগ করতে লাগল।

আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে, সুন্দর বাতাস বইছে। আদ্রিতা চোখ বুজে বাতাসের স্পর্শ উপভোগ করছে, মনে হচ্ছে কেউ নরম হাতের আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে তার চোখে-মুখে।

নাচ-গান শেষে বেশ রাত করে ঘুমাতে গেল ওরা। একটা রুমে আদ্রিতা আর কঙ্কা, অন্য রুমে বাকি সব ছেলেরা।

ছোট জানালাটা খোলা, চাঁদ দেখতে দেখতে আর বাতাসে এলোমেলো হতে হতে ঘুমিয়ে পড়ল আদ্রিতা। অনেক রাতে ঘুমের মধ্যেই কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ঠিক তার মুখের উপর উবু হয়ে আছে একজন মানুষ। গভীরভাবে দেখছে তাকে। ধড়মড় করে উঠে বসল।

কঙ্কা পাশে নিঃসাড় ঘুমাচ্ছে। চারপাশে কোনো শব্দ নেই। কাউকে ডাকবে কি না বুঝতে পারছে না। সবাই নিশ্চয়ই গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আবার শুয়ে পড়ল আদ্রিতা। অনুভূতিটা এত মারাত্মক ছিল যে ব্যাপারটাকে স্বপ্ন ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কেউ কেন এরকম করবে? এত সাহস কার আছে?

এসব ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমের দেশে তলিয়ে গেল সে। আরও প্রায় অনেকক্ষণ পর এক ছায়ামূর্তি পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল তার রুম থেকে।



চারপাশে উঁচু পাহাড়, সবুজ আর সবুজ। পাহাড় আর মেঘ যেন ভাই-বোন, একজন আরেকজনের হাত ধরে গল্প করছে যেন। আদ্রিতার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। বরং ইচ্ছে করছে ছুটে বেড়াতে। বন্ধুরা সবাই আশপাশেই আছে। কঙ্কা আর আদ্রিতার উপর কোনো মালপত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ওগুলো ছেলেরা সব ভাগ করে নিয়েছে। মং সেনের সাথে আসা দুজনের উপর দেওয়া হয়েছে তাঁবুগুলোর দায়িত্ব। ছোটখাটো আর বয়স কম হলেও দুজনেই বেশ শক্তিধর। ওরা বেশ স্বাভাবিকভাবেই বোঝাগুলো টেনে চলেছে।

শেষ গ্রামটা পার হয়েছে অনেকক্ষণ আগে। গ্রাম বলতে গোটা কয়েক ঘর। একপাশে ছোট কয়েকটা দোকানপাট। এখানে বাঙালি সাধারণত আসে না। উল্লেখযোগ্য কোনো ঝরনা নেই, কিংবা থাকলেও তার খবর পর্যটকদের কাছে পৌঁছায়নি। না হলে তাদের ফেলে যাওয়া চিপসের প্যাকেট, সিগারেটের ফিল্টার আর পানির খালি বোতল অবশ্যই পাওয়া যেত।

দলটা এগোচ্ছে সারিবদ্ধভাবে। সবার শুরুতে আছে মং সেন, তার পেছন পেছন ফারহান, রবি, আদ্রিতা, কঙ্কা, সৌমিক, পেছনে মং সেনের সাথে আসা ছেলে দুটো। ওদের নামগুলো শোনা হয়নি। ওরা ঠিকঠাক বাংলা বোঝে বলেও মনে হয়নি আদ্রিতার কাছে।

সেই সকাল থেকে হাঁটতে শুরু করেছে। এখন প্রায় বারোটার মতো বাজে। ফারহান যাত্রা বিরতি নেওয়ার কথা কয়েকবার বলেছে, কিন্তু মং সেন থামতে চাচ্ছে না। আরেকটু এগিয়ে গেলেই নাকি সুন্দর একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে, সেখানেই বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলছে।

আদ্রিতার থামতে ইচ্ছে করছে না। সকালে পোশাক পালটে নিয়েছে, পরেছে ট্রাউজার আর টি-শার্ট, মাথায় ক্যাপ। কঙ্কার পোশাকও এক। রওনা দেওয়ার আগে ঢাকার নিউমার্কেট থেকে কিনে এনেছিল। খুব কাজের কাজ

হয়েছে। সালোয়ার-কামিজ পরে এসব জায়গায় চলাচল করা খুব কঠিন কাজ হয়ে যেত।

কঙ্কা গুনগুন করে গান গাচ্ছে আর মাঝে মাঝে আদ্রিতাকে চিমটি কাটছে। তাতে বিরক্ত না হয়ে বরং উপভোগই করছে আদ্রিতা। রবিকে কিছুটা চিন্তিত কিংবা বিরক্ত দেখাচ্ছে। সৌমিকের চোখে-মুখ দেখে ওর মনে কী চলছে বোঝা যায় না। তবে দেখে মনে হচ্ছে সে কোনো হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত।

একটানা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে উপরে উঠছে ওরা। সরু পায়ে চলা পথ, দুপাশে ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে তক্ষক ডাকছে দূরে, এছাড়া পাখপাখালিদের কলকাকলি তো আছেই। শেষবার কবে প্রকৃতির এতটা কাছাকাছি এসেছিল মনে নেই আদ্রিতার। নানাবাড়িতে গিয়েছিল, নেত্রকোনায় সেই গ্রামের বাড়িতে, সেটাও প্রায় বছর দশেক আগে। তারপর থেকে একঘেয়ে ঢাকায়। এরকম একটা যাত্রায় না এলে জানাই হতো না, পাখির ডাক, রাতের নীরবতা আর বাতাসের ঘ্রাণ এগুলো জীবনের জন্য কতটা প্রয়োজন।

অবশেষে মং সেন তার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছল।

জায়গাটা গোলাকার। চারপাশের ঝোপঝাড়ের মাঝখানের ফাঁকা গোলাকার জায়গাটা শুধু বড় বড় ঘাসে আবৃত। আলো, বাতাস আর বৃষ্টির পানিতে ঘাসগুলো বেশ অবাধে বড় হয়ে উঠেছে এখানে। মং সেন ইশারা করতেই ছেলে দুটো ব্যাগপত্র নামিয়ে রাখল। ওরা সাথে করে কিছু খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে। সেগুলো ঘাসের উপর বিছাল।

রবি আর সৌমিক ব্যস্ত হয়ে পড়ল রান্নাবান্নায়। সাথে করে পোর্টেবল স্টোভ নিয়ে এসেছে। তাতে খুব বড় ধরনের রান্না করা যাবে না। অবশ্য এসব জায়গায় এসে বিরিয়ানি খাওয়ার আশা করাটাও বোকামি। রবি আর সৌমিকের সাথে আদ্রিতাও হাত লাগাল।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটখাটো একটা ক্যাম্প তৈরি হয়ে গেল। মং সেনের ছেলে দুটো রবির তত্ত্বাবধানে দুটো তাঁবু খাটিয়ে ফেলেছে।

তাঁবুর ভেতর ঢুকে বেশ নিরাপদ আর শান্তি অনুভব করল আদ্রিতা। ছোটখাটো তাঁবু, তবে দুজনে হয়ে যাবে। ওরা তিনজন এক তাঁবুতে কীভাবে ঘুমাবে কে জানে? আদ্রিতা তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে বেশ বড় একটা নেইল কাটার। জিনিসটা শুধু নখ কাটতে ব্যবহার করা হয় তা নয়, সাথে ছোট কিছু ধারালো চাকুও আছে। নেইলকাটারটা কী মনে করে জিন্সের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

এমনিতে সাজগোজ নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করে না আদ্রিতা, কিন্তু একটানা হাঁটাহাঁটিতে চোখ-মুখ কেমন শুকিয়ে এসেছে। একটা ক্রিম মাখল মুখে, সানস্ক্রিন। রোদের যে তাপ তাতে মুখের চামড়া পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। মুখে ক্রিম মাখতে মাখতেই কঙ্কা এসে ঢুকল তাঁবুতে। আদ্রিতার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে বেশ অবাক দৃষ্টি।

'তুই আবার কবে থেকে এত ত্বকের যত্ন নেওয়া শুরু করলি?' অবাক হয়ে বলল কঙ্কা। 'ঘটনা কী বল তো? তিনজনের মধ্যে তোর কাকে পছন্দ?'

আদ্রিতা হাসল। একমাত্র রবিকেই তার অল্পস্বল্প পছন্দ হয়। কিন্তু সেটা সবসময় নয়। রবি একদম অগোছালো, উড়নচণ্ডি ধরনের ছেলে। প্রেম-ভালোবাসা কী জিনিস এটা বোঝে বলেও মনে হয় না। আর এধরনের অদ্ভুত মনমানসিকতার ছেলের জন্য মানসিকভাবে নিজেকে কোনোরকম কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে হয় না।

'আরে না, দেখছিস না কী রোদ, একটু সানস্ক্রিন মেখে নিলাম,' আদ্রিতা বলল।

কঙ্কা একপাশে কাত হয়ে বসল।

'তাঁবুটা এত ছোট!' কঙ্কা বলল, 'আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছে এখনি।'

'আপাতত এটাই আমাদের বাসস্থান,' আদ্রিতা বলল।

তাঁবুর একপাশে ছোট একটা জানালার মতো আছে, সে জানালাটা খুলে দিল কঙ্কা। বাইরেটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রবি আর সৌমিক রান্নায় ব্যস্ত, ওদের সাহায্য করছে মং সেন। ফারহান একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওর হাতে ক্যামেরা। একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছে।

'চল, বাইরে চল,' কঙ্কা বলল।

কঙ্কার সাথে বাইরে এলো আদ্রিতা। রোদ আছে, চমৎকার বাতাসও আছে। একটু আগের ক্লান্তি ভাবটা চলে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপুরের খাবারের আয়োজন হয়ে গেল। খিচুড়ি আর ডিম। ছেলেরা যে এত ভালো রান্না করতে পারবে ধারণাই ছিল না আদ্রিতার।

খেয়েদেয়ে সবাই বেশ ক্লান্ত হয়ে বসে রইল একসাথে। টুকটাক আলাপ হতে লাগল নিজেদের মধ্যে। মং সেন তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে আলাদা বসেছে। ওরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় কথা বলছে। আদ্রিতা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সেদিকে। এই বাড়তি লোকগুলোর কারণে পুরোপুরি স্বাধীন অনুভব করা যাচ্ছে না। বারবার মনে হচ্ছে ওরা যেন

লুকিয়ে দেখছে তাকে আর কঙ্কাকে। অবশ্য ওদের ছাড়া এরকম একটা ভ্রমণে বের হওয়াও অসম্ভব একটা কাজ। যে পরিমাণ মালপত্র সাথে আছে তা নিয়ে ঘোরাফেরা করা খুব কঠিন ব্যাপার।

'শোন, এটা হচ্ছে আমাদের বেস ক্যাম্প,' রবি বলল, 'জিনিসপত্র নিয়ে বারবার এদিক-সেদিক যাওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে। তাঁবুগুলো এখানেই থাকবে, বাকিসব মালপত্রও। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও এখানেই হবে। আমরা সকাল সকাল ঘুরতে বের হবো। সন্ধ্যার আগে আগে এখানে ফিরে আসব। বুদ্ধিটা কেমন?'

'বুদ্ধিটা ভালো,' সৌমিক বলল, 'কিন্তু কখনো যদি ফিরতে দেরি হয়ে যায় কিংবা পথ হারিয়ে ফেলি?'

'পথ হারাব কেন? আমাদের সাথে মং সেন তো আছেই,' রবি বলল।

রবির বুদ্ধিটা ভালো এটা স্বীকার করতে হলো সবাইকে। এখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই। এসব কথাবার্তা সব ভিডিও রেকর্ড করে রাখছে ফারহান। মাঝে মাঝে এর-ওর মুখের সামনে ক্যামেরা ধরছে। ওকে বারণ করে লাভ নেই। তাহলে আরও বেশি বিরক্ত করবে।

'ম্যাডাম, এখানে আসার পর আপনার অনুভূতি কী? একটু বলবেন?' টেলিভিশন সাংবাদিকদের মতো প্রশ্ন করল ফারহান, আদ্রিতার মুখের সামনে মোবাইল ফোনটা ধরে রেখেছে।

আদ্রিতা হাসল। চমৎকার কিছু স্মৃতি তৈরি হচ্ছে। সময় বদলে যাবে, মানুষ বদলে যাবে। এই ফারহানই হয়তো গম্ভীরমুখো বাবা হবে, কেউ ওর সামনে হেসে কথা বলতে পারবে না। কঙ্কার সাথে একসময় হয়তো দেখাই হবে না। রবি হয়তো বিদেশ চলে যাবে, সৌমিক হয়তো ফিরে যাবে মফস্‌সলে। সে নিজেও কোথায় যাবে, কী করবে কে জানে! তাই চমৎকার এইসব স্মৃতিগুলো মাথায় গেঁথে নেওয়া দরকার। কিন্তু মানুষের মন আর মস্তিষ্ক এমন আজব এক কারবার যেকোনো স্মৃতি রাখা দরকার আর কোনটা নয়, এটাও মাঝে মাঝে আলাদা করতে পারে না।

হাসি-আনন্দে আর গানে দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যা এলো, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। আজকের দিনের কথা অনেকদিন মনে থাকবে আদ্রিতার। তবে রাত মানেই তো অন্ধকার আর অন্ধকার মানেই রহস্য।

গভীর রাতে আদ্রিতার ঘুম ভাঙল, অচেনা এক অনুভূতিতে।

ছোট তাঁবুর ভেতরও বেশ চমৎকার জায়গা হয়ে গেছে দুজনের। দুজন পাশাপাশি শুয়েছে। ইচ্ছে ছিল খুব গল্প করবে তাঁবুতে ঢুকে। কিন্তু সারাদিন

হাঁটাহাঁটি, রান্নাবান্না আর আড্ডায় বেশ ক্লান্ত লাগছিল। কঙ্কার সাথে কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে গেছে টেরই পায়নি।

কয়টা বাজে কোনো ধারণা নেই আদ্রিতার। শুধু মনে হচ্ছে এখন অনেক রাত। বাইরে কীসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেকগুলো লোক কথা বলছে। তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখবে কি না বুঝতে পারছে না। সাথেই একটা টর্চলাইট আছে। ছেলেদের তাঁবুটাও কাছাকাছি, ঠিক উলটোদিকেই। ওদের কাউকে জাগানো যায়। তবে ব্যাপার হচ্ছে এসব করার আদৌ প্রয়োজন আছে কি না সেটাই বুঝতে পারছে না। মং সেন আর তার দুই সঙ্গী খোলা জায়গায় শুয়েছে, ওরাই হয়তো রাতবিরেতে তর্ক করছে নিজেদের মধ্যে। এছাড়া আর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছে না আদ্রিতা।

ছোট জায়গাটায় চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে আছে সে এখন। মানুষের কথা বলার শব্দ এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অন্য একটা অনুভূতি হচ্ছে। চোখ খুলল সে। তাঁবুর বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া পড়েছে তাঁবুর উপর। একজন না, মনে হচ্ছে বেশ কয়েকজন। আতঙ্কে অস্থির লাগছিল আদ্রিতার। কঙ্কার গায়ে বেশ কয়েকবার ধাক্কা দিল। কাজ হলো না। মেয়েটা গভীর ঘুমে অচেতন।

আদ্রিতা তাকিয়ে রইল। ভয় পেলে চলবে না। তার সাথে ছেলে বন্ধুরা আছে। একটা চিৎকার দিলেই ওরা নিশ্চয়ই জেগে যাবে। নাকি ওরাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ফারহানের কথা বলা যায় না। নিশাচর ছেলে। ওর তালের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। হয়তো এই মুহূর্তে ছবি তুলছে ওর দামি ক্যামেরায়। জিজ্ঞেস করলে বলবে, এরকম একটা জায়গায় রাতের স্মৃতি তুলে রাখছি।

তাঁবুর বাইরে যে ছায়ামূর্তি সেটা সরে গেল। আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আদ্রিতা। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। ভোর রাতের দিকে অদ্ভুত আরেকটা শব্দে তার ঘুম ভাঙল। মনে হলো কেউ চিৎকার করে উঠেছে কোথাও। আশপাশে কোনো শব্দ নেই বলেই হয়তো চিৎকারটা এত জোরে শোনা যাচ্ছে। কঙ্কাও ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে আদ্রিতার দিকে।

বাইরে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। এখন আর বের হতে কোনো সমস্যা নেই। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো দুজন। দেখল ফারহান আর সৌমিক দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে তাকিয়ে আছে সামনের পাহাড়ের দিকে, অবাক চোখে।

আদ্রিতা গিয়ে সৌমিকের পাশে দাঁড়াল।

'চিৎকারটা শুনেছিস?' আদ্রিতা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' সৌমিক বলল, 'যা, আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নে।'

'কিন্তু চিৎকারটা কীসের?'

'পশু-পাখি বা বন্য জন্তুর হতে পারে, তোর কী ধারণা?'

'আমার তো মনে হয়েছে মানুষের চিৎকার।'

সৌমিক তার সঙ্গী তিন বন্ধুর দিকে তাকাল।

ফারহান হাসল।

'আরে, মানুষ কেন এভাবে চিৎকার দেবে? শেয়াল-টেয়াল কিছু হবে, কি বলিস সমু?'

সমু অর্থাৎ সৌমিক মাথা নাড়িয়ে সায় দিল সে কথায়। এই সময় মং সেনকে আসতে দেখা গেল। চোখ ডলতে ডলতে আসছে।

'আপনারা এই ভোরেই উঠে পড়েছেন, বাহ!' মং সেন বলল, তার কণ্ঠে বেশ প্রশংসা ঝরে পড়ল।

'এখানে এসে ঘুমিয়ে কাটাব নাকি?' ফারহান বলল, 'আচ্ছা, আপনি কী ঐ চিৎকারটা শুনেছেন?'

'কোন চিৎকার?'

'একটু আগে হলো যেটা।'

'আপনারা কী ভয় পেয়েছেন নাকি? ভয়ের কিছু নেই,' মং সেন বলল, 'জঙ্গলে কত ধরনের জন্তু-জানোয়ার থাকে। ওদের কারও শব্দ শুনেছেন।'

'মানুষের মতো মনে হলো।'

'মানুষের চিৎকার আমি চিনি,' মং সেন বলল, 'অচেনা পরিবেশে আছেন তো, তাই এরকম মনে হচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। আমি নাশতার ব্যবস্থা করছি, আসুন।'

আদ্রিতা আর কঙ্কা আবার নিজেদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। কঙ্কা শুয়ে পড়ল আর সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল। আদ্রিতা ঘুমাল না। তার ঘুম আসছিল না কেন জানি। মনে হচ্ছে সামনে খুব খারাপ কিছু ঘটবে। এরকম অনুভূতি হচ্ছে কেন কে জানে!



মোহাম্মদ রফিক পালিয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। ভেবেছিল পাহাড়ে টিকে থাকা কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু সারাজীবন আলসেমি করে কাটিয়ে দেওয়া রফিক দুই-একদিনের মধ্যেই টের পেল, কাজটা খুব কঠিন। দুবেলা ভাত ছাড়া তার চলে না। অথচ পলানোর পর বেশ কয়েকদিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত ভাতের দেখা পায়নি। ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছিল সাথে করে। তাতে শুকনো খাবার ছিল বেশ। সেগুলো এখন শেষের পথে। দরকারি জিনিস হিসেবে নিয়ে এসেছিল একটা টর্চলাইট, স্যাভলনের বোতল, কার্বলিক সাবান আর একটা ছুরি। টর্চলাইটটা বেশ কাজে লাগছে, ছুরি ব্যবহার করতে হয়নি এখনও।

এরমধ্যে কাজের কাজ একটা হয়েছে। পাঁচজন ছেলে-মেয়ের একটা দলকে দেখতে পেয়েছে। সাথে কয়েকজন স্থানীয় লোকজনও আছে। ওরা একটা খোলা জায়গায় ক্যাম্প করেছে। দূর থেকে ওদের অনুসরণ করেছে সে। দিনে-দুপুরে ওদের কাছাকাছি যাওয়ার সাহস করেনি। ইচ্ছে ছিল রাতে যাওয়ার। কিন্তু গাছের আড়ালে হেলান দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। ঘুম ভাঙল ভোর রাতের দিকে। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রফিক। ক্যাম্পের ঠিক মাঝখানে রান্নাবান্না করে ওরা খেয়েছে। সেখানে হয়তো বাড়তি কিছু পড়ে থাকতে পারে। কোনো শব্দ যেন না হয় তাই খুব সাবধানে পা ফেলে ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এলো সে। টর্চের আলো ফেলে এগোচ্ছে একটু একটু করে।

স্থানীয় ছেলেগুলো খোলা জায়গায় ঘুমাচ্ছে। ঠিক মাঝবরাবর রান্নাবান্না হয়েছিল। সেখানে এখনও নিভুনিভু করে আগুন জ্বলছে। পা টিপে টিপে সেদিকে এগোলো রফিক। হাঁড়িপাতিল দেখা যাচ্ছে, প্লেট দেখা যাচ্ছে। হয়তো খাবার থাকতেও পারে। এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে জানলে পুলিশের হাতেই ধরা দিত। সহকর্মীরা নিশ্চয়ই তাকে না খাইয়ে রাখত না, মারধোরও করত না।

যাই হোক, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একবার। তারপর এগিয়ে গেল। ডানদিকের তাঁবু পার হয়ে একটু এগোতেই দেখল স্থানীয় ছেলেদের একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। সরাসরি তাকিয়ে আছে তার দিকে। ছেলেটার হাতে ছোট একটা ছোরা। কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল রফিক। টর্চের আলো ফেলল ছেলেটার মুখের দিকে। তাতে হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল ছেলেটা আর তখনই ওর কবজিতে আঁকা মূর্তির চিহ্নটা চোখে পড়ল।

এই ছেলেটাই 'গুলটু মিয়ার খুনি! কোনো সন্দেহ নেই! তাকে যে চিনে ফেলেছে ছেলেটা তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আচমকা এরকমভাবে ছেলেটাকে পেয়ে যাবে সেটা কল্পনাও করেনি রফিক। কাজেই কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ব্যাগের ভেতর ছুরিটা আছে, কিন্তু কাপড়-চোপড়ের মাঝখান থেকে সেটা বের করে আনা কঠিন কাজ হবে। ততক্ষণে এই ছেলেটা খারাপ কিছু করে বসতে পারে।

ছেলেটা যে তাকে চিনে ফেলেছে এতেও কোনো সন্দেহ নেই। এগিয়ে আসছে তার দিকে। এক পা এক পা করে পিছাচ্ছে রফিক। খুনি এই ছেলেটার সাথে সরাসরি মোকাবিলায় সে পারবে না। এর চেয়ে পলানো ভালো। ঘুরে দৌড় দিল।

ছেলেটাও এগিয়ে আসছে। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ছেলেটা এখন দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি নয়। এসময় যা আশা করেনি, তাই হলো। ছেলেটা ওর হাতে থাকা ছোরাটা ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

প্রচণ্ড গতিতে ছোরাটা এসে রফিকের ডান পায়ে বিঁধল। চিৎকার করে পড়ে গেল সে। উঠে আবার দৌড়াতে শুরু করল। ডান পায়ে কোনো শক্তি পাচ্ছে না। ছোরাটা পায়ে বিঁধে আছে, রক্ত ঝরছে ক্রমাগত। কিন্তু যেমন করেই হোক, এখান থেকে সরে যেতে হবে।

তার চিৎকারেই সম্ভবত ক্যাম্পের লোকজন জেগে গেছে। তাই ছেলেটাকে তার পিছু নিতে দেখা গেল না। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। প্রাণপণ দৌড়াতে দৌড়াতে মোহাম্মদ রফিক প্রতিজ্ঞা করল, এই ছেলেটাকে সে নিজ হাতে খুন করবে।



সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে ওরা। মং সেন সবার আগে হাঁটছে, ওর হাতে ছোট একটা লাঠি। ওর পেছনে ফারহান, রবি, মাঝখানে কঙ্কা আর আদ্রিতা, পেছনে সৌমিক। মং সেনের সাথের ছেলেগুলোকে সকাল থেকে দেখা যায়নি। ওরা নাকি ওদের গ্রামের দিকে গেছে। এখন যেহেতু মালপত্র বওয়ার আর ঝামেলা নেই, তাই কয়েকদিন পরে আসবে। ফিরে যাওয়ার সময়। এতে একদিক থেকে আদ্রিতা খুশিই হয়েছে। বাড়তি চারটি চোখ তাকাচ্ছে কি না সে চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়েছে।

অন্যান্য পর্যটকরা যেসব পথে চলাচল করে, ওরা সেসব পথের ধারে কাছেও নেই। এখানে জায়গায় জায়গায় আর্মিদের ক্যাম্প আছে বলে শুনেছে। সেসব ক্যাম্পে নাম-পরিচয় এসব নাকি পরীক্ষা করে দেখা হয়। এছাড়া স্থানীয় থানায় ছবি তোলা, কোথায় যাচ্ছে সেসব জানিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এসবের কিছুই করা হয়নি। ফারহানকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল আদ্রিতা। ও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। নিজের দেশের ভেতর ঘুরে বেড়াতে এসব নাকি লাগে না। অথচ আদ্রিতার পরিষ্কার মনে আছে, অন্য ডিপার্টমেন্টের এক ছেলের কাছে শুনেছিল এসব করা খুব জরুরি। পথ হারিয়ে গেলে বা খারাপ কিছু হলে অন্তত একটা রেকর্ড থাকে। সেই ছেলেটা বলেছিল ট্যুর ম্যানেজারই নাকি এসব ঝামেলার কাজগুলো সেরে নেয়। অথচ মং সেন এসব কোনোকিছুর ধারকাছ দিয়েই যায়নি। রবি বুদ্ধিমান ছেলে। ওকে বলার পর খুব গম্ভীরভাবে শুনেছিল, কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি। ওর কথা হচ্ছে, ওরা বাকি সব সাধারণ পর্যটকদের মতো নয়। ওরা যেখানে যেতে চাচ্ছে সেটা শুনলে হয়তো অনুমতিই পাওয়া যাবে না। এরচেয়ে না জানিয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

হাঁটতে হাঁটতে পাখির ডাক শুনছিল আদ্রিতা। আশপাশে কোথাও কোনো ঝরনা দিয়ে কুলকুল শব্দে পানি বয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে সেই

পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে। কিন্তু ফারহান কানে হেডফোন দিয়ে হেভি মেটাল গান শুনছে। বাকি দুজনের অবস্থাও কাছাকাছি। ওরা প্রকৃতি দেখছে, কিন্তু অনুভব করছে না।

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক কোথায় যাচ্ছে ধারণা নেই কারও। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর তখন থামল মং সেন। এখানে চারপাশে ঘন হয়ে আছে গাছপালা। ঠিক এখানে দাঁড়ানোর কারণ কী? হাতের ইশারায় সবাইকে নীরব হতে বলল সে। কান থেকে হেডফোন নামিয়ে রাখল ফারহান। কঙ্কা শক্ত করে আদ্রিতার হাত ধরে রেখেছে কোনো এক বিপদের আশঙ্কায়।

কান পেতে আছে আদ্রিতা। পরিচিত শব্দের বাইরে আর কোনো শব্দ নেই। ঠিক তখনই জিনিসটা চোখে পড়ল। গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছে। প্রথমবার দেখে মনে হয়েছিল কুমির। কিন্তু পরবর্তীতে বুঝল জন্তুটা বড় আকারের একটা গুইসাপ। এত বড় হয় এগুলো জানা ছিল না। কঙ্কা এখনও শক্ত করে হাত ধরে রেখেছে।

মং সেনের মুখে হাসি ফুটেছে। সে তার হাতের লাঠিটা সামনে ধরে রেখেছে আর 'হুসহুস' শব্দ করছে। তাতে গুইসাপটা তার গতিপথ পালটে অন্য দিকে চলে যাক সেটাই তার উদ্দেশ্য। মং সেনের দেখাদেখি ছেলেরাও একই রকম শব্দ করতে শুরু করল। গুইসাপটা সম্ভবত বিরক্ত হয়েই তার গতিপথ পাল্টাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের আড়ালে চলে গেল।

'অন্য সময় হলে ওর কপালে দুঃখ ছিল,' মং সেন বলল, 'গুইসাপের মাংস খেয়েছ কখনো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সেই সৌভাগ্য হয়নি,' ফারহান বলল কোনোমতে। কানে হেডফোন গুঁজল আবার।

গুইসাপের মাংস যে খাওয়া যায় সেটাই কখনো ভাবেনি আদ্রিতা। ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠল তার। কঙ্কা স্বাভাবিক হয়েছে। রিনরিনে গলায় বালিকাসুলভ চপলতায় গাইতে শুরু করল— 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে...'

পেছন থেকে সৌম্যিক ওকে থামাল। 'তোর এই বেসুরো গলায় গান গাওয়া বন্ধ করবি?'

এর উত্তরে কঙ্কা কিছু বলল, কথাবার্তা চলতে থাকল। আদ্রিতা হাঁটছে, চারপাশে ওদের কথাবার্তার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সবকিছু হঠাৎ কেমন নীরব হয়ে গেছে।

মং সেন আবার দাঁড়িয়ে গেল। সবাইকে হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বলল। আশপাশে কোথাও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মং সেন দ্রুত একটা গাছের

আড়ালে চলে গেল, ওর দেখাদেখি বাকিরাও আশপাশের গাছগুলোর আড়ালে চলে গেল।

কঙ্কা আর আদ্রিতা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না কেন এমন চোরের মতো লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে ওদের? ওরা তো অপরাধমূলক কোনো কার্যক্রমের সাথে যুক্ত নয়? আর্মি, পুলিশ কারও সাথে দেখা হয়ে গেলে কথা বলবে। এমন তো নয় যে আর্মি বা পুলিশ দেখামাত্রই ওদের গুলি করে মেরে ফেলবে।

বেশ কিছুক্ষণ একদম নীরব কাটল। এরপর আবার শব্দ পাওয়া গেল। বেশ কিছু মানুষের কণ্ঠস্বর পাওয়া যাচ্ছে। আদ্রিতা একবার গাছের আড়াল থেকে দেখার চেষ্টা করল। বেশ খানিকটা দূরে সেনাবাহিনীর পোশাক পরা দুজন তরুণকে দেখা যাচ্ছে। ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। দুজন বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে। ওদের একটু কাছাকাছিই আরও কয়েকজন আছে মনে হচ্ছে।

কথাগুলো শোনার চেষ্টা করেও পরিষ্কার করে কিছু বোঝা গেল না। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে ওরা নিজেদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক করছে। সেনাবাহিনীতে সাধারণত এরকমটা হয় না। উপরের র‍্যাঙ্কের অফিসার যা আদেশ দেবে, তা বিনাবাক্য ব্যয়েই মেনে নেওয়ার কথা নিচের অফিসার বা সৈনিকদের। সম্ভবত যে দুজন কথা বলছে ওদের র‍্যাঙ্ক সমমর্যাদার, ধারণা করল আদ্রিতা।

বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর সেনাবাহিনীর লোকগুলো হাঁটতে শুরু করেছে। আদ্রিতাদের খুব কাছ দিয়েই ওরা যাচ্ছে। দশজনের একটা দল। সাথে বেশ সাজসরঞ্জাম আছে। বোঝাই যাচ্ছে এখানে খুব দরকারি কোনো কাজে এসেছিল। সে কাজ যে হয়নি তা ওদের গম্ভীর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

আদ্রিতারা যে পথে এখানে এসেছে, ঠিক সেই পথ ধরেই সেনাবাহিনীর লোকগুলো যাচ্ছে। বেশ অনেকক্ষণ ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। ওরা চোখের আড়াল হওয়ারও অনেকক্ষণ পর গাছের আড়াল থেকে বের হলো ওরা। দীর্ঘক্ষণ একটানা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আদ্রিতার পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। এছাড়া এখানে বেশ বড়সড়ো আকারের মশা আছে। সেই মশাও যে অনেকবার কামড়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

কঙ্কার অবস্থাও একই। ওর চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে। একটু আগে যে প্রাণবন্ত মেয়েটা গান ধরেছিল, তার সাথে এই কঙ্কার যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

মং সেন আরেকটু এগিয়ে গেল। পা টিপে টিপে অনেক দূর গেল। বাকি সবাই যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বেশ খানিকটা দূর থেকে মং সেন ইশারা করল সবাই এখন হাঁটা শুরু করতে পারে।

দুপুরের রোদ গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে ঠিক মাথার উপর পড়ছে। তৃষ্ণা পেয়েছে খুব। পানির বোতলগুলো সৌমিকের কাছে। ওর কাছ থেকে ইশারায় এক বোতল পানি চেয়ে নিল আদ্রিতা। ঢকঢক করে খেয়ে নিল আর মুখে পানির ছিটা দিল।

'ওরা কী নিয়ে কথা বলছিল শুনেছিস?' জিজ্ঞেস করল সৌমিক।

'কী নিয়ে?' কঙ্কা উলটো জিজ্ঞেস করল।

'জানি না,' সৌমিক বলল, 'তবে যতটুকু বুঝতে পারছি জায়গাটা খুব একটা নিরাপদ না, তোর কী মনে হয়?'

'বুঝতে পারছি না,' আদ্রিতা বলল, 'আচ্ছা, বল তো আমরা ঠিক আছি কোথায়?'

'এটা মং সেন বলতে পারবে,' সৌমিক মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

আদ্রিতার রাগ হচ্ছিল খুব। একজন অচেনা মানুষের পেছন পেছন ওরা ঠিক কোথায় এসেছে এটাও ওরা জানে না। কী অদ্ভুত! সে ভেবেছিল ফারহান বা রবি ছন্নছাড়া প্রকৃতির হলেও সৌমিক ঠিক তেমনটা নয়। বরং অনেক গোছালো আর হিসেবি। এখন দেখা যাচ্ছে সবই একই প্রকৃতির।

'এটা জানা তো জরুরি,' কঙ্কা বলল, 'ধর আমরা কোনো একটা বিপদে পড়লাম, আমরা নিজেরাই তো বলতে পারব না কোথায় আছি।'

'মং সেনের সাথে আলাপ করতে হবে,' সৌমিক বলল।

ওরা হাঁটছে। ফারহান হেডফোন গুঁজে ক্যামেরায় ক্লিক করেই যাচ্ছে, রবি হাঁটছে উদাসভাবে। যেন পৃথিবীর কোনো কিছুতেই ওর কিছু এসে যায় না। সেনাবাহিনীর লোকদের হাতে ধরা পড়াই ভালো ছিল, ভাবল আদ্রিতা। তাহলে হয়তো ওদের একটা শিক্ষা হতো।

সামনে ছোট একটা খালের মতো। খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মং সেন। খুব বেশি পানি নেই। হেঁটে পার হওয়া যাবে। আদ্রিতা পাড়ে গিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। পানি টলটলে পরিষ্কার। পাথর বেছানো তলদেশ দেখা যাচ্ছে। সেখানে নিজের ছায়া দেখে প্রায় আঁতকে উঠল। চুলগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে রয়েছে। দেখাচ্ছে একদম ভূতের মতো।

ফারহান আর রবি থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট পরেছে, সৌমিক ট্রাউজার। অন্যদিকে আদ্রিতা আর কঙ্কার পরনে জিন্সের প্যান্ট। সেই জিন্সের প্যান্ট যতটুকু সম্ভব ভাঁজ করে হাঁটু পর্যন্ত তোলার চেষ্টা করেও পারল না। ঢাকা

থেকে রওনা দেওয়ার সময় ট্রাকিং জুতো কিনে এনেছিল। সেটা বেশ কাজে দিচ্ছে। জুতোজোড়া খুলে হাতে নিল আদ্রিতা। ভিজলে বেশ ভারী হয়ে যাবে।

দ্রুতই খালটা পার হয়ে গেল ওরা। হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সময় এখন দুপুর একটা। সেই সকালে নাশতা করা হয়েছিল। খালের পাড়ে বসল সবাই। ক্লান্ত হয়ে গেছে। সকালেই রান্না করে নিয়ে আসা হয়েছিল, টিফিন ক্যারিয়ারে করে। খিচুড়ি আর ডিম। রান্না করেছে মং সেন। টিফিন ক্যারিয়ার খুলে সে সবাইকে খাবার দিল। নিজে কিছু খেল না। বলল তার নাকি খিদে নেই। পাহাড়ে নিয়মিত চলাচলের অভ্যাস আছে বলেই ওর জন্য এই ধরনের হাঁটাহাঁটি কোনো ব্যাপার না, ভাবল আদ্রিতা।

'আমাদের পরবর্তী গন্তব্য কোথায়?'

কঙ্কা জিজ্ঞেস করল। উত্তরের জন্য সবাই মং সেনের দিকে তাকাল।

'এরপরের গন্তব্যটাই কঠিন,' মং সেন বলল, 'আপনারা যদি এখান থেকে ফিরে যেতে চান, যেতে পারেন। কারণ সামনের পথ বেশ কঠিন। আপনারা পারবেন না মনে হয়। বিশেষ করে আদ্রিতা ও কঙ্কার খুব কষ্ট হবে।'

শেষের কথাটা আদ্রিতা আর কঙ্কাকে উদ্দেশ্য করে বলা। কথাটা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল কঙ্কা।

'ওদের কষ্ট না হলে আমাদেরও কষ্ট হবে না,' কঙ্কা বলল, 'কিন্তু আমরা কী আজকেই ফিরতে পারব, নাকি থেকে যেতে হবে?'

'বার্মার সীমান্ত এখান থেকে বেশি দূরে নয়। আমরা সেখানে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব,' মং সেন বলল, 'কিছুক্ষণ থেকেই ফিরে আসব।'

'তাহলে তো কথাই নেই,' ফারহান বলল, 'কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' রবি জিজ্ঞেস করল।

'আমি একটা কথা বলব, তোরা কিছু মনে করবি না তো?' বেশ কাঁচুমাচুভাবে বলল ফারহান।

'বলে ফেল,' রবি বলল।

'আমার না ঘুম পাচ্ছে খুব, এত সকালে তো ঘুম থেকে উঠি না কখনো,' ফারহান বলল , 'আর খিচুড়িটাও এত টেস্টি যে বলার মতো না।'

'ঘুমাতে চাচ্ছিস? এখন?'

বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আদ্রিতা। সে আরও অবাক হয়ে দেখল রবি, সৌমিক আর কঙ্কা'ও ফারহানের প্রস্তাবে নীরব সমর্থন দিচ্ছে।

'তোরা সবাই ঘুমাবি এখন? এই দুপুর বেলায়? এরকম একটা জায়গায়?' আদ্রিতা রাগ করবে না হাসবে বুঝতে পারছিল না।

'দোস্ত, আধঘণ্টার একটা রেস্ট দরকার, ঐ যে বড় গাছটা আছে, ওর নিচে খানিকটা বিশ্রাম নেব, বেশি কিছু তো না,' কঙ্কা বেশ আদুরে গলায় বলল।

অন্য সময় হলে কোনোমতেই রাজি হতো না আদ্রিতা। কিন্তু দুপুরের চড়া রোদে হাঁটার চেয়ে খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া ভালো। রোদটা একটু পড়ে এলে হাঁটতে সুবিধা হবে। আর ওরা ঘুমালে ঘুমাক। সে তো ঘুমাবে না। ব্যাকপ্যাকে একটা থ্রিলার নিয়ে এসেছে। ঢাকায় সময় করে পড়া হচ্ছিল না। এখানে যতটুকু এগিয়ে রাখা যায় তত ভালো।

মং সেন টিফিন ক্যারিয়ারগুলো খালের পানিতে ধুচ্ছিল। ওরা ওদের ব্যাকপ্যাকগুলো নিয়ে বড় গাছটার নিচে বসল। এটা একটা বটগাছ। বেশ বড়সড়ো গাছ। তার পাশে ডালপালা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। গাছের গোড়াটা বেশ মোটাসোটা, বড় বড় শেকড়গুলো শিরা-উপশিরার মতো চারপাশে ছড়িয়ে গেছে। গাছের গোড়ায় বেশ আরাম করেই পাঁচজনের জায়গা হয়ে গেল। আদ্রিতা বই খুলে বসল।

রবি কিছুক্ষণ ওর উকলেলে বাজানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বাকিদের অনুৎসাহে অল্প বাজিয়েই রেখে দিল একপাশে। বই পড়তে পড়তে আদ্রিতা দেখল সবাই বেশ চোখ বুজে আছে। বইয়ের আরও গভীরে ডুবে যেতে যেতে টের পেল সৌমিক বেশ ভয়াবহভাবে নাক ডাকছে। বাকিরা গভীর ঘুমে। নইলে এই নাক ডাকার শব্দে ওদের ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা। মং সেনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শেষবার যখন দেখেছিল তখন টিফিন ক্যারিয়ার ধুয়ে-মুছে ব্যাকপ্যাকে তুলে রাখছিল। হয়তো প্রাকৃতিক কর্ম সারতে গেছে কোথাও।

দুপুরের রোদ এখন নরম, সুন্দর গা-জুড়ানো শীতল হাওয়া বইছে চারদিকে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আদ্রিতার চুল। যে বইটা পড়ছে সেটা অনেক দ্রুতগতির, পড়তে পড়তে টের পেল ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। বইয়ের গল্পটা এখন মাঝামাঝি জায়গায় আছে, কিন্তু গল্পটা এত টান টান যে রাখতে ইচ্ছে করছিল না। পড়তে পড়তে কখন যে বইটা টুপ করে হাত থেকে পড়ে গেছে সেই খেয়াল নেই আদ্রিতার। কারণ অনেকদিন পর আরামের একটা ঘুম হলো তার। গভীর সেই ঘুম। সেই ঘুম স্বপ্নহীন, গন্ধহীন, বর্ণহীন।

বড় হওয়ার পর থেকে একা ঘুমিয়েই অভ্যাস আদ্রিতার। যখন ছোট ছিল সবসময় মা'র পাশে ঘুমাত। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাকে দেখতে না

পেলে কান্না জুড়ে দিত। আজকে ঘুম ভাঙার পর চোখ বুজে হাত দিয়ে সে মাকে খুঁজছিল। অনেকদিন পর এমন হলো। কিন্তু চারপাশে শুকনো গাছের স্পর্শ ছাড়া আর কিছু হাতে লাগল না। ধড়মড় করে উঠে বসল আদ্রিতা। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে? কয়টা বাজে? চারপাশে বেশ অন্ধকার। গাছের অন্যপাশে তার বন্ধুরা সব এখনও গভীর ঘুমে। অথচ বেড়াতে এসে তাদের এভাবে ঘুমানোর কথা ছিল না। আবার এমন অগোছালোভাবে ঘুমানোটা নিরাপদও না। মং সেনকেও দেখতে পেল। হাত-পা ছড়িয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছে।

নিজেকে কোনোমতে ঠিকঠাক করে প্রথমেই কঙ্কার ঘুম ভাঙাল আদ্রিতা। ওর ঘুম যেন ভাঙতেই চাচ্ছিল না। বেশ বিরক্ত চোখে আদ্রিতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কঙ্কা। আদ্রিতার মতো স্থান আর কালের বোধ সাময়িকভাবে তারও লোপ পেয়ে গিয়েছিল মনে হয়। কারণ চারপাশে তাকিয়েই তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল কঙ্কা। তারপর আদ্রিতার সাথে মিলে ফারহান, সৌমিক আর রবির ঘুম ভাঙাল। মং সেনের ঘুম ভাঙাল সৌমিক।

সবাই বেশ অবাক চোখে একজন আরেকজনকে দেখছে।

'দোস্ত, আমরা এতক্ষণ ঘুমালাম ক্যামনে?' জিজ্ঞেস করল ফারহান।

'সাতটার উপর বাজে,' রবি বলল, 'আমরা টানা পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ঘুমিয়েছি!'

'কাজটা ঠিক হয়নি,' আদ্রিতা বলল।

'কিন্তু আমরা সবাই এরকম একসাথে ঘুমিয়ে পড়লাম কীভাবে? আর এতক্ষণ ঘুম! কীভাবে সম্ভব!' কঙ্কা বলল।

ঘুম ঘুম লাল চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মং সেন। তার মুখে কোনো কথা নেই। বেশ অবাক হয়ে সে বাকিদের কথা শুনছে।

ফারহানের হাতে একটা টর্চলাইট দেখা যাচ্ছে। ব্যাকপ্যাক থেকে বের করে জ্বালিয়েছে। ওর দেখাদেখি রবি আর সৌমিকও টর্চলাইট বের করল। মং সেন একটা সিগারেট ধরিয়েছে। তাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'চলেন, যা হওয়ার হয়েছে,' মং সেন বলল, 'আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই, আজকে দিনটা নষ্ট হলো। কাল সকালে আবার বের হবো।'

এটাই এখনকার মতো যুক্তিযুক্ত কাজ। জিনিসপত্র কিছু এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। যথারীতি মং সেন দলটার আগে থাকল।

নিজেদের মতো কথা বলতে বলতে ওরা মং সেনকে অনুসরণ করতে থাকল।

চারপাশে ঝিঁঝি পোকার ডাক, ব্যাঙের ডাক কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে যেন। আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। টর্চলাইটের সামান্য আলো ছাড়া আর কোনো আলোর চিহ্নমাত্র নেই।

তবে ভালো একটা ঘুম হওয়ার পর হাঁটতে ভালো লাগছিল আদ্রিতার। বাতাস আছে বেশ। দীর্ঘসময় একটানা ঘুমালে শরীর কেমন ভারী হয়ে আসে। সেই অনুভূতিটাও চলে গেছে।

খুব সাবধানে পা ফেলছে আদ্রিতা, এসব জায়গায় হোঁচট খেয়ে পা মচকে গেলে বিপাকে পড়তে হবে। এছাড়া সাপখোপের ভয়ও আছে।

বেশ অনেকদূর হাঁটার পর ক্যাম্পে ফেরার জন্য মনটা কেমন আঁকুপাঁকু করছিল আদ্রিতার। এই পার্বত্য অঞ্চলে ওটাই তাদের রাতের আশ্রয়। এসময় তার হাত খামচে ধরল কঙ্কা। ব্যথায় প্রায় ককিয়ে উঠেছিল, কোনোমতে নিজেকে সামলাল।

'কী হয়েছে?' চাপা গলায় বলল আদ্রিতা।

'আমরা তো মনে হচ্ছে ভুল পথে চলে এসেছি,' কঙ্কা বলল, ওর কণ্ঠে আতঙ্ক ঝরে পড়ছে।

'সেটা কীভাবে সম্ভব? মং সেন পথ চেনে। আর ওরা আছে না? ওরাও চেনে।'

এইসময় রবি হঠাৎ দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে মং সেনের হাত ধরল। বেশ জোরে হাঁটছিল মং সেন। দাঁড়াল, টর্চের আলো ফেলল রবির মুখের উপর।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মং সেন।

'আমরা এখন কোথায়?'

'ক্যাম্পে যাচ্ছি,' মং সেন বলল, 'আর বেশিদূর না মনে হয়।'

'মনে হয় মানে?'

সৌমিক জিজ্ঞেস করল। ওর কণ্ঠে ক্লান্তি ঝরে পড়ছিল। ফারহান সিগারেট ধরিয়েছে। বড় করে টান দিয়ে মং সেনের টি-শার্টের কলার চেপে ধরল।

'তুই রাস্তা চিনিস না? মনে হয় বলিস কেন?'

'তুই-তোকারি করছেন কেন?'

ফারহান রাগের চোটে ওর গালে চড় বসাতে যাচ্ছিল। রবি কোনোমতে শূন্যেই সেই হাত ধরে ফেলল। ফারহানকে টেনে পেছনে নিয়ে গেল। সেখানে আদ্রিতা আর কঙ্কা আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে, দুজন দুজনের হাত ধরে।

'ফারহান, মাথা ঠান্ডা কর,' রবি বলল, 'এই জঙ্গলে ঐ মং সেন-ই আমাদের ভরসা। তুই যদি এভাবে রেগে যাস, ও আমাদের ফেলে চলে গেলে আরও ঝামেলায় পড়ব।'

'ঝামেলায় তো আমরা পড়েই গেছি,' ফারহান বলল।

'যত ঝামেলাই হোক, কথা দে, মাথা ঠান্ডা রাখবি,' রবি বলল, 'এই মেয়েগুলোর দায়িত্বও আমাদের উপর। কাজেই মাথা গরম করা চলবে না।'

মেয়েদের দোহাই দেওয়াতেই হয়তো নিমিষেই শান্ত হয়ে এলো ফারহান।

'ঠিক আছে, তুই শুধু দ্যাখ আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি কি না,' ফারহান বলল। ওর হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিল কঙ্কা। খুব জোরে একটা টান দিয়ে সেটা ফেলে দিল মাটিতে, জুতো দিয়ে ঘষে আগুনটা নিভিয়ে দিল।

'শোন, মেয়ে বলে আমাদের অসহায় মনে করিস না,' কঙ্কা বলল, 'আমাদের দায়িত্ব আমরা নিজেরাই নিতে পারি।'

ফারহান সম্ভবত ওর সাথে তর্ক করতে চাইল না বলেই কোনো কথা না বলে সামনে এগিয়ে গেল।

আবার হাঁটতে শুরু করেছে ওরা। চারপাশে হুহু করে শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। এই লক্ষণ চেনে আদ্রিতা। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামবে। সাথে রেইনকোট আছে, চিন্তার কিছু নেই। তবে তার আগে কোনোমতে ক্যাম্পে পৌঁছতে পারলেই হলো।

আরও প্রায় আধঘণ্টা হাঁটাহাঁটির পরও ক্যাম্পে পৌঁছনোর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এরপর ঝিরিঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ব্যাকপ্যাক থেকে রেইনকোট বের করে পরে নিয়েছে আদ্রিতা আর কঙ্কা। তবে ছেলেরা কেউ এই জিনিস সাথে আনেনি। ফারহানের কথা হচ্ছে ঢাকায় কখনো বৃষ্টিতে ভেজা হয় না। ছুটিতে এসে বৃষ্টিতে ভিজবে, শুধু শুধু রেইনকোট সাথে এনে ব্যাগের ওজন বাড়ানোর কোনো মানে নেই। ওর এই সিদ্ধান্তটা কতটা বোকার মতো হয়েছে সেটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নিশ্চয়ই, ভাবল আদ্রিতা। শীতল বাতাসের সাথে সাথে ঝিরিঝিরি যে বৃষ্টিটা হচ্ছে সেটা হিমশীতল। শীতকালে পাহাড়ে এরকম বৃষ্টি হতে পারে জানা ছিল না। বেড়াতে গেলে রেইনকোট সাথে রাখার অভ্যাসটা খুব ভালো কাজে দিয়েছে।

আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর বেশ বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি শুরু হলো। চারপাশে উঁচু গাছপালার কারণে বৃষ্টির ফোঁটা নিচ পর্যন্ত আসছিল না। কিন্তু বৃষ্টির গতি বেড়ে যাওয়াতে গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির ফোঁটার মাটির সাথে দেখা করার পথে বাঁধা হতে পারল না। বরং এ সুযোগে তারা নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজটা সেরে নিল। বৃষ্টিতে ভেজার যে শখ ছিল ফারহানের, সেটা খুব দ্রতই পূরণ হয়ে গেল। টলটলে স্বচ্ছ বৃষ্টির ফোঁটার

বদলে গাছের পাতার ধুলো নিয়ে নেমে আসা বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কাপড়চোপড়ে সেই ধুলোর ছাপ রেখে গেল।

মং সেন দাঁড়াল। সবার দিকে তাকাল। সে কিছু বলার আগে মুখ খুলল ফারহান।

'আমাদের কোথাও আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ,' মং সেন বলল, 'আমরা আরেকটু এগুই। নিশ্চয়ই কোনো আশ্রয় পাওয়া যাবে।'

পেছানোর কোনো পথ নেই। এতক্ষণ ওরা একটা ছোটখাটো পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে এসেছে। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গাটা সমতল, কিন্তু এখানে কোথাও আশ্রয় নেই। এরপর জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। সেখানে কী আছে দেখা না গেলেও আপাতত নিচে নামা ছাড়া আর কোনো গতি নেই। মং সেন এরমধ্যেই নামতে শুরু করেছে। আদ্রিতা আর কঙ্কা পরস্পরের হাত ধরে নামছে। উপরে উঠা যতটা কঠিন ছিল, নামাটা আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির পানি নিচ দিয়ে স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। একটু এদিক-সেদিক হলেই পা পিছলাবে আর তাতে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে তা জানার কোনো উপায় নেই। টর্চের আলো খুব বেশি দূর পথ দেখাচ্ছে না।

বৃষ্টির শীতল ফোঁটা চোখে-মুখে পড়ছে, হাত-পা এরমধ্যেই ঠান্ডা হয়ে এসেছে। ফারহান আর সৌমিক মং সেনের ঠিক পেছনেই আছে। আদ্রিতার পাশেই আছে রবি। ছেলেটা ওর দিকে তাকাল একনজর। ওর দৃষ্টিতে স্পষ্ট উদ্বেগ। তবে নিজেকে শক্ত রেখেছে আদ্রিতা। সে একটু হেসে ওকে অভয় দিল।

ছেলেরা নামতে পারলে ওরাও পারবে।

ঢালটা হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল। এখানে জায়গাটা বেশ সমতল। মং সেন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। টর্চের আলো ফেলছে এক এক করে সবার দিকে। সৌমিক আর ফারহানও ওর সাথে যোগ দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আদ্রিতা, রবি আর কঙ্কাও নেমে এলো। আগে শুনেছিল, পাহাড়ে উঠার চেয়ে নেমে আসাটা কঠিন। সেটা যে এতটা কঠিন আজ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

বৃষ্টির তেজ আরও বেড়েছে। ঢাল বেয়ে স্রোতের মতো পানি নামছে নিচের দিকে। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। মং সেন কিছু বলল না। চারদিকে টর্চের আলো ফেলছে। একটা জায়গায় টর্চের আলোটা স্থির হলো। সেখানে তাকাল সবাই। আরেকটা ছোট পাহাড় উপরের দিকে উঠে

গেছে। কিন্তু মং সেন যেখানে টর্চের আলো ফেলেছে সেখানে উপর থেকে নেমে আসা পানির স্রোতে ছোটখাটো একটা ঝরনাধারার মতো তৈরি হয়েছে। এই ঝরনার ঠিক পেছনেই ফাঁকা একটা জায়গা। মং সেন কিছু বলল না, এগিয়ে গেল সেদিকে। বাকি সবাই ওর পেছন পেছন চলল।

দূরে কোথাও বিকট শব্দে বাজ পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। সেই ক্ষীণ আলোয় আদ্রিতা দেখল সবাইকে বেশ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত আর ভীত দেখাচ্ছে।

'আমার মনে হচ্ছে ঝরনাটার পেছনেই একটা গুহা আছে,' মং সেন বলল, 'এখানে আমাদের এই মুহূর্তে আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

'মাথা খারাপ নাকি?' সৌমিক বলল, 'ঐসব অন্ধকার গুহা-টুহায় আমি ঢুকতে পারব না।'

'বৃষ্টি যেভাবে বাড়ছে তাতে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব,' মং সেন বলল, 'বৃষ্টি কমলেই বেরিয়ে আসা যাবে। আর আমরা তো ভেতরে যাচ্ছি না। শুধু বৃষ্টিতে যাতে ভিজতে না হয় সেই ব্যবস্থা করব।'

'এই ঝরনার ভেতর দিয়ে যেতে হলে তো এমনি ভিজে যাব,' রবি বলল।

'দৌড়ে যেতে হবে, তাহলেই হবে,' মং সেন বলল।

'কিন্তু ভেতরে যে এটা গুহা তাই বা নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছ?' সৌমিক বলল। সে তাকাল সবার দিকে সমর্থনের আশায়। কিন্তু সবাই এখন ক্লান্ত, কেউ এখন তর্ক করার অবস্থায় নেই।

'দোস্ত, এই ফালতু বৃষ্টিতে না ভিজে চল ভেতরে যাই, তুই কি ভয় পাচ্ছিস নাকি?' ফারহান বলল বিরক্ত কণ্ঠে।

'সাপ থাকতে পারে, আরও কত কী থাকতে পারে, পারে না?' সৌমিক বলল, 'এসব গুহায় বিষাক্ত গ্যাসও থাকতে পারে। সেই গ্যাসে আমরা মরে যেতে পারি।'

'এত কিছু ভাবার সময় নেই দোস্ত, চল,' ফারহান বলল।

সৌমিকের কথায় যুক্তি ছিল, আদ্রিতা ভাবল। কিন্তু ক্রমাগত বৃষ্টিতে ভিজে তার শরীরে কাঁপন ধরে গেছে। এই মুহূর্তে একটু শুকনো জায়গায় যেতে পারলে ভালো লাগত।

মং সেন আর কথা বাড়াল না। সে এক দৌড়ে ঝরনা পার হয়ে গেল। ঝরনাটা বৃষ্টির বয়ে আসা পানিতে তৈরি কেবল, খুব বেশি প্রশস্ত তো নয়। কাজেই এক এক করে সবাই ঝরনা পার হয়ে ওপাশে চলে এলো।

জায়গাটা সরু। তবে এখনও শুকনো আছে। ছয়জন মানুষ বেশ চাপাচাপি করে দাঁড়িয়ে আছে। ফারহান তার ব্যাকপ্যাকের ভেতর থেকে

সিগারেটের প্যাকেট বের করল। নিজে একটা ধরিয়ে রবি, সৌমিক আর মং সেনকেও দিল। ছোট একটু জায়গায় ওরা সিগারেট টানছে, তার ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আদ্রিতার। কিন্তু চারপাশের শীতলতার মধ্যে এই সিগারেটের মাধ্যমেই ওরা হয়তো একটু উষ্ণতা নিচ্ছে এই ভেবে আর কিছু বলল না।

কঙ্কা বেশ চুপচাপ হয়ে আছে। শক্ত করে আদ্রিতার হাত চেপে ধরে আছে। ওকে কিছু বলার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আদ্রিতা। কঙ্কাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই সে। ওর চোখে-মুখে চরম আতঙ্ক খেলা করছে। অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে এরকম বিপদে পড়তে হবে জানলে মেয়েটা কখনই আসত না। ড্রয়িংরুমে আর আড্ডায় বসে অ্যাডভেঞ্চারের পরিকল্পনা করতে ভালো লাগে, কিন্তু সবকিছু যে একদম পরিকল্পনা মতো চলবে তা তো নয়।

'তোর কী হয়েছে?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল আদ্রিতা।

'পায়ে শক্তি পাচ্ছি না,' কঙ্কা বলল, 'তুই আমাকে শক্ত করে ধরে রাখ।'

'শক্তি পাচ্ছিস না কেন?' এটুকু জিজ্ঞেস করতে করতেই আদ্রিতা দেখল কঙ্কা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সে কোনোমতে ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করেও পারল না, বরং ওর সাথে নিজে পড়ে গেল শুকনো মাটিতে। জায়গাটা বেশ শক্ত, পাথুরে। কঙ্কা পড়ে যেতেই সৌমিক সিগারেট ফেলে ওকে ধরতে এগিয়ে এলো। রবি আর ফারহানও এগিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু সরু জায়গায় এগোতে পারছে না।

মং সেন আর সৌমিক কোনোমতে কঙ্কাকে ধরে উঠাল, গুহার আরেকটু ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে জায়গাটা বেশ প্রশস্ত। আদ্রিতা টর্চের আলো ফেলে মং সেন আর সৌমিককে সাহায্য করছে। বেশ খানিকটা ভেতরে গিয়ে কঙ্কাকে মেঝেতে শোয়াল ওরা। জ্ঞান হারিয়েছে আবার।

আদ্রিতাও ঢুকেছে ভেতরে। চারপাশে টর্চের আলো ফেলে দেখছে। শোয়ার ঘরের আকৃতির একটা জায়গা, পাথুরে দেওয়াল, ভেজা ভেজা। ঠিক মাঝখানে কঙ্কা শুয়ে আছে মেঝেতে, ওর মুখের উপর ঝুঁকে নাকের উপর হাত দিয়ে নিঃশ্বাস আছে কি না দেখছে সৌমিক। মং সেন দাঁড়িয়ে আছে। আদ্রিতার মতো সেও গুহার ভেতরটা দেখছে।

'জায়গাটা তো বেশ ভালো মনে হচ্ছে,' মং সেন আদ্রিতাকে বলল। এর আগে ওর সাথে সরাসরি কথা বলার প্রয়োজন হয়নি, কিছু বলল না আদ্রিতা। এরমধ্যে সিগারেট শেষ করে ভেতরে ঢুকেছে রবি আর ফারহানও।

দুজনেই বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, টর্চের আলো ফেলছে এদিক-সেদিক। ঘরের এক মাথায় ঝরনার দিকটা, যেদিক দিয়ে ওরা এসেছে, অন্যদিকে সরু আরেকটা পথের মুখ, সেটা কোনদিকে গেছে, ভেতরে গুহাটা আরও বড় কি না সেটা জানার প্রয়োজনবোধ করছে না কেউ। বৃষ্টি থামা পর্যন্ত এই জায়গাটাতেই বেশ চমৎকারভাবেই থাকা যাবে। প্রয়োজনে রাতও কাটানো যাবে। সকালে বের হয়ে গেলেই হলো। সাথে অল্প কিছু শুকনো খাবার আছে। তা দিয়ে রাতের ঝামেলা মেটানো যাবে।

কঙ্কার পাশে গিয়ে বসল আদ্রিতা। মেয়েটার 'প্যানিক অ্যাটাক' হয়েছে, ধারণা করল। এমনিতে ছটফটে, দুঃসাহসী কঙ্কা, কিন্তু এখানে পরিস্থিতিটা এতটাই বিপজ্জনক ছিল যে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি।

সাথে কোনো ওষুধপত্র নেই। অল্প যা কিছু এনেছিল সেগুলো ক্যাম্পে আছে। ব্যাকপ্যাক থেকে একটা পানির বোতল বের করে অল্প পানি ছেটাল কঙ্কার চোখে-মুখে। তাতে চোখ খুলে উঠে বসল কঙ্কা। সবার দিকে তাকাচ্ছে। কিছুটা বিব্রত দেখাচ্ছে তাকে।

রবি একপাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে। উকলেলে বের করে টুংটাং করছে। বাইরের বৃষ্টির সাথে শব্দগুলো মিশে অদ্ভুত এক আবেদন তৈরি করেছে গুহার ভেতরে। মং সেন তার হাতের টর্চলাইটটা ঠিক মাঝখানে রেখেছে, মেঝের উপর। তাতে ভেতরটা এখন সামান্য আলোকিত। ওর দেখাদেখি সৌমিক আর ফারহানও ওদের টর্চলাইট একসাথে রাখল। ফারহান ওর ক্যামেরা বের করে ছবি তুলছে। এখানে ছবি তোলার কী আছে মাথায় আসছে না। এরমধ্যে আদ্রিতার বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছে। বিরক্ত হলেও কিছু বলল না। ফারহান সবসময় মজা করার মেজাজে থাকে। হয়তো ভারী পরিবেশকে হালকা করার জন্য সেটা মাঝে মাঝে জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

আদ্রিতা ব্যাকপ্যাক খুলল। শুকনো বিস্কুটের প্যাকেট আছে কয়েকটা। প্যাকেট খুলে সবার হাতে বিস্কুট দিল। কঙ্কা চুপচাপ বসে আছে একপাশে। ওর পাশে গিয়ে বসল, ওর হাতেও দুটো বিস্কুট ধরিয়ে দিল। কিন্তু সেগুলো হাতে নিয়ে বসে রইল কঙ্কা। ওকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো কারণে চিন্তিত, শঙ্কিত।

'টেনশন করছিস কেন?' আদ্রিতা বলল, 'আজকে রাতটা এখানে কাটাতে হবে। ভোরে উঠেই বেরিয়ে যাব।'

'জায়গাটা আমার কাছে ভালো লাগছে না,' আদ্রিতা বলল।

'ভালো লাগছে না কেন?'

'জানি না,' কঙ্কা বলল, 'এখানে ঢোকার পর থেকেই আমার দম কেমন বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।'

'ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে তোর,' আদ্রিতা বলল, 'বড় করে নিঃশ্বাস নে। কোনো কিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর। এখানে আছি এই চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে ফেল।'

কঙ্কা কিছু বলল না। রবি আর সৌমিক এসে বসল আদ্রিতার পাশে। ওদেরকে দেখে খুব বেশি দুশ্চিন্তায় আছে বলে মনে হচ্ছে না। ফারহানের ছবি তোলা শেষ হয়েছে। সেও এসে বসল ওদের সাথে। উলটোপাশে মং সেন একা বসে আছে। প্রায় অন্ধকার বলে মানুষটাকে একটা ছায়ামূর্তির মতো মনে হচ্ছে আদ্রিতার কাছে।

'শোন, আদ্রিতা,' ফারহান বলল, 'এই যে একটা অভিজ্ঞতা আমাদের হচ্ছে, এটাই কিন্তু আসল। অনেকদিন মনে থাকবে। অন্ধকার গুহায় আমরা কয়েকজন একটা রাত কাটিয়েছিলাম, এই গল্প অনেক বছর ধরে করা যাবে।'

'হুঁ,' ছোট করে উত্তর দিল আদ্রিতা।

'আমি কিছু ভিডিও করেছি,' ফারহান বলল, 'এক এক করে সব পোস্ট দেব। লোকজন বুঝবে বান্দরবান এসে শুধু চেনা জায়গাগুলোতেই ঘুরে বেড়ালে হবে না। আরও কত কী দেখার আছে, সেগুলোও দেখতে হবে।'

'গুহা নিয়ে কিন্তু অনেক গল্প আছে,' রবি বলল, 'রবার্ট ব্রুসের গল্পটাই ধর। কিংবা আলিফ লায়লায় খুল যা সিমসিম। '

'হুঁ, তুই নতুন একটা গল্প লিখে ফেল,' ফারহান বলল, 'আমাদের গল্প।'

'বান্দরবানের গুহায় এক রাত,' সৌমিক বলল। 'লিখে ফেল।'

'এই গুহার একটা নামকরণ করা যায়, তোরা কী বলিস?' রবি বলল, 'আমাদের দুই মহিলা পর্যটকের নামে এই গুহার নাম হোক কঙ্কা-আদ্রিতা গুহা।'

'কী বাজে নাম রে বাবা,' বলে শিউরে উঠল যেন ফারহান।

ওরা কথা বলছে, হাসছে। আদ্রিতা বুঝতে পারছে ওদের দুজনকে স্বাভাবিক রাখার জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছে ছেলেগুলো। কিন্তু ওরা জানে না, বিপদের মুখে মেয়েরাই স্থির থাকে বেশি। কঙ্কা সাময়িকভাবে কিছুটা সময়ের জন্য হয়তো অস্থির হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে একদম ধীর-স্থির হয়ে বসে আছে। ছেলেদের কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে, মাঝে মাঝে এটা-সেটা যোগ করছে।

আদ্রিতা মাঝে মাঝে মং সেনের দিকে তাকাচ্ছে। মানুষটা হাঁটু গেড়ে বসে আছে। চোখ বন্ধ, দুই হাত জোর করে বিড়বিড় করে কিছু বলছে। সম্ভবত প্রার্থনা করছে। ও কি বৌদ্ধ? না খ্রিষ্টান? মিশনারিরা পাহাড়ের অনেক মানুষকেই তার আদি-ধর্ম থেকে সরিয়ে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছে। এই দীক্ষার পেছনে ধর্মীয় প্রভাবের চেয়ে শিক্ষার সুযোগ, আশ্রয় আর অর্থ-কড়িই হয়তো মূল ভূমিকা রেখেছিল। যাই হোক, মং সেন কী ধর্ম পালন করে এটা জানা খুব জরুরি বিষয় নয়। কিন্তু গুহার ভেতরে আসার পর থেকেই মানুষটা বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে। কথা বলছে না তেমন। নিজেকে ওদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

অবশ্য ছেলেরাও ওর সাথে কথা বলার খুব একটা আগ্রহ পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো কথা বলতে গেলেই ঝগড়াঝাঁটি হবে। মং সেনের কারণেই ভুল পথে এসে এই ঝামেলায় পড়তে হয়েছে ওদের। সেটা মং সেন স্বীকার করবে কি না কে জানে।

মং সেনের প্রার্থনার গতি বেড়েছে। ওর বলা অচেনা ভাষার অদ্ভুত শব্দগুলো গুহার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যেন। গল্প থামিয়ে ওরা সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মং সেনের দিকে। কেউ কোনো কথা বলছে না।

আদ্রিতা টের পাচ্ছে গুহার ভেতরে কিছুক্ষণ আগেও যে উষ্ণতা ছিল তা নেই এখন। বরং অদ্ভুত এক শীতল পরিবেশ হঠাৎ করেই চলে এসেছে যেন।

বাইরে বৃষ্টি এখনও থামেনি। এখানে এসেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে। বৃষ্টি থামলে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে বের হবে কি না এ নিয়েও নিজেদের মধ্যে বেশ জোরদার আলোচনা হয়ে গেল। কঙ্কা যেকোনো ভাবেই হোক, ক্যাম্পে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু বাকি কেউ রাজি নয়। এমনিতেই একবার পথ হারিয়ে ঝামেলায় পড়েছে, আবার নতুন করে ঝামেলায় পড়তে চায় না। এছাড়া রাত হয়ে গেছে বেশ। মং সেনও সম্ভবত বাইরে যেতে রাজি হবে না। আদ্রিতার কোনো মতামত নেই এই বিষয়ে। তার শুধুমাত্র একটা বিষয়ে অস্বস্তি লাগছিল। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম কীভাবে সারবে সেটা মাথায় ঘুরঘুর করছিল। বৃষ্টি থামলে কোনোমতে বাইরে গিয়ে কাজটা সারা যেতে পারে। কঙ্কার চোখে-মুখেও অস্বস্তির ছাপ। আদ্রিতার হাত ধরে রেখেছে শক্ত করে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে আটটা বাজে। ঢাকায় হয়তো সন্ধ্যা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এখানে, এই গভীর পাহাড়ে এটাই যেন মধ্যরাত্রি।

মং সেনের প্রার্থনা শেষ হয়েছে। এবার আরাম করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল। চোখ এখনও বন্ধ। ওদের কারও সাথে কথা বলার কোনো ইচ্ছে আছে বলে মনে হলো না। কাজেই ওরাও কেউ ওকে ঘাঁটাল না।

রবি এখনও বকবক করে যাচ্ছে। গুহা নিয়ে কী কী গল্প আছে সেগুলোর লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া শেষ করেছে মাত্র।

'দোস্ত,' ফারহান বলল, 'জ্ঞানের আলাপ বাদ দিয়ে একটা ভূতের গল্প বল।'

'ভূতের গল্প শুনব না,' কঙ্কা বলল, 'অন্য কোনো গল্প থাকলে বলতে পারিস।'

'কে কে ভূতের গল্প শুনতে চাস, হাত তোল,' রবি বলল।

তিনজন ছেলেই হাত তুলল, কঙ্কা আর আদ্রিতা তুলল না। কিন্তু কেউ হাত না তুললেও রবির ভূতের গল্প বলা কেউ থামাতে পারত না। এটা ওর ভীষণ প্রিয় বিষয়। ফারহানের উপর রাগ হলো আদ্রিতার। অসময়ে এরকম একটা ব্যাপার উসকে দেওয়ার জন্য।

রবি গল্প বলতে শুরু করল। ভূতের গল্প ও খুব ভালো জমাতে পারে। বাইরে বৃষ্টি, ভেতরে শীতল, গুমোট একটা পরিবেশ। এরমধ্যে ইলিশ মাছ চাইতে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেওয়া খুব সাধারণ ভূতটাকেও ভয়ানক বলে মনে হচ্ছিল। ভূতের গল্পের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। রবিকে সেইসব গল্প বলার নেশায় পেয়েছে যেন। সে এক এক করে গল্প বলে যেতে থাকল। গুহার ভেতরের ভয় আর আতঙ্ককে দূর করে দিল রবির গল্পগুলো। একসাথে অনেকগুলো গল্প বলার পর, হাই তুলল রবি। তার নাকি ঘুম পাচ্ছে। সেই দুপুরে একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি ঘুম পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু আদ্রিতা টের পেল রবির মতো তারও ঘুম পাচ্ছে। গুহার দেওয়ালে হেলান দিয়ে কোনোমতে চোখ বুজল সে। কাঁধে মাথা রেখেছে কঙ্কা। ওরও নিশ্চয়ই ঘুম পেয়েছে। রাতে কোনো একসময় উঠে গিয়ে প্রাকৃতিক কর্মটা সেরে ফেললেই হবে, ভাবল আদ্রিতা।

ঘুমে চোখে ভারি হয়ে আসছিল আদ্রিতার। এইসময় দেখল নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসেছে মং সেন। রবি আর ফারহানের কাছে গিয়ে বসেছে। সৌমিক ওদের সাথে কথা বলছিল। মং সেনের আগমনে কথা থামাল।

'গল্প করতে এলাম,' মং সেন বলল, 'ঘুম আসবে না আমার।'

'আচ্ছা,' রবি বলল, 'ভূতের গল্প ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারো। ভূতের গল্প বলা শেষ।'

মং সেন হাসল একটু।

'একটা গুহার গল্প বলি, কী বলেন?'

আদ্রিতার কাঁধ থেকে কঙ্কা মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। আদ্রিতাও বসল। একটা মানুষ নিজ থেকে কথা বলতে এসেছে সেটা না শুনলে ভালো দেখায় না।

ফারহান একটা সিগারেট ধরিয়েছে নিজে, আরেকটা ধরিয়ে এগিয়ে দিল মং সেনের দিকে। সেটায় টান দিয়ে বড় করে ধোঁয়া ছাড়ল মং সেন।

'অনেক বছর আগে, কয়েকশ বছর ত হবেই, এই পাহাড়ে ভারি একটা অন্যায় হয়েছিল। আমাদের যিনি রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। এখানেই কোনো এক পাহাড়ে এক বুড়ো কাঠুরে তিন মেয়েকে নিয়ে থাকত। সেই কাঠুরের বড় মেয়েকে রাজার খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু বুড়ো কাঠুরের বড় মেয়ের সম্পর্ক ছিল গ্রামের এক যুবকের সাথে। যুবক দরিদ্র, কিন্তু কর্মঠ। রাজা যখন জানল সেই মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চায় না এক দরিদ্র ছেলের জন্য, তখন এক রাতে বুড়ো কাঠুরের পুরো পরিবারটাকেই সে পুড়িয়ে মারল। তারপর সেই পোড়া মৃতদেহ গ্রামের প্রবেশপথে বাঁশের সাথে ঝুলিয়ে দিল। সেই দরিদ্র যুবককে মারার জন্যও সে পঞ্চাশজন সৈন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ওরা সেই যুবককে মারতে পারেনি। বরং সেই যুবকের হাতে ওরা সবাই কচুকাটা হয়েছিল।'

'একজন মানুষ পঞ্চাশজন সৈন্যকে মেরে ফেলল?' সৌমিক জিজ্ঞেস করল, 'এটা কীভাবে সম্ভব?'

'সেটা সম্ভব ছিল, কারণ...' মং সেন একটু থামল, 'যুবকটি ওদেরকে একসাথে মারেনি। এরকম একটা গুহায় লুকিয়েছিল সে। তারপর ওকে খুঁজতে আসা সৈন্যদের এক এক করে মেরেছে। গুহার ভেতরটা যুবকের খুব ভালো করে চেনা ছিল। কিন্তু সৈন্যদের কাছে সেটা ছিল একটা গোলকধাঁধার মতো। ওরা কেউই সেই গোলকধাঁধা থেকে বেঁচে ফিরতে পারেনি।'

'চমৎকার প্রতিশোধ,' কঙ্কা বলল।

'কিন্তু রাজার তো ওকে ছেড়ে দেওয়ার কথা না,' রবি বলল পাশ থেকে।

'হ্যাঁ, রাজাও ওকে ছেড়ে দেয়নি,' মং সেন বলল, 'ঐ গুহার চারপাশে সে পাহারা বসিয়েছিল, টানা পঞ্চাশ বছর পাহারা দিয়েছে। কিন্তু ঐ গুহা থেকে কাউকে বের হতে দেখা যায়নি। মাঝে মাঝে সৈন্যরা ওর খোঁজে ঢুকেছে। কিন্তু যারা ঢুকেছে তাদের কাউকে আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। তারপর পাহারা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ যুবককে কোনোদিনই আর দেখেনি কেউ।'

'তার মানে কি সে গুহাতেই থেকে গিয়েছিল? আর বের হয়নি?' কঙ্কা জিজ্ঞেস করল।

'গল্পটা এখানেই শেষ,' মং সেন বলল, 'আমাদের গোত্রের সবাই এখনও বিশ্বাস করে সেই যুবক এখনও গুহার ভেতর ঘুরছে। কাউকে

পেলেই খুন করে তার রক্ত আর মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে। হয়তো এখনও বেঁচে আছে সে।'

'ইন্টারেস্টিং গল্প,' আদ্রিতা বলল, 'কিন্তু আমরা গুহায় ঢোকার পর এরকম একটা গল্প বলার কারণ কী?'

মং সেন হাসল। অল্প আলোয় সে হাসি বেশ রহস্যময় লাগল আদ্রিতার কাছে।

'সময় কাটানোর জন্য একটা গল্প বললাম শুধু, আর কিছু না,' মং সেন বলল, 'আপনারা ঘুমান। আমি ওখানে আছি।'

এটুকু বলে নিজের জায়গায় ফিরে গেল মং সেন। এমনিতেই রবি বেশ কিছু ভূতের গল্প বলেছে, তার মধ্যে নতুন করে এই অদ্ভুত গল্প বলার কোনো মানে খুঁজে পেল না আদ্রিতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে এলো তার। সেই ঘুম ঘুম চোখেই দেখল, রবি, সৌমিক আর ফারহান, একজন আরেকজনের পাশে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। উলটোপাশে বসা মং সেনের চোখজোড়াও বন্ধ। তবে মানুষটা ঘুমাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত নয়। নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায়ও নেই আদ্রিতার কাছে। গভীর ঘুমে সে তলিয়ে যেতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুহার ভেতরের বাতাস ছয়জন ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে ভারি হয়ে উঠল।

স্বপ্ন খুব মধুর একটা ব্যাপার। আদ্রিতা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। মাকে নিয়ে, বাবাকে নিয়ে দূরে কোথাও ঘুরতে গেছে, এই স্বপ্নটাই তার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। যদিও বাবা-মা দুজনেই ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। সেই ছোটবেলায় হয়তো কোথাও গেছে, কিন্তু বড় হওয়ার পর থেকে তাদের সাথে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছেটা আর পূরণ হয়নি। সেই ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পূরণ হয়ে যায়। এই যেমন এখন আদ্রিতা দাঁড়িয়ে আছে একটা নীল পাহাড়ের চূড়ায়। সন্ধ্যা নামছে। সূর্য ডুবছে। মা-বাবা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছেন। বাস্তবে এই দৃশ্যটাও খুব একটা চোখে পড়েনি। স্বপ্নে অবশ্য এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপারই। তবে আজকের স্বপ্নে ব্যতিক্রম ঘটল। আদ্রিতা দেখল সাদা সোয়েটার আর হলদে গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট পরা মায়াবী মুখাবয়বের একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। ছেলেটাকে দেখে চমকে গেছে, কিন্তু স্বপ্নে সে ছেলেটার কাঁধে মাথা রেখে সূর্য ডোবা দেখছে। মধুর একটা ব্যাপার। কিন্তু ছেলেটা যে রবি! ওকে নিয়ে কখনো এভাবে চিন্তা করে দেখেনি। নাকি অবচেতন মনে রবিকে নিয়ে সে ভাবে? না হলে স্বপ্নে আর কেউ না এসে রবি এলো কেন?

স্বপ্ন মধুর থেকে হঠাৎ করেই অন্যদিকে রূপ নিল। আদ্রিতা দেখল তাদের পায়ের নিচের পাহাড় নড়তে শুরু করেছে। প্রচণ্ড কাঁপুনিতে পাহাড়টা ধীরে ধীরে ধসে যাচ্ছে। পায়ের তলায় মাটি পাওয়ার আশায় রবির হাত ধরে সে ছুটছে। একটু দূরে বাবা আর মা, দুজনে পাহাড় ধসের সাথে কোথাও উধাও হয়ে গেলেন। চিৎকার করে উঠল আদ্রিতা।

সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠল। ওর চিৎকারটা এতই জোরে ছিল যে, গুহার ভেতরে থাকা সবার ঘুম ভেঙে গেছে। আদ্রিতা বসে হাঁপাচ্ছে, ওর পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কঙ্কা। পানির বোতল পাশেই রাখা ছিল, সেই বোতল এগিয়ে দিল আদ্রিতার দিকে।

স্বপ্নে এসব দেখার মানে কী? গুহার ভেতর পরিবেশটা স্বাভাবিক ছিল, এখন বেশ গরম লাগছে। টের পাচ্ছে সারা শরীর জুড়ে ঘাম।

হঠাৎই আদ্রিতা টের পেল পায়ের নিচের মেঝে কাঁপছে। স্বপ্নে যা ঘটেছিল তা কী বাস্তবে ঘটতে চলেছে? নাকি সে এখনও স্বপ্নের মধ্যেই আছে? এই গুহার ভেতর সবার সাথে একসাথে থাকা, এসব কোনো এক দুঃস্বপ্নেরই অংশ?

সৌমিক তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর দেখাদেখি ফারহান আর রবিও। বাইরে কোথাও পৃথিবী ভেঙে পড়ার মতো শব্দ হচ্ছে। কীসের শব্দ হচ্ছে এত? মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীটা ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না আদ্রিতা। চিৎকার করে উঠল আবার। তার সাথে তাল মেলাল কঙ্কা।



পরনের শার্ট খুলে ফেলেছে সৌমিক। একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরনে ওর, ঘামে শরীর ভিজে গেছে পুরোটা, চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে। ওর পাশে দাঁড়ানো রবি আর ফারহানের অবস্থাও খুব একটা স্বাভাবিক নয়। ওরা তিনজনই প্রচণ্ড ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। সারা শরীর কাদায় মাখামাখি, হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে কাদামাটিতে গড়াগড়ি করে এসেছে।

একটানা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ওরা চেষ্টা করেছে। এগোতে পারেনি। টনকে টন নরম কাদামাটি কতটুকুই বা সরাতে পারবে। তবু চেষ্টা করেছে। এখন বুঝতে পারছে চেষ্টা করে লাভ নেই। শুধু হাত দিয়ে এই কাদামাটি আর পাথরের টুকরোর আবরণ ভেদ করা অসম্ভব একটা কাজ।

কাদামাখা হাতেই একটা সিগারেট ধরাল ফারহান।

'আগে জানলে সাথে কোদাল নিয়ে আসতাম,' ফারহান বলল খানিকটা রসিকতা করে। কিন্তু ওর রসিকতার সাথে তাল মেলানোর মতো মানসিক অবস্থা নেই কারও।

'আমার তো মনে হয়, আরও ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করলে কাজ হবে,' রবি বলল।

'আমার আঙুলগুলোর অবস্থা দ্যাখ,' সৌমিক তার দুহাতের আঙুলগুলো মেলে ধরল সবার সামনে। টর্চের আলোয় কাদামাখা, রক্তাক্ত কিছু আঙুল চোখে পড়ল। নখ ভেঙে গেছে, চামড়া ছিলে গেছে কনুইয়ের দিকে।

'তোর কী মনে হয়, কী হয়েছে?'

'বৃষ্টিতে উপরের দিকের মাটি নরম হয়ে ধসে পড়েছে,' রবি উত্তর দিল, 'বর্ষাকালে বৃষ্টিতে চিটাগাং আর পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়ই এরকম ঘটে। পাহাড়ের নিচের দিকে যারা ঘর বানিয়ে থাকে, প্রায়ই পাহাড় ধসে এসব বাড়ি চাপা পড়ে। এরকম পাহাড় ধসে কত বাড়িঘর যে চাপা পড়েছে, কত মানুষ যে মরেছে তার কোনো হিসাব নেই।'

‘এখানেও তাই ঘটেছে বলতে চাচ্ছিস?’ সৌমিক বলল।

‘এছাড়া আর কী হতে পারে? তুই বল,’ রবি বলল।

‘কিন্তু মং সেন হারামজাদা কোথায়?’ সৌমিক জিজ্ঞেস করল, ‘ওকে দেখছি না কেন?’

‘আজব ব্যাপার, ও কোথায় গেল?’ রবি বলল।

‘এখানেই আছে কোথাও,’ ফারহান বলল।

‘এখানেই আছে মানে?’ রবি বলল, ‘এখানে কোথায়? আমরা সবাই তো সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। মং সেন কি অদৃশ্য মানব হয়ে গেল নাকি?’

‘কী আজগুবি কথা!’ ফারহান বলল, ‘অদৃশ্য হবে কেন? মনে হয় ভেতরের দিকে গেছে।’

‘বাইরেও তো যেতে পারে, তাই না?’ সৌমিক বলল।

‘বাইরে গেলে চিন্তার কিছু নেই,’ ফারহান বলল, ‘ও কিছু না কিছু ব্যবস্থা করবে, আমাদের বের করার জন্য।’

‘যদি না করে?’ রবি বলল।

‘না করে ওর লাভ কী?’ ফারহান বলল, ‘আমাদের কাছ থেকে ও টাকা পাবে। উদ্ধার করতে পারলে আরও বেশি টাকা দেব। তাই না?’

‘কিন্তু এর পেছনে তো মং সেনের হাত থাকতে পারে? কী বলিস?’

‘মং সেন পাহাড় ধসিয়ে দিয়ে আমাদের এখানে আটকে রাখছে,’ ফারহান বলল, বাঁকা হাসি হাসল। ‘কী যে বলিস না তুই!’

‘হতেও পারে, তাই না?’ রবি বলল, সমর্থনের জন্য সবার দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ কোনো কোথা বলল না। তারা এখনও বুঝতে পারছে না কী ভাবা উচিত।

‘আমরা এখন কী করব?’ আদ্রিতা বলল।

মেয়ে দুজনের কথা ওরা যেন ভুলেই গিয়েছিল। আদ্রিতার কণ্ঠ শুনে সবাই ঘুরে তাকাল।

‘চিন্তার কিছু নেই,’ ফারহান বলল, ‘উদ্ধার করার লোক আছে। মং সেন ব্যবস্থা করবে।’

‘যদি না করে?’ প্রায় ফিসফিস করে বলল আদ্রিতা।

ফারহান উত্তর দিল না। প্রায় ভেজা ভেজা মেঝেতে বসে পড়ল। সৌমিক বসল ওর পাশে। সবাইকে ইশারা করল বসার জন্য। এক এক করে ওরা সবাই গোল হয়ে বসল।

‘দোস্ত,’ সৌমিক বলল, ‘মং সেন আমাদের উদ্ধার করবে এটা আমি নিশ্চিত, কিন্তু তাই বলে আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকা কী ঠিক হবে?’

'তুই কী করতে চাস?'

'আমরা এই মাটির স্তর খুঁড়ে বেরিয়ে যাব,' সৌমিক বলল, 'সময় লাগবে। কিন্তু আমরা এতগুলো মানুষ। চেষ্টা করলে অবশ্যই পারা যাবে।'

সৌমিকের কথাগুলো সবার কাছেই যৌক্তিক মনে হলো। ফারহান অবশ্য চুপ করে আছে।

'তুই কিছু বলছিস না কেন?' কঙ্কা বলল।

'আমার মাথা ধরেছে,' ফারহান বলল।

'আমাদের এখন থেকেই হিসাব করে চলতে হবে,' সৌমিক বলল, 'আমাদের কাছে টর্চলাইট আছে তিনটা। এগুলোর ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে মোবাইল ফোনের টর্চ ব্যবহার করা যাবে। আর খাবার, পানি কী কী আছে সেটার একটা হিসাব করা দরকার। যত কম সম্ভব খরচ করতে হবে। আমরা জানি না মং সেনের কত সময় লাগবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে আমাদের সার্ভাইভ করতে হবে।'

ব্যাকপ্যাকগুলো এক এক করে মাঝখানে এনে রাখল সবাই। একটা একটা করে খুলল। পানির বোতল পাওয়া গেল পাঁচটা, বিস্কুটের প্যাকেট আছে চারটা আর চিপসের প্যাকেট আছে ছয়টা। সিগারেট আছে দুই প্যাকেট। সেগুলো আলাদা করে একটা ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে রাখল সৌমিক।

'এই ব্যাগের দায়িত্বে থাকবে কঙ্কা,' কঙ্কার দিকে ব্যাগটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল সৌমিক, 'যার যা লাগবে ওর কাছে চেয়ে নেবে, ঠিক আছে?'

সবাই মাথা নাড়িয়ে সায় দিল।

একটা ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোনগুলো বের করা হলো। পাঁচজনের পাঁচটা ফোন, সেগুলোর মধ্যে আদ্রিতার ফোনের চার্জ নেই। বাকিগুলো দেওয়া হলো ফারহানের কাছে। একটা খোলা রেখে বাকিগুলোকে অফ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল ফারহান।

'মং সেন ইচ্ছে করেই বেরিয়ে গেছে,' আদ্রিতা বলল, 'হয়তো আমাদের বিপদে ফেলার জন্যই এই কাজ করেছে।'

'এ কথা বলছিস হঠাৎ করে?' ফারহান বলল।

'এই গুহায় আমরা সবাই একসাথে ঢুকেছি। ওর কাছে টর্চ লাইট ছিল, ওর ব্যাগ ছিল। ও যদি কোনো কাজে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, ওগুলো তো গুহায় থাকার কথা। আছে ওগুলো? নেই। তার মানে সে তার জিনিসপত্র নিয়ে একবারে বেরিয়ে গেছে। আমাদের এই বিপদের মধ্যে ফেলে গেছে।'

রবি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করেই চিৎকার করে গুহার বন্ধ মুখের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুহাত দিয়ে ক্রমাগত আঁচড়াচ্ছে। তাতে খুব একটা লাভ হলো না। বরং কাদামাটিতে মাখামাখি হয়ে গেল আরও।

'ও এভাবে চেঁচিয়ে উঠল কেন? ওর কী হয়েছে? ও এমন করছে কেন?' ফারহান বলল।

আদ্রিতা দুঃখের মধ্যেও হাসল। সহজ জিনিসটা এখনও ফারহান ধরতে পারছে না কেন সেটাই বুঝতে পারছে না। সৌমিকের চোখে-মুখে আধো-অন্ধকারেও অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে।

'কিছু বলছিস না কেন? ও এরকম করছে কেন?' ফারহান আবার জিজ্ঞেস করল।

রবি এখনও দুই হাতে দেওয়াল খোঁড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। রাগে চেঁচাচ্ছে মাঝে মাঝে। পরনের টি-শার্ট খুলে ফেলেছে। ফারহানের বোকা বোকা প্রশ্ন শোনার চেয়ে রবির সাথে হাত মেলানো ভালো, ভাবল আদ্রিতা।

'দোস্ত,' চাপা গলায় বলল সৌমিক, 'মং সেন আসবে না। ও জেনে বুঝেই বেরিয়ে গেছে। এখন এখান থেকে বেরোনোর পথ আমাদের নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমরা অবশ্যই বের হবো, চিন্তার কিছু নেই,' একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল ফারহান।

'হবো হয়তো,' আদ্রিতা বলল, 'জীবিত না মৃত অবস্থায় বের হবো, সেটাই এখন প্রশ্ন। মং সেন ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না আমরা ঠিক কোথায় আছি।'

আদ্রিতার শেষ কথাটায় কিছু একটা ছিল সম্ভবত। সিগারেট ফেলে দিয়ে ফারহানও রবির সাথে হাত মেলাল। সৌমিকও কাজে নামল।

ফারহানের ফেলে দেওয়া সিগারেটটা ধরাল কঙ্কা। উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করল কিছুক্ষণ। মং সেন যেখানে বসেছিল সেখানে গেল। টর্চের আলো সেখানে ঠিকমতো পৌঁছায়নি বলে জায়গাটা এখনও অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই মেঝে থেকে কিছু একটা তুলে নিল কঙ্কা। তারপর আদ্রিতার পাশে এসে বসল। কঙ্কার হাতে একটা স্বচ্ছ কাচের বোতল। বোতলটা অর্ধেকের বেশি ভরা। ভেতরে যে পানিটা আছে সেটা পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়।

'এই জিনিস তো ফেলে যাওয়ার কথা নয়,' আদ্রিতা বলল।

'কী জিনিস এটা? পানি না?'

'আরে না, পাহাড়ি মদ,' আদ্রিতা বলল, 'ছিপি খুলে দ্যাখ।'

কঙ্কা ছিপি খুলে দেখার প্রয়োজনবোধ করল না। তবে বোতলটা ফেলেও দিল না। একপাশে সরিয়ে রাখল।

আদ্রিতার চোখ বারবার বোতলটার দিকে চলে যাচ্ছে। এরকম বোতল থেকে ওদেরকে মদ খেতে দেখেছে সে, ক্যাম্পে। এগুলো নাকি খুব কড়া জিনিস, রবি বলছিল।

হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে ছিপি খুলল আদ্রিতা। কেমন অদ্ভুত বাজে একটা গন্ধ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে, পেটের নাড়িভুঁড়ি উলটে আসার জোগাড়। কিন্তু এরমধ্যেই চোখ-নাক-মুখ বন্ধ করে ঢকঢক করে বেশ খানিকটা খেয়ে নিল সে।

তরলটা গলা দিয়ে নামছিল আর মনে হচ্ছিল ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে একেবারে। এর আগে কোনোদিন মদ খায়নি আদ্রিতা তা নয়, কিন্তু এত কড়া লাগেনি। ঢোক গিলে খেয়ে ফেলার সাথে সাথে ভেতর থেকে বমি চলে আসছিল। কোনোমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। কঙ্কাকে ইশারা করতেই পানির একটা বোতল বাড়িয়ে দিল কঙ্কা। চাইলে পুরোটা বোতল এক ঢোকে শেষ করে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন এক বোতল পানি এভাবে খরচ করা যাবে না। এই অল্প একটু খেয়েই বোতলটা ফেরত দিল।

রবি এক ঝলক তাকিয়েছে আদ্রিতার দিকে, কিন্তু কিছু বলেনি। সে এখনও মহা উৎসাহে খুঁড়ে চলেছে। কিন্তু আদ্রিতা জানে এই উৎসাহ কিছুক্ষণ পরেই হতাশায় রূপ নেবে। ওরা খুব সহজেই হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু সে হাল ছাড়বে না। এই গুহায় দম আটকে, না খেয়ে মারা যাওয়ার জন্য তার জন্ম হয়নি।

গুহার ভেতর থেকে রাত-দিন বোঝার কোনো উপায় নেই। টর্চলাইটগুলো সব নিভিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু শুধু ব্যাটারি খরচ করার মানে নেই তাই। শব্দহীন এক পৃথিবীতে আছে যেন ওরা, নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কেবল। সৌমিকের মৃদু নাক ডাকার অভ্যাস আছে, সেই শব্দটা ছাড়িয়ে আর কোনো শব্দ আসছে না কোথাও থেকে।

সবাই ঘুমিয়ে আছে। একটানা পরিশ্রম করে সবাই ক্লান্ত। কঙ্কাও ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আদ্রিতার চোখে ঘুম নেই। পাহাড়ি মদ সামান্য একটু খেয়েছে, তাতে মাথাব্যথা বেড়েছে মাত্র। আর কোনো উপকার হয়নি। সে বারবার কেবল মং সেন-এর কথা ভাবছে। লোকটা তাদের এভাবে এই গুহায় রেখে চলে গেলে কেন? ও কি ফিরে আসবে লোকজন নিয়ে ওদের উদ্ধার করতে?

খুব বেশিক্ষণ ঘুমাল না কেউ। ঘুমের জন্য যে নিরাপত্তার অনুভূতি থাকতে হয়, সেটাই নেই কারও মধ্যে। কাজেই চোখ-মুখ লাল করে ধড়মড় করে উঠে বসল রবি। ওর উঠে পড়ার শব্দতেই বাকিরাও উঠে পড়ল এক এক করে। ফারহান পায়চারি করল কিছুক্ষণ। বোঝাই যাচ্ছে প্রাকৃতিক কর্ম সারার জন্য অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু গুহায়, সবার সামনে কীভাবে করবে

সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু ফারহান নয়, বাকি সবারই কম-বেশি একই অবস্থা। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছে না।

আদ্রিতার হিসেবে গুহায় ঢুকেছিল সন্ধ্যার দিকে, এখন নিশ্চয়ই ভোর হয়েছে পৃথিবীতে। বারো ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। পেটে সামান্য কিছু পড়েছিল, কিন্তু সেই সামান্য কিছু অনেক আগেই হজম হয়ে গেছে।

সৌমিক ঘুম থেকে উঠেই কাজে নেমে পড়েছে। রাতে রবি আর ফারহানকে নিয়ে যেখানে কাজ করছিল, সেখান থেকেই শুরু করেছে। দুই হাত দিয়ে যতটা সম্ভব মাটি আর পাথরের টুকরা সরানোর চেষ্টা করছে। তাতে বেশ খানিকটা জায়গায় মোটামুটি আকারের একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

গর্তটা দেখে প্রথমবারের মতো মনে আশার সঞ্চার হলো আদ্রিতার। কঙ্কার দিকে তাকাল। দুজনে উঠে দাঁড়াল। সৌমিকের সাথে দুজন হাত লাগাল। কঙ্কা প্লাস্টিকের একটা বোতল কেটে অর্ধেক করেছে। মুখের দিকের অংশটা ফেলে দিয়ে বাকি অংশ দিয়ে মাটি সরাচ্ছে। তাতে কাজ এগোচ্ছে ভালো।

মেয়ে দুজনকে এভাবে কাজে নামতে দেখে ফারহান আর রবিও হাত লাগাল।

তরুণ কয়েকজন ছেলে-মেয়ের জন্য এই গর্ত খুঁড়ে বের হওয়াটা কঠিন কিছু নয়।



প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ওরা একটানা মাটি খুঁড়েছে। ওদের পায়ের কাছে মাটি আর ছোট পাথরের একটা স্তূপ তৈরি হয়েছে। কিন্তু এতক্ষণ কাজ করার পরও আলোর কোনো চিহ্ন চোখে পড়েনি। প্রায় ফুট দুয়েক গর্ত তৈরি হয়েছে দেওয়ালে। আরও কতটা খুঁড়তে হতে পারে ধারণা নেই কারও। আদ্রিতার ধারণা আর ফুটখানেক খুঁড়তে পারলেই হবে।

ওরা সবাই এখন গুহার মেঝেতে শুয়ে আছে। সারা শরীর মাটিকাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। কঙ্কাকে দেখে মনে হচ্ছে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। আদ্রিতা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কোনোদিন কল্পনাও করেনি এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। ছেলেগুলোকে শুরুতে সাহসী আর উদ্যমী মনে হলেও ওদের দেখেও খুব একটা ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। তরুণ বলেই হয়তো মানসিকভাবে এখনও ভেঙে পড়েনি। কিন্তু আদ্রিতা জানে কায়িক শ্রম না করা তাদের জন্য এই দেওয়াল ভেদ করে ওপারে যাওয়া খুব কঠিন একটা ব্যাপার হয়ে যাবে।

মেঝেতে শুয়ে পড়ার আগে সবাই অল্প অল্প করে পানি খেয়েছে, বিস্কুট খেয়েছে। তাতে খিদে মরেনি, আরও তীব্রভাবে জানান দিচ্ছে। রবি উঠে বসল।

'কিছুদিন আগে থাইল্যান্ডে একটা কাণ্ড হলো, পত্রিকায়-টিভিতে খবরটা এসেছিল, মনে আছে তোদের?'

সবার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করল রবি। তবে কেউ উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করল না কিংবা শক্তি পেল না।

'বেশকিছু ছেলে তাদের কোচসহ পাহাড়ের এক গুহায় আটকে পড়েছিল, বারো-তেরোজন হবে।' রবি বলল, 'আটকে পড়ার প্রায় এগারো দিন পরে উদ্ধার পেয়েছিল। এরমধ্যে দশদিন ওরা একদম না খেয়ে ছিল সেই গুহার মধ্যে।'

'তুই কি বলতে চাস আমরাও দশদিন না খেয়ে থাকার জন্য প্রস্তুতি নেব?' ফারহান বলল।

'আমরা যদি বের হতে না পারি, তাহলে কী হবে?' রবি বলল, 'আমাদের কাছে যে খাবার আছে সেগুলো তো একদিনের বেশি চলবে না। চলবে?'

'একদিন লাগবে কেন?' ফারহান বলল, 'ঐ গর্ত খুঁড়ে আমরা আজকেই বেরিয়ে যাব।'

'এত পজিটিভলি ভাবিস না,' রবি বলল।

'তোর মতো সারাক্ষণ নেগেটিভ ভাবব নাকি শালা?' ফারহান বলল।

উত্তরে রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রবি, ওকে হাত ধরে থামাল সৌমিক। এই দুঃসময়ে নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করে অযথা শক্তিক্ষয়ের কোনো মানে নেই।

রবি আর কিছু বলল না। সে একটা সিগারেট ধরাল। এমনিতে গুহার ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে। অল্প জায়গা, তার মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া থমথমে মেঘের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকল। আদ্রিতার সিগারেটের ধোঁয়ায় সমস্যা হয় না। সে বেশ কয়েকবার সিগারেটে টান দিয়ে দেখেছে। ভালো লাগেনি, খারাপও না। কঙ্কার অবশ্য সিগারেট সহ্য হয় না। এমনিতেই সবসময় রাগারাগি করে ছেলেদের সিগারেট খাওয়া নিয়ে, এখন এই গুহার মধ্যে ওকে আরও বেশি বিরক্ত বলে মনে হচ্ছিল। যদিও কিছু বলছে না, কিন্তু আদ্রিতা জানে যেকোনো সময় কঙ্কা প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

কাজে নেমেছে, কিন্তু খুব বেশি এগোচ্ছে না। বারবার মনে হচ্ছে এই বুঝি দেওয়াল খুঁড়ে ওপাশের আলোর চিহ্ন দেখা যাবে। আদ্রিতা টের পাচ্ছে সে হাতে কোনো শক্তি পাচ্ছে না। নখগুলো এরমধ্যেই ভেঙে গেছে, আঙুলের ডগা অসাড় হয়ে আছে।

এসময় হঠাৎ সবাইকে চুপ থাকতে বলল সৌমিক। সে যেন কিছু একটা শুনতে পেয়েছে। সবাই থেমে গেল। গুহার দেওয়ালে কান পাতল সৌমিক। ওর দেখাদেখি বাকিরাও কান পাতল।

হালকা একটা শব্দ আসছে। মেঝেতে কান পাতলে কারও পায়ের শব্দ যেমন শোনা যায়, অনেকটা সেরকম। মনে হচ্ছে কেউ হাঁটছে। ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। গুহার বাইরে কেউ কী আছে তাহলে? হাঁটাহাঁটি করছে? তাদের উদ্ধার করতে এসেছে? মং সেন নিশ্চয়ই!

হঠাৎ করেই দেওয়ালে জোরে ধাক্কা দিয়ে চেঁচাতে শুরু করল কঙ্কা। 'হেল্প হেল্প' বলে সেই চেঁচানোর শব্দ গুহার ভেতরের দেওয়ালগুলোতে

প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যেন। আদ্রিতা অবাক হয়ে দেখল সে নিজেও কঙ্কার সাথে সুর মিলিয়েছে। ছেলেরাও দেওয়ালে ঘুসি মারতে মারতে চেঁচাতে শুরু করল। নিশ্চয়ই দেওয়ালের ওপাশে যে আছে সে শুনতে পাবে।

একটানা অনেকক্ষণ চেঁচাল ওরা। চেঁচাতে চেঁচাতে গলা ভেঙে গেছে কঙ্কার, সে এখন হাঁটু গেড়ে নিচে বসে পড়েছে। রবি আর ফারহানের হাত রক্তাক্ত হয়ে গেছে দেওয়ালে ক্রমাগত ঘুসি দেওয়াতে। সৌমিক আবার দেওয়ালে কান পেতেছে। আদ্রিতা কী করবে বুঝতে পারছে না।

'কেউ আছে ওপাশে,' সৌমিক বলল, 'না হলে এরকম মানুষের হাঁটাচলার শব্দ পাচ্ছি কোত্থেকে, তাই না?'

'আমার মনে হয়, খোঁড়াখুঁড়ি থামানো উচিত হবে না। কে আছে বা নেই তার উপর ভরসা করে না থেকে নিজেদের কাজ নিজেদেরই করতে হবে,' আদ্রিতা বলল।

ফারহান আর রবি দুজন দুজনের দিকে তাকাল। একটু আগেও একজন আরেকজনের উপর রেগে ছিল, এখন দুজনের দৃষ্টিতেই নমনীয়তা।

'ফারহান, তুই বল, এখন আমাদের কী করা উচিত?' রবি বলল।

'আমি জানি না দোস্ত।' ফারহান বলল, 'তোরা যা করতে চাস কর, আমি আছি।'

ওরা আবার কাজে নামল। সময় চলে যাচ্ছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এরমধ্যেই ওরা প্রায় কাতর। আদ্রিতা বেশ কিছুক্ষণ খোঁড়ার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে গুহার মেঝেতে শুয়ে পড়ল। পরনের টি-শার্ট, জিন্সের প্যান্ট কাদায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে, চুলে কাদা লেগে যাচ্ছে সেসব দিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কেন জানি মনে হচ্ছে ওরা যতটা সহজ ভাবছে এই গুহা থেকে বের হওয়াটা, ব্যাপারটা তত সহজ হবে না। এখানেই হয়তো ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। কিন্তু মরার আগে শেষ চেষ্টা করা উচিত।

রবিও এসে শুয়ে পড়ল আদ্রিতার পাশে।

'দোস্ত, আমি একটা প্ল্যান করেছি, তোকে বলছি,' চাপা গলায় রবি বলল।

রবি আর ফারহানকে খুব দায়িত্বশীল কথাবার্তা বলতে শোনেনি, কিংবা ওদের কাজ-কর্মেও ওকে কখনো দায়িত্বশীল পুরুষ মানুষ মনে হয়নি। সৌমিক এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। ও সবসময় চিন্তাভাবনা করে কাজ করার চেষ্টা করে। তাদের ছোটখাটো এই দলটার মধ্যে সৌমিক কিছুটা যুক্তিবাদী। যাই হোক, রবি যে খুব দরকারি কোনো কথা বলবে তা আদ্রিতা বিশ্বাস করে না।

'বল।'

'আলেকজান্ডার পিয়ার্সের গল্পটা জানিস?'

'না, কে এই লোক?' আদ্রিতা বলল।

'লোকটা নরখাদক ছিল,' রবি বলল, 'সঙ্গীসাথিদের নিয়ে সে জেল থেকে পালিয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গীসাথিদেরই সে এক এক করে খেয়ে ফেলে। তাকে যখন ধরা হয় তখনও তার পকেটে এক সঙ্গীর শরীরের অংশ ছিল। মৃত্যুর আগে সে কি বলে গিয়েছিল জানিস?'

'না।'

'সে বলেছিল মানুষের মাংসের স্বাদ অতুলনীয়। মাছ বা শূকরের মাংসের চেয়ে অনেকগুণ ভালো।'

'তুই কি আলেকজান্ডার পিয়ার্স হয়ে আমাদের খেয়ে ফেলবি?'

'জানি না,' রবি বলল, 'খিদে পেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। সে তখন খাদ্যচক্রের সবচেয়ে উঁচু স্তরে থাকা প্রাণীর ভূমিকা নেয়।'

'এরকম পরিস্থিতি হলে লিস্টে আমার নাম কি শুরুতে থাকবে না শেষে?'

'তোকে একদম শেষে খাবো,' রবি বলল, 'মজাদার জিনিস শেষে খেতে হয়।'

'এই তোরা কী নিয়ে কথা বলছিস?' কঙ্কা এসে শুয়ে পড়ল আদ্রিতার পাশে।

'কিছু না,' আদ্রিতা বলল।

'প্রেম করছিস না তো আবার?'

'গুহার ভেতর প্রথম প্রেম? হাসালি,' আদ্রিতা বলল।

'প্রেম-ভালোবাসা কিন্তু এরকম হঠাৎ করেই হয়,' কঙ্কা বলল। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, রবি হাতের ইশারায় ওকে থামাল। গুহার মেঝেতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে সে। কিছু একটা শুনতে পেয়েছে মেঝেতে।

রবি আর সৌমিক খোঁড়াখুঁড়ি থামাল। ওরা কাজ করছিল ঠিকই, কিন্তু একই সাথে ওদের কথাবার্তাও শুনছিল।

'মনে হচ্ছে কারও পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি,' রবি বলল।

আদ্রিতা আর কঙ্কাও মাথা দিল গুহার মেঝেতে। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমার তো মনে হয় একজন না, বেশ কয়েকজনের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি,' আদ্রিতা বলল।

'কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব, গুহাতে আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ তো নেই, তাই না?' রবি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সবার দিকে।

এর উত্তর কারও কাছে নেই। গুহার ভেতর সুনসান নীরবতা। সবাই গুহার মেঝেতে কান পেতে আছে।

আদ্রিতা নিশ্চিত সে পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে। কিন্তু কে হাঁটছে? কারা হাঁটছে? শব্দটা কি গুহার বাইরে থেকে আসছে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শব্দ মিলিয়ে গেল। সবাই সবার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কিছু বলছে না।

'আমার মনে হয় এই শব্দ বাইরে থেকে আসছে,' সৌমিক বলল।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' আদ্রিতা বলল।

'তাহলে আমাদের কী করা উচিত?'

'গুহার দেওয়াল খোঁড়া উচিত। এছাড়া আর কিছু করার নেই,' ফারহান বলল।

'মং সেন নিশ্চয়ই লোকজন জড়ো করছে, না হলে পায়ের আওয়াজ পাওয়ার কথা নয়। এদিকে তেমন লোকজন আসে বলে তো মনে হয় না।'

'সেনাবাহিনীর কিছু লোকজনকে তো দেখেছিলাম, তাই না?' আদ্রিতা বলল। 'আমরা ওদের কাছ থেকে লুকিয়ে ভুল করেছি। তবে...'

'তবে কী?'

'ওরা নিশ্চয়ই আমাদের ক্যাম্প খুঁজে পাবে। সেই ক্যাম্পে কারা এসেছিল, থেকেছিল, এটা নিশ্চয়ই ওরা খোঁজখবর করবে।'

'কিন্তু আমরা যে এই গুহায় আটকে গেছি সেটা কীভাবে জানবে?' রবি বলল।

'মং সেন জানাবে।'

'মনে হয় না। সেনাবাহিনীর লোকজনকে সে কোনোমতেই কিছু জানাবে বলে মনে হয় না। এতে সে আরও ঝামেলায় পড়ে যাবে। এখানে পর্যটকরা আসে না সাধারণত। নিশ্চয়ই এখানে আসার অনুমতি দেওয়া হয় না।'

'এখানে এমন কী আছে যে অনুমতি দেওয়া হয় না?' সৌমিক বলল, 'তোদের কী ধারণা?'

'মং সেন এক গুরুর কথা বলেছিল, এক পাহাড়ের উপর বসে ধ্যান করে,' আদ্রিতা বলল, 'কিন্তু তাতে এখানে আসার উপর সমস্যা হবে কেন?'

'জানি না,' সৌমিক বলল, 'চল, হাত গুটিয়ে বসে না থেকে আবার কাজে নামি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সবাই আবার কাজে নামল।

বাইরে রোদ না বৃষ্টি কিছু বোঝার উপায় নেই। আদ্রিতা এক ফাঁকে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সাতটার মতো বাজে। বলা

যায় পুরো একটা দিন পার হয়ে গেছে এই গুহায় ঢোকার পর থেকে। খিদে পেয়েছে। হাত ব্যথা করছে। আঙুলগুলো নাড়ানো যাচ্ছে না।

ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এরমধ্যেই গুহার মেঝেতে শুয়ে পড়েছে কঙ্কা। বাকিরা এখনও হাল ছাড়েনি। এরমধ্যেই হঠাৎ করে আর্তনাদ করে উঠল রবি। আদ্রিতার পাশেই দাঁড়িয়ে খুঁড়ছিল। হঠাৎ এরকম অদ্ভুত শব্দ করার মানে বুঝতে পারল না কেউ। টর্চের আলো ফেলল সৌমিক ওর মুখে।

'কী হয়েছে?'

রবি কিছু বলল না। আঙুল তাক করল দেওয়ালের দিকে। ওর দেখানো জায়গায় টর্চের আলো ফেলল সৌমিক। কিন্তু তাতেও কিছু বোঝা গেল না।

'হাত দিয়ে দ্যাখ,' রবি বলল।

সৌমিক এগিয়ে গিয়ে খোঁড়ার জায়গাটায় হাত রাখল। শীতল, শক্ত আর ভেজা একটা অনুভূতি হলো। পাথর।

রবির আর্তনাদ করার মানে বুঝতে পারল আদ্রিতা। দেওয়ালজুড়ে এখানে শক্ত পাথর। অথচ গতকাল সন্ধ্যায় এখান দিয়েই ওরা ঢুকেছিল গুহাতে। ছোট একটা প্রবেশপথের মতো ছিল। উপর থেকে তাহলে কি পাথরখণ্ড গড়িয়ে নেমে প্রবেশপথটাকে চিরতরে বন্ধ করে দিল?

এই একই প্রশ্ন অন্য সবার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ফারহান মেঝেতে বসে পড়ল। সৌমিক দাঁড়িয়ে আছে এখনও। কিছু বলছে না। রবি তাকাল আদ্রিতার দিকে। ওর চোখে-মুখে বিষণ্ন দৃষ্টি।

আদ্রিতা বুঝতে পারছে না এখন কী বলবে বা করবে? খালি হাতে মাটি খুঁড়ে যতটুকু যাওয়া সম্ভব ওরা যেতে পারবে, কিন্তু পাথরখণ্ড? সেটা কীভাবে ভাঙবে? আর যদি ভাঙতে না পারে, তাহলে কি এই গুহা থেকে বের হতে পারবে না।

তিলে তিলে পাঁচজন তরুণ-তরুণী মরে যাবে? পৃথিবীর কেউ জানতেও পারবে না তাদের কী হলো?

চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল আদ্রিতার। মা'র মুখটা মনে পড়ছিল বারবার। মরে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো কথা বলারও সুযোগ নেই।

কঙ্কার পাশে গিয়ে বসল আদ্রিতা। মাথাব্যথা করছে, শরীরও ভালো লাগছে না। আসলে খালি পেটে কিছুই ভালো লাগে না। সব অসহ্য লাগতে থাকে। ফারহানকে দেখতেই সবচেয়ে বেশি অসহ্য লাগছে। ওর জোরাজুরিতেই এখানে আসা। না হলে ঢাকায় নিরাপদে বাসার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বাতাস খেতে খেতে নেটফ্লিক্স বা অন্য কোথাও সিনেমা, ওয়েব সিরিজ দেখা যেত। সেসব গল্পের ফাঁক-ফোকর নিয়ে তুমুল আড্ডায়

মেতে থাকতে পারত। ছুটির কয়েকটা দিন সহজেই কেটে যেত, মা-বাবা আর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডায়, কিংবা বই পড়ে। কিন্তু কিছুই হলো না। বরং এখানে কঙ্কাল হয়ে পড়ে থাকবে কয়েকজন তরুণ-তরুণী। অমীমাংসিত রহস্য হয়ে থাকবে মানুষের কাছে।

গুহার ভেতরটা বেশ শীতল হয়ে আছে। কতগুলো প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ছোট এইটুকু জায়গার মধ্যে কীভাবে থাকবে, এরপর কী করবে? খাবার শেষ হয়ে যাবে আজকে রাতেই? তারপর?

এসব প্রশ্নের উত্তর আদ্রিতার কাছে নেই। কিন্তু সে ভাগ্যের কাছে হার মানতে রাজি নয়।

রবি একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে গুহার ছাদের দিকে। সৌমিক শূন্য দৃষ্টিতে এখনও তাকিয়ে আছে গুহার দেওয়ালের দিকে। কঙ্কা চুপচাপ শুয়ে আছে। ওকে কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু ওদের কথাবার্তার সুরেই সব বুঝতে পেরেছে।

'আমি এখানে মরতে আসিনি,' আদ্রিতা বলল। 'ওঠ, কাজে নাম।'

'কী করব?' সিগারেটে টান দিয়ে রবি বলল। 'আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

'কীসের অপেক্ষা? কার অপেক্ষা?'

'মৃত্যুর অপেক্ষা,' মৃদু হেসে উত্তর দিল রবি।



গুহার অন্ধকারে সময়ের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। সব যেন থেমে আছে। পাঁচজন তরুণ-তরুণী চুপচাপ শুয়ে বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। রবি একবার উকলেলে হাতে নিয়ে বাজানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটাও বেশিক্ষণ স্থায়িত্ব পায়নি।

কঙ্কা উঠে বসল অনেকক্ষণ পর। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। শেষ কখন খেয়েছে মনে করতে পারছে না। খিদের চোটে নিজেকে মাতাল মাতাল লাগছে তার কাছে। ফারহান ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সে। তার প্রতি ফারহানের কিছুটা দুর্বলতা আছে, সেটা কেউ না বলে দিলেও টের পায় কঙ্কা। কিন্তু এটাও জানে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ হচ্ছে ফারহান। ওর উপর কোনো কিছুতেই ভরসা করা যায় না, বিশ্বাস রাখা যায় না। সবকিছু নিয়েই ওর এলোমেলো চিন্তাভাবনা। কাজেই ফারহানের ভালো লাগা নিয়ে কঙ্কা এক মুহূর্ত ভাবেনি কোনোদিন।

অন্যদিকে সৌমিক অনেক হিসাবি, রবি একদম উন্নাসিক, ভ্যাগাবন্ড ধরনের। আদ্রিতা আছে ভরসার জায়গা। এই মেয়েটা একদম নরম-সরম, মাঝে মাঝে মনে হয় খুব আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে। কিন্তু কঙ্কার মনে হয় সত্যিকারের অস্থিরতায় একমাত্র আদ্রিতাই হতে পারে একমাত্র ভরসার জায়গা।

রবি উঠে দাঁড়িয়েছে। কঙ্কার কাছে এসে দাঁড়াল। ওর কাঁধে হাত রাখল।

'তুই কী ভয় পাচ্ছিস?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রবি।

'হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি।'

'আমরা আছি না, ভয়ের কিছু নেই,' রবি বলল।

'একটু আগেই তুইই না বললি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিস, এখন আবার এই কথা বলছিস!'

'মৃত্যুকেই তো ভয়ের কিছু নেই,' রবি বলল, 'আর তোর কিছু হওয়ার আগে আমরাই মরব।'

'আমরা কেউই মরব না,' কঙ্কা বলল, 'একটা কিছু তো হবেই।'

'কী হবে? মিরাকল?' সৌমিক বলল, সে এখন মেঝেতে শুয়ে আছে। কিন্তু মন দিয়ে রবি আর কঙ্কার কথা শুনছিল।

'মিরাকল তো ঘটেই, ঘটে না?' কঙ্কা বলল।

'মিরাকল সবসময় ঘটে না দোস্ত,' সৌমিক বলল, 'আগে আমাদের নিজেদের মিরাকল ঘটানোর মতো সাহস দেখাতে হবে। তারপর মিরাকল ঘটবে।'

'সাহস দেখাব মানে? কী করতে হবে? তুই বল।' ফারহান বলল এবার। সেও চোখ বুজে সব শুনছিল।

'তোর কিছু করতে হবে না,' সৌমিক বলল, 'তুই শুধু ক্যামেরাটা রেডি রাখিস, পটাপট ছবি তুলবি শুধু।'

'এই গুহায় আটকে পড়ার জন্য তোরা কী আমাকে দায়ী করছিস?' ঝট করে উঠে বসল ফারহান। বেশ জোরের সাথেই কথাগুলো বলল।

আদ্রিতা ঘুমানোর চেষ্টা করছিল। ফারহানের কথায় উঠে বসল। তবে উত্তর দিল না। কাউকে দোষ দেওয়ার কোনো মানে নেই। তাহলে এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে যাবে। সবাইকে এখন একসাথে থাকতে হবে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

'মং সেন কোথায়? এই লোকটাই দায়ী? সে-ই আমাদের এই গুহায় ঢুকিয়েছে?' আদ্রিতা বলল।

'ও কেন দায়ী হবে? আমরা নিজেরাই নিজের ইচ্ছেতে এই গুহায় ঢুকেছি,' কঙ্কা বলল।

'কিন্তু সে তো বেরিয়ে গেছে, জানে আমরা এখানে আটকে গেছি, কিন্তু আমাদের এখান থেকে বের করে নেওয়ার কোনো আলামত তো দেখছি না!'

'সে হয়তো চেষ্টা করছে, আমরা জানি না।' ফারহান বলল, 'সকাল হলেই দেখব সব ঠিক আছে।'

'এই আশা নিয়েই থাক,' সৌমিক বলল।

'দ্যাখ, সমু, মেজাজ কিন্তু খুব খারাপ।' ফারহান বলল, 'আরেকবার আমাকে খোঁচা দিয়ে কথা বললে কাজটা ভালো হবে না।'

'ভালো হবে না মানে? কী করবি?'

'মনে নেই কী করতে পারি আমি? নাকি মনে করিয়ে দিতে হবে?' ফারহান বাঁকা গলায় বলল।

ফারহান আর সৌমিকের বন্ধুত্ব অনেক পুরানো। সেই স্কুল থেকে। কাজেই ঠিক কোনো ঘটনা সৌমিককে ফারহান মনে করিয়ে দিতে চায় সেটা বাকিরা কেউ আন্দাজ করতে পারল না। ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে তেমন কোনো গন্ডগোল দুজনের মাঝে চোখে পড়েনি। কিন্তু নিশ্চয়ই পুরানো কোনো ব্যাপার আছে, যা ওরা দুজনেই চেপে রেখেছে নিজেদের মধ্যে। তবে এখনকার পরিস্থিতিতে পুরানো বিষয় টেনে আনা আর তর্কাতর্কিকে বাড়তে দেওয়া হলে, ওদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যাবে।

রবি ফারহানকে একপাশে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। সৌমিক বিরক্ত মুখে থুতু ফেলল গুহার দেওয়ালে।

আদ্রিতা একটা টর্চলাইট নিয়ে আলো ফেলল ফারহানের মুখে। তারপর সৌমিকের মুখে।

'তোরা দুজন যদি আর একটা কথা বলিস, আমি এই টর্চলাইট তোদের মাথায় ভাঙব,' আদ্রিতা বলল।

ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যিই আদ্রিতা মেরে বসবে কাউকে। ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে, চোয়াল চেপে আছে দৃঢ় প্রত্যয়ে।

ফারহান একপাশে গিয়ে সিগারেট ধরাল। বিস্কুটের প্যাকেট খুলল আদ্রিতা। সবার হাতে একটা করে দিল, নিজে একটা নিল। এই খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত হবে না, ক্ষুধার আগুন আরেকটু বাড়িয়ে তোলা হবে। কিন্তু কিছু করার নেই।

'আমার ঘুম আসছে না, মাথাব্যথা করছে খুব,' কঙ্কা বলল।

'খিদের জ্বালায় এমন হচ্ছে,' আদ্রিতা বলল।

'সকালে একটা কিছু হবে, সাহস রাখ,' ফারহান বলল। 'মং সেন নিশ্চয়ই ওর লোকজন নিয়ে আসবে। সম্ভবত সেনাবাহিনীর লোকজনের ভয়ের আসতে পারছে না।'

'তা হতে পারে,' কঙ্কা বলল, 'কিন্তু আমরা কী করব?'

'আমরা মেডিটেশন করতে পারি,' রবি বলল, 'থাইল্যান্ডের যে ছেলেগুলো দশদিন না খেয়ে ছিল, ওরা কিন্তু বেঁচে ছিল। ওরা সবাই নাকি সেখানে মেডিটেশন করেছিল। ওদের সাথে যে কোচ ছিল, সে-ই ওখানে ওদেরকে মেডিটেশন করিয়েছে।'

'মেডিটেশন করেছিস কোনোদিন?' আদ্রিতা বলল, 'নাকি শুধু বড় বড় আলাপই করে যাবি সারাজীবন?'

'অল্পস্বল্প পড়েছি, কীভাবে করতে হয় ধারণা আছে,' রবি আমতা আমতা করে বলল, 'কোনোদিন প্র্যাকটিস করা হয়নি।'

'জীবনে কোনটা কখন কাজে লাগবে তা বলা খুব মুশকিল,' কঙ্কা বলল।

'আমি এইসবে বিশ্বাস করি না,' আদ্রিতা বলল, 'মনের জোর থাকতে হবে আমাদের। সকালে কে আমাদের উদ্ধার করতে আসবে তার আশায় বসে থাকা যাবে না।'

'তাহলে কী করতে চাস তুই? খালি হাতে ঐ পাথর কেটে ওপাশে চলে যাবি?' ফারহান বলল।

'জানি না, কিন্তু তোর ঐ মং সেনের আশায় বসে থাকলে এখানে মরে শুঁটকি হয়ে যেতে হবে,' আদ্রিতা বলল।

ফারহান কিছু বলতে গিয়েও বলল না। রবি উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাইকে হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বলল। গুহার দেওয়ালে কান পাতল। ওর চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। পা টিপে টিপে বাকিরাও এক এক করে ওর পাশাপাশি গুহার দেওয়ালে কান পাতল। কিছু একটা শব্দ পাচ্ছে ওরা। কিন্তু শব্দটা কীসের বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে আশপাশে কোথাও লোকজন হাঁটছে, কিংবা কথা বলছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার সব নীরব হয়ে এলো। আদ্রিতা টর্চের আলো ফেলল গুহার দেওয়ালগুলোতে। ওরা ঠিক যেখানে বসে আছে, তার উলটোদিকেই বসেছিল মং সেন। ওদের বন্ধুদের সাথে খাপ খায় না বলেই হয়তো আলাদা বসেছিল। সেদিকে এগিয়ে গেল আদ্রিতা। ওর পেছন পেছন কঙ্কাও গেল।

টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছে ওরা। গুহার এই অংশটা বেশ এবড়ো-খেবড়ো। মাঝে কিছু জায়গায় পানি জমেছে। অসাবধানতাবশত পানিতে পা দিয়ে ফেলল কঙ্কা। পা মচকে বসে পড়ল সেখানেই। ফারহান উঠে এগিয়ে গিয়ে ওকে হাত ধরে দাঁড় করাল।

আদ্রিতা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। এখানে গুহার পেছনের অংশ। এতক্ষণ এই জায়গাটার ধারেকাছেও আসেনি ওরা কেউ। অথচ আদ্রিতা দেখতে পাচ্ছে, সেখানে দুটো পাথরের মাঝখানে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা।

টর্চের আলো ফেলল সেখানে। কষ্ট হলেও একজন মানুষ এই ফাঁক গলে ওপাশে যেতে পারবে।

কিছু বলার আগেই দলের বাকি সবাই হাজির হলো আদ্রিতার পেছনে। রবিও একটা টর্চের আলো ফেলেছে। জায়গাটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সৌমিক এগিয়ে গিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে শরীর গলানোর চেষ্টা করল। দেখা গেল সৌমিক বেশ সহজেই ফাঁকা জায়গাটা গলে ওপাশে যেতে পারবে।

'এখানে ফাঁকা জায়গা আগে খেয়াল করিনি কেন?' আদ্রিতা জিজ্ঞেস করল।

উত্তর দিল না কেউ। আসলে গুহায় আটকে পড়ার পর আতঙ্কে এতটাই অস্থির ছিল আর যেখান দিয়ে ঢুকেছিল, সেখানকার পাথর সরাতে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, অন্যদিকে আর কেউ সেভাবে নজর দেয়নি।

'ওপাশে কী আছে বলে তোর ধারণা?' ফারহান জিজ্ঞেস করল।

'আমার কোনো ধারণা নেই,' আদ্রিতা বলল।

'মং সেন কী এই ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে?' কঙ্কা প্রশ্ন করল এবার। এই প্রশ্নটা আদ্রিতার মাথায়ও ঘুরপাক খাচ্ছিল।

'কিন্তু এদিক দিয়ে গেলে বেরোনোর রাস্তা কি পাওয়া যাবে?' রবি জিজ্ঞেস করল।

'যেতেও পারে,' আদ্রিতা বলল, 'হয়তো গুহার অন্যদিক দিয়ে বেরোনোর রাস্তা আছে। মং সেন সুযোগ বুঝে এদিক দিয়ে পালিয়ে গেছে। আমাদের জানানোর প্রয়োজনবোধ করেনি।'

'আন্দাজে কথা না বলাই ভালো,' ফারহান বলল।

'এখন আমাদের কী করা উচিত?' জিজ্ঞেস করল কঙ্কা।

'আমার হিসেবে এই ফাঁক দিয়ে ওপাশে গিয়ে দেখা উচিত, আসলে কোনো পথ আছে কি না বের হওয়ার,' আদ্রিতা বলল।

'আমার তো মনে হয় না এসবের কোনো দরকার আছে,' ফারহান বলল, 'আমরা এখানেই অপেক্ষা করতে পারি। সাহায্য আসবেই।'

'আমি তোর মতো এতটা নিশ্চিত হতে পারছি না,' কঙ্কা বলল।

'কিন্তু ওপাশে গিয়ে এমনও হতে পারে আমরা আরও বড় কোনো ঝামেলায় পড়লাম,' ফারহান বলল।

'তুই এখানে থাক, আমি যাব,' কঙ্কা বলল।

'তুই একা যাবি?' ফারহান বলল। 'বুদ্ধিমান কেউ এই ঝুঁকি নেবে না।'

'আমি বুদ্ধিমান না, আমি যাব,' রবি বলল।

'তুই যাবি?' এবার আদ্রিতাকে প্রশ্ন করল কঙ্কা। এই প্রথমবারের মতো নিজেকে নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল আদ্রিতা। সে সবসময়ই ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষে। কিন্তু এখানে ঝুঁকি নেওয়াটা একটু বেশি হয়ে যাবে। এমনিতে সে ফারহানের সাথে অনেক কিছুতেই একমত নয়। কিন্তু এখানে এখনও বেশ

নিরাপদে আছে ওরা। সাহায্যও হয়তো আসবে। এই নিরাপদ জায়গাটুকু ছেড়ে একদম অজানার উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

'আমি যাব না,' আদ্রিতা বলল।

'তুই এখানেই থাকতে চাস?' কঙ্কা বলল, 'আমাদের সাথে খাবার-দাবার কিছু নেই। আর বেশি হলে কয়েকঘণ্টা, এরপরই খাবার শেষ হয়ে যাবে। সাহায্যের জন্য কেউ আসবে কি না সেটাও আমরা জানি না। এই অবস্থায় এখানে চুপচাপ বসে থাকা মানে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া।'

'কিন্তু সামনে যদি আরও বিপদ থাকে?'

'বাঁচতে হলে এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে,' কঙ্কা বলল।

'আমরা একসাথে এসেছি, যা করব একসাথেই করব।' রবি বলল, 'আমরা ভোটাভুটি করব। যারা জিতবে তাদের কথামতোই কাজ হবে। এখন বল কে কে ওপাশে যেতে চাস? হাত তোল।'

রবি নিজে হাত তুলল, আর কঙ্কা। আদ্রিতা আর ফারহান নিজেদের মতামত আগেই জানিয়ে দিয়েছে, ওরা হাত তোলেনি। কাজেই সবাই বেশ প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সৌমিকের দিকে। আদ্রিতা সৌমিকের মতামতকে গুরুত্ব দেয়। ওর মতামত জানার জন্য প্রবল কৌতূহল হচ্ছে।

সৌমিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এখনও এটা ওর চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

'তুই কি যেতে চাস? না যেতে চাস না?' জিজ্ঞেস করল রবি।

'আমি ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি না।' সৌমিক বলল, 'কিন্তু জীবনে কিছু কিছু জায়গায় ঝুঁকি নিতে হয়। হয়তো এই ঝুঁকিটাই আমার এবং আমাদের সবার জন্য বিপদের কারণ হবে। কিন্তু এখানে বসে থেকেও তো লাভ নেই। কাজেই আমি যাচ্ছি,' এটুকু বলে সৌমিক হাত তুলল।

ফারহান আর আদ্রিতা একে অপরের দিকে তাকাল। ওরা দুজন একটা দলের অংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠরা যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই মেনে নিতে হবে। কাজেই মানসিকভাবে ওরা প্রস্তুত হয়ে গেল সাথে সাথেই।

'আমি আগে ওপাশে যাব,' রবি বলল, 'তারপর আমি ইশারা করলে এক এক করে বাকিরা যাবে, ঠিক আছে?'

সবাই মাথা নাড়িয়ে সায় দিল। ব্যাগপত্র যা ছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই গুছিয়ে নিল ওরা। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়েছে আদ্রিতা। রাত দুটো বাজে। এইসময় ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকার কথা ওর। কিন্তু গুহার ভেতরে সময়ের কোনো ঠিক নেই। সারাদিন কাজ করে আর ঘুমিয়ে এখন শরীর

একদম ঝরঝরে। কাজেই ওপাশে যাওয়ার জন্য মানসিক এবং শারীরিক দুভাবেই প্রস্তুত সে।

রবিকে খুব বেশি কসরত করতে হলো না। অল্প কিছুক্ষণের চেষ্টায় ওপাশে চলে যেতে পারল ও। কিন্তু ওপাশে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পার হয়ে যাওয়ার পরও ওর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ফাঁকা অংশটার দিকে বেশ উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে সবাই।

এরমধ্যেই হঠাৎ চিৎকারের শব্দে আঁতকে উঠল সবাই। আদ্রিতার মনে হচ্ছিল তার বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে আসবে যেকোনো সময়। চিৎকারের শব্দে তার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেছে। বাকিদের অবস্থাও একই রকম। টর্চের মৃদু আলোয় আদ্রিতা দেখল সবার চোখ-মুখ ফ্যাকাশে। রবি কি তাহলে বেঁচে নেই? কী হয়েছে ওর? এভাবে চিৎকার করল কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের।

‘তোকে আমি মেরেই ফেলব হারামজাদা,’ কঙ্কা চেঁচিয়ে বলল।

ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে রবির মুখটা দেখা যাচ্ছে। হাসছে। ভেংচি কাটছে।

‘এরকম ফাজলামি কেউ করে?’ আদ্রিতা বলল।

‘আমি করি,’ রবি বলল ওপাশ থেকে।

‘দোস্ত, এইসব করিস না।’ ফারহান বলল, ‘আমার হার্ট এমনিই দুর্বল।’

‘আচ্ছা যা করলাম না,’ রবি বলল।

‘কী অবস্থা বল,’ কঙ্কা বলল।

‘টর্চের আলোয় যা বুঝলাম গুহাটা বেশ বড়।’ রবি বলল, ‘এখানে দাঁড়ানো যাচ্ছে বেশ। সামনেও এগিয়ে যাওয়া যাবে। হয়তো পাহাড়ের অন্য পাশ দিয়ে বেরোনোর পথও মিলতে পারে।’

‘তাহলে আমরা আসছি এক এক করে,’ কঙ্কা বলল, ‘তার আগে আমাদের সবার ব্যাগগুলো পাচার করি।’

‘আচ্ছা,’ রবি বলল।

কঙ্কা এক এক করে রবির হাতে ওদের ব্যাগগুলো দিল, সেগুলো ওপাশে সরিয়ে রাখল রবি। এরপর প্রথমে কঙ্কা পার হলো, তারপর আদ্রিতা, সৌমিক। সবার শেষে ফারহান। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজটা করছে।

ফারহান চলে আসার পর জায়গাটার দিকে তাকাল সবাই। টর্চের আলোয় সামনে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখানে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে গুহার

ছাদ বেশ নিচু। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। ঘাড় গোঁজ করে একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে সমস্যা হচ্ছে, তাই সবাই হাঁটু গেড়ে বসল।

'আমাদের কাছে খাবার-দাবার তেমন কিছু নেই।' সৌমিক বলল, 'যা আছে, তা অল্প করে খেতে হবে। আর এখানে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। আমরা এখন এগোব। কারও কিছু বলার আছে?'

'চল, আমরা ফিরে যাই, ওখানে অন্তত সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে,' আদ্রিতা বলল।

'ফেরা যাবে না,' সৌমিক বলল, 'রিস্ক যখন নিয়েই ফেলেছি, তখন আর পেছনে ফেরার মানে নেই। সামনে কী আছে দেখা যাক না!'

এরপর আর কথা চলে না। সবাই চলতে শুরু করেছে, তবে পায়ে না হেঁটে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হাঁটছে। ব্যাকপ্যাকগুলোকে অতিরিক্ত ভারী মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। টর্চের আলো ফেলছে চারদিকে। এখানে গুহার ভেতরটা একটু অন্যরকম। দেওয়ালগুলো ভেজা ভেজা, শ্যাওলামাখা, স্যাঁতসেঁতে। হাত দিয়ে দেখল আদ্রিতা, নরম আর শীতল একটা অনুভূতি হচ্ছে।

খুব দ্রুত এগোতে পারছে না ওরা। সবার সামনে আছে রবি আর কঙ্কা, মাঝখানে আদ্রিতা, পেছনে সৌমিক আর ফারহান। চারপাশে ওদের এগিয়ে চলার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

আদ্রিতার খারাপ লাগছে এখানে আসার পর থেকেই। মনে হচ্ছে ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। যখন কোনোকিছু নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করে তখন এরকম হয়। পরীক্ষার দিনগুলোতে এটা তার নিয়মিত সমস্যা। এজন্য ডাক্তারের কাছ থেকে স্নায়ু স্বাভাবিক করার ওষুধও খেতে হয়েছে। কিন্তু এখানে কোনো ওষুধ আনেনি। মনের মধ্যে যে শঙ্কা, ভয় ঘুরপাক খাচ্ছে, তার ভিত্তিটা খুব ভালো করে চেনে সে।

যে অজানা পথে চলেছে, এই গুহা থেকে বের হয়ে কখনো আলোর মুখ দেখবে কি না ওরা সন্দেহ আছে। যদিও এই শঙ্কাটা নিয়ে ওরা কেউ কোনো কথা বলছে না, হয়তো নিজেদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে চাচ্ছে না। কিন্তু যতই সময় গড়াচ্ছে ততই আতঙ্ক বুকের মধ্যে চেপে বসছে।

রবি এগোতে এগোতে মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে বাকিদের দেখছে। টর্চটা ওর হাতেই। টর্চের আলোয় সামনে পথ দেখা যাচ্ছে আরও সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হাঁটছে ওরা, কিন্তু সামনে হয়তো হামাগুড়ি দিতে হবে। আদ্রিতা জানে এখন আর পেছনে ফেরা সম্ভব নয়, ওরা কেউই ফিরতে চাইবে না। হয়তো এই সংকীর্ণ জায়গাটা পার হলেই এমন কোনো অংশে পৌঁছবে যেখানে গুহার বাইরে বেরোনোর পথ থাকবে।

কাজেই এই মুহূর্তে পেছনে ফেরার কথা বলে সেই সম্ভাবনাকে ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

পেছনে ফস করে শব্দে চমকে উঠল আদ্রিতা। ফারহান এই অবস্থার মধ্যেও সিগারেট ধরিয়েছে। বিরক্ত হলেও কিছু বলল না। হয়তো দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য এটাই ওর একমাত্র উপায়।

কঙ্কা পেছনে তাকাল। ওর সাথে চোখাচোখি হলো আদ্রিতার। যতটা নরম মনে হয়েছিল কঙ্কাকে, এখন মনে হচ্ছে ও পারবে। ওর চোখের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার, বেঁচে থাকার তাড়না দেখতে পেয়ে মনে মনে আশ্বস্ত হলো আদ্রিতা। ছেলেরা এমনিতে শারীরিকভাবে শক্তিশালী হলেও অনেকসময় তারাও বিপদের মুহূর্তে খেই হারিয়ে ফেলে। এইসময় ওদেরকে মানসিকভাবে সাহায্য করতে পারবে ওরা।

হঠাৎ থামল রবি। ওর দেখাদেখি বাকিরাও থামল। রবি কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে। সবাই কান পাতল। পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে মনে হলো। শব্দটা সামনে থেকে আসছে। পানি বয়ে যাওয়ার শব্দে আনন্দিত হবে কি না বুঝতে পারছে না আদ্রিতা। হয়তো এই পানি বয়ে যাওয়াকে লক্ষ করে এগোলেই গুহা থেকে বের হওয়ার পথ মিলবে।

শব্দটা আসছে সামনে থেকে। যেখানে পথ আরও অনেক সংকীর্ণ। এতটাই সংকীর্ণ যে ওরা কাঁধে যে ব্যাকপ্যাকগুলো ঝুলিয়ে রেখেছে, সেগুলো পার করাও কঠিন হয়ে যাবে।

রবি আবার এগোচ্ছে। ওর চোখে-মুখে দৃঢ় প্রত্যয় দেখতে পেল আদ্রিতা। এখানে গুহার ছাদ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে নিচের দিকে। হাঁটু গেড়ে বসা যাচ্ছে না। রবি শুয়ে পড়ে চার হাত-পায়ে এগোতে থাকল। ওর কাঁধের ব্যাকপ্যাকটা খুলে বুকের কাছে নিয়েছে। গুহার মেঝেটা মাটি আর পাথরের মিশ্রণ। কিছু কিছু জায়গায় ছোট ছোট পাথরের ধারালো কোণাগুলো শরীরের এখানে-সেখানে লেগে যাচ্ছে। আদ্রিতা টের পেল তার বাম হাতের কনুইয়ের একটা অংশ কেটে গেছে পাথরের কোণায় ঘষা খেয়ে। কিন্তু এখন কিছু করার নেই। এই অংশটা পার হয়ে যেতে পারলে ব্যান্ডেজ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ডান হাতের আঙুল দিয়ে জায়গাটায় স্পর্শ করে নরম জলজ একটা অনুভূতি পেল। রক্ত বেরিয়ে এসেছে নিশ্চিত।

রবি এখন যেখানে পৌঁছেছে সেখানে গুহার ছাদ এতটাই ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে পার হওয়া কঠিন। টর্চের আলো ফেলে ওপাশটা দেখছে

রবি। কিন্তু একটানা অনেকক্ষণ জ্বলার পর টর্চের আলোও বেশ শক্তি হারিয়েছে। মাঝে মাঝে জ্বলছে, মাঝে মাঝে জ্বলছে না। ফারহান তার ব্যাকপ্যাক থেকে বেশ কষ্টেসৃষ্টে আরেকটা টর্চ লাইট এগিয়ে দিল সৌমিকের দিকে। সেটা হাত ঘুরে রবির হাতে পৌঁছল।

আগের টর্চটা একপাশে রেখে নতুন টর্চটা জ্বালাল রবি। সামনের অল্প যে ফাঁকা অংশটা আছে সেখানে আলো ফেলল। রবি কী দেখতে পাচ্ছে টর্চের আলোতে তা পেছনের কেউ জানে না। তবে ধারণা করতে পারছে খুব সুখকর কিছু হবে না।

'কী দেখছিস এতক্ষণ ধরে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল সৌমিক।

'বুঝতে পারছি না দোস্ত।' রবি বলল, ওর কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট টের পেল আদ্রিতা।

'মানে কী? ফাজলামি করিস?' সৌমিক বিরক্তির সাথে বলল।

'আলো ফেলে গুহার তলা দেখতে পাচ্ছি না।' রবি বলল, 'মনে হচ্ছে এই জায়গাটা পার হলেই খাদ আছে একটা।'

'কী বলিস এইসব?' আতঙ্ক ঝরে পড়ল সৌমিকের কণ্ঠে।

কিছুক্ষণের জন্য হলেও দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করছিল আদ্রিতা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। রবির কথা শুনে তার আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে।

'কী করব আমরা তাহলে?' কঙ্কা আতঙ্কে চেঁচাল।

'ব্যাক টু দ্য পেভেলিয়ন,' রবি বলল।

'শালা আগেই বলছিলাম,' ফারহান বলল পেছন থেকে, ওর কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর যাবতীয় হতাশা ঝরে পড়ছে যেন। 'এখন পেছনে যাব কিভাবে? এভাবে পেছনে যাওয়া যায়?'

ওরা বেশ অনেকদূর এসেছে বুকে হেঁটে। এভাবে সামনে এগোনো যায় হয়তো, কিন্তু পেছনে যাওয়া কঠিন কাজ হবে। আদ্রিতা বুঝতে পারছে এভাবে পেছনে যাওয়ার অর্থ আবার শুরুতে ফিরে যাওয়া, হাল ছেড়ে দেওয়া এবং মৃত্যুকে বিনা বাধায় বরণ করে নেওয়া। কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলেও মনে হচ্ছে না।

'দোস্ত, কিছু করার নেই।' রবি বলল, 'সামনে খাদ আছে, ঐ খাদে পড়লে কী হবে কে জানে?'

'তুই ভালো করে দ্যাখ।' সৌমিক বলল, 'এখানে খাদ আসবে কোত্থেকে? এখানে কী পাহাড়ের মধ্যে পাহাড় আছে নাকি?'

এরমধ্যে হঠাৎ এক চিৎকারে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল আদ্রিতার। ফারহান চেঁচাচ্ছে। ওর চিৎকারের কারণ বোঝার জন্য ঘাড়

ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল আদ্রিতা। কিন্তু ফারহানের আতঙ্কিত মুখ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ফারহান এগিয়ে আসতে চাচ্ছে। ওর সামনে থাকা সৌমিক কিংবা আদ্রিতা কেউই বুঝতে পারছে না হঠাৎ এমন আতঙ্কিত হওয়ার কারণ কী?

'তুই এরকম করছিস কেন?' আদ্রিতা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

ফারহান কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। চাপাচাপি ঐ জায়গার মধ্যেই সে সৌমিকের উপর প্রায় চেপে বসেছে। ফরসা চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'দোস্ত,' চেঁচিয়ে বলল ফারহান, 'কেউ আমার পা ধরে টান দিয়েছে!'



আদ্রিতা তাকিয়ে আছে ফারহানের দিকে। ওর চোখে-মুখে আতঙ্ক। পেছনের দিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ফারহানের পেছনে কেউ নেই, কেউ ছিল না। কাজেই কেউ ওর পা ধরে টান দিয়েছে এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। আদ্রিতা বিশ্বাসও করেনি। কিন্তু একটা মানুষ হঠাৎ করে এরকম আতঙ্কিত হয়ে উঠবে কেন?

'দোস্ত, কেউ তো পা ধরে টান দেয়নি,' সৌমিক বলল, 'তুই দ্যাখ, তোর পেছনে কী কেউ আছে?'

ফারহান তাকাল না। ওর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে তাকালে সত্যি সত্যি কাউকে দেখতে পাবে। টর্চের আলোয় জায়গাটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুপাশে গুহার দেওয়াল জুড়ে অসংখ্য ছিদ্রের মতো। হঠাৎ একটা ব্যাপার আদ্রিতার মনে হলো, যদিও সে উচ্চারণ করতে চাচ্ছিল না কিন্তু মুখ ফসকে বলে ফেলল।

'আমার মনে হয় সাপ-টাপ হবে, ওর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে,' আদ্রিতা বলল।

অশরীরী কেউ পা ধরে টান দিয়েছে না সাপ পায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে, এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোনটা বেশি আতঙ্কের সেটা আদ্রিতা জানে। সে সাপকেই বেছে নেবে। এই প্রাণীটাকে সে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না, দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে।

তবে সাপের প্রসঙ্গ আসায় ফারহান যেন একটু আশ্বস্ত হলো। সে সৌমিকের পেছনে চলে গেল আবার।

রবি এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার সে টর্চের আলো ফেলল তার সামনের ফাঁকা অংশটায়। বেশ কাত করে টর্চের আলো ফেলার চেষ্টা করল। তাতে পরিষ্কার করে তেমন কিছু বোঝা গেল না।

'তুই কী এগোবি না ওখানেই থাকবি?' পেছন থেকে তাড়া দিল সৌমিক।

'কিন্তু পরিষ্কার করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না,' রবি বলল।

'সাহস করে এগো, তারপর দেখা যাবে,' সৌমিক বলল।

'হুঁ, রিস্কটা আমাকেই নিতে বলছিস, তাই তো?' রবি মুখ কুঁচকে বলল।

'লিডার হয়েছিস, রিস্ক নিবি না?' সৌমিক বলল।

রবি তাকাল পেছনে। কঙ্কা কোনো কথা বলছে না। ওর চোখ-মুখ অনুভূতিশূন্য। মাঝখানে থাকা আদ্রিতার মনে হচ্ছে এখানে আর বেশিক্ষণ এভাবে শুয়ে থাকলে তার হাত-পা অবশ হয়ে যাবে। পেছনে তাকিয়ে দেখল ফারহান বেশ ব্যাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, হয়তো সবার পেছনে থাকাটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। সাপ পায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে, ছোবলও দিতে পারত। এখানে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো বিষধর সাপ থাকে। আদ্রিতা ওর চোখ-মুখ দেখেই ওর মনের কথা সব বুঝতে পারছে।

রবি কিছু একটা ভাবছিল। তবে বেশিক্ষণ ভাবল না। বুকে চাপ দিয়ে একটু এগোলো। তাতেই মহাবিপর্যয় ঘটল যেন। ওরা যে জায়গাটার উপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল, সে জায়গাটার নিচটা ফাঁপা ধরনের। এতক্ষণ ওদের চাপ নিয়ে কোনোমতে টিকেছিল। রবি একটু এগোতেই পুরো মেঝেটা ধসে পড়ল। সেই সাথে ওরাও।

আদ্রিতা চিৎকারও করতে পারছিল না ঘটনার আকস্মিকতায়। গুহার ভেতর ভূমিধস! কী আশ্চর্য ব্যাপার।

কঙ্কা ওর পাশেই আছে। কাদামাটিতে পুরো শরীর মাখামাখি হয়ে গেছে। এখন যে জায়গাটায় ওরা পড়েছে, ভাগ্য ভালোই বলতে হবে সেটা খুব বেশি নিচে ছিল না। পাঁচ-ছয় ফুট হতে পারে, ধারণা করল আদ্রিতা। পড়ে গিয়ে সবাই কমবেশি ব্যথা পেয়েছে। ফারহান বেশ গোঙাচ্ছে। ও শারীরিকভাবে তেমন শক্তিশালী নয়, মানসিকভাবেও নয়, আদ্রিতা ভাবল।

সৌমিক টর্চ জ্বালিয়েছে। রবিও উঠে বসেছে। ওকে হতবিহ্বল দেখাচ্ছে। কাদামাটিতে মুখ মেখে গেছে।

আদ্রিতা টের পেল কনুইয়ের একপাশে বেশ কিছুটা জায়গা পাথরের খোঁচায় কেটে গেছে। রক্ত বের হচ্ছে। হাঁটুতেও ব্যথা পেয়েছে বেশ। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারবে কি না বুঝতে পারছে না।

সৌমিকের টর্চের আলোয় চারপাশটা দেখল। যে গুহাতে শুরুতে ওরা আটকে পড়েছিল, এই জায়গাটা তার চেয়ে অনেক বড়। তবে জায়গায় জায়গায় মাটির স্তূপ উঁচু হয়ে আছে। এছাড়া পুরো গুহার মেঝেতে পানি। সম্ভবত গতদিনের বৃষ্টির পানি পাহাড়ের গা বেয়ে নামার সময় কোনো গর্ত

দিয়ে ভেতরের এই গুহায় জমেছে।এক এক করে ওরা সবাই দাঁড়াল। একজন আরেকজনকে দাঁড় করাতে সাহায্য করছিল। কঙ্কার চোখে-মুখে তীব্র ব্যথার ছাপ লক্ষ করল আদ্রিতা। ওর হাত ধরল।

'তোর কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল আদ্রিতা।

'আমার পা ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে,' কঙ্কা বলল, ফোঁপাচ্ছিল, 'মনে হয় না আমি হাঁটতে পারবো।'

সৌমিককে ইশারায় ডেকে কঙ্কার পায়ের উপর টর্চের আলো ফেলা হলো। পা ভাঙেনি। ভাঙলে ঐ পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর প্রশ্নই আসে না।

'তোর পা ভাঙেনি,' সৌমিক বলল, 'তুই আমার কাঁধে হাত রেখে চল।'

'আমরা কোথায় যাব? কোনদিকে গেলে ভালো হবে?' জিজ্ঞেস করল আদ্রিতা।

'আমি জানি না,' সৌমিক বলল, 'টর্চের আলো ফেলে ফেলে যতটুকু যাওয়া যায়। এখন তো আর ঐ গুহায় ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই।'

হ্যাঁ, এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, আদ্রিতা ভাবল। এখান থেকে যে করেই হোক বের হতে হবে, না হলে শুঁকিয়ে মরতে হবে। এর বাইরে আর কোনোকিছুর সম্ভাবনা নেই।

'এখানে সাপ থাকতে পারে,' রবি বলল, 'অন্য কিছুও থাকতে পারে। কাজেই সাবধান।'

'অন্য কিছু মানে?' আদ্রিতা জিজ্ঞেস করল।

'এখানকার গন্ধ টের পেয়েছিস,' রবি বলল, 'কেমন পচা একটা গন্ধ। টের পেয়েছিস না পাসনি?'

গন্ধ পেয়েছে আদ্রিতা, কিন্তু গন্ধটা নিয়ে আলাদা করে ভাবার সময় পায়নি। প্রথমে মনে হয়েছিল গুহার মধ্যে গন্ধটা এমনই থাকে, কিন্তু রবি প্রশ্নটা করার পর আদ্রিতা টের পেল গন্ধটা সে এখনও পাচ্ছে। রাস্তায় কুকুর, বেড়াল পড়ে মরে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যেই এমন গন্ধ ছড়ায় যে ওটার আশপাশ দিয়ে আর যাওয়া যায় না। এই ক্ষেত্রেও হয়তো এমন কিছু হয়েছে, ভাবল আদ্রিতা। কিন্তু এখানে কোনো প্রাণী থাকার সম্ভাবনা শূন্যভাগ, যদি না সেই প্রাণীর ঢোকার এবং বের হবার রাস্তা থাকে। আর যদি কোনো প্রাণী ঢুকতে এবং বের হতে পারে, তার মানে ওরাও পারবে।

ওরা অল্প অল্প করে এগোচ্ছে। পানিতে পা পড়ে শব্দ হচ্ছে কেবল, এর বাইরে আর কোনো শব্দ নেই। কঙ্কা হাঁটছে সৌমিকের উপর ভর দিয়ে, ওর পেছনে আদ্রিতা, এরপর রবি আর ফারহান।

পুরো গুহার মধ্যেই কেমন ছমছমে একটা পরিবেশ। টর্চের আলো উঁচু হয়ে থাকা মাটির স্তূপগুলোতে পড়ে আলো-ছায়ার একটা বিভ্রান্তিকর পরিবেশ তৈরি করেছে। আদ্রিতার বেশ খিদে পেয়েছে। মাথা ব্যথা করছে সেই কখন থেকে। সম্ভবত খিদের কারণেই। কিন্তু এখন খাওয়ার সময় নয়। ওদের হাতে সময় ফুরিয়ে আসছে। এই গুহা থেকে বের হওয়ার পথ না থাকলে এখানেই পচে মরতে হবে।

রবির হাতের টর্চটা হঠাৎ নিভে গেল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল একসাথে। গুহার ভেতরটা নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেছে এক মুহূর্তেই। আদ্রিতার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে অদ্ভুত একটা শব্দ পেয়েছে। ডান পাশের মাটির স্তূপটার ঠিক পেছনে। মনে হলো দ্রুতগতিতে কিছু একটা যেন চলে গেল অন্য মাটির স্তূপটার ওপাশে। রবির হাতের টর্চের ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে এটা রবির কথা শুনেই বুঝতে পারল আদ্রিতা। তার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে আলোয় ফিরে আসতে না পারলে দারুণ একটা অঘটন ঘটে যাবে।

সৌমিক বেশ ঝামেলা করে ওর ব্যাকপ্যাক থেকে আরেকটা টর্চ বের করল। এটাই শেষ টর্চ। এর আলোটুকুতেই কাজ সারতে হবে। আদ্রিতার হাতে কোনোমতে টর্চটা বাড়িয়ে দিয়েছে সৌমিক। অন্ধকারে সেটা আন্দাজের উপরই হাতে নিল আদ্রিতা। রবির হাতে না দিয়ে নিজেই সুইচ চেপে জ্বালাল। নতুন টর্চ বলেই হয়তো আলোর তেজ বেশি।

টর্চের আলো নিয়ে এক পাক ঘুরল আদ্রিতা। আশপাশের সব জায়গায় টর্চের আলো ফেলেছে। কিন্তু কিছু চোখে পড়েনি। ওরা কি শব্দটা শোনেনি? ঐ শব্দটা আর কিছু একটা দ্রুতগতিতে চলে গেল মাটির স্তূপের আড়ালে, এসব কি শুধুই তার কল্পনা? হতে পারে। অন্ধকারই মানুষের আদি শত্রু। এই শত্রু নানা বেশে হাজির হয় আমাদের সামনে। কিন্তু এই শত্রুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা নেই, ভাবল আদ্রিতা।

টর্চটা হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছে নেই তার। রবি ঠিক পেছনেই আছে। ওদের পায়ের জুতো সব ভিজে ন্যাতনেতে। হাঁটতে গিয়ে থপথপ শব্দ হচ্ছে। ফারহান বেশ কিছুটা দূরে ছিল, রবির পেছনে ছায়ার মতো হাঁটছে। ওর মুখের উপর একবার টর্চের আলো ফেলতে ইচ্ছে করছে আদ্রিতার। পাঁচজনের দলে সবচেয়ে ভীতু ছেলে হচ্ছে ফারহান।

এর আগে বলেছিল কে নাকি ওর পা চেপে ধরেছে? আজব ব্যাপার। এখানে পা চেপে ধরতে আসবে কে? ভীতু কোথাকার?

এসব ভাবতে ভাবতে সাবধানে পা ফেলছিল আদ্রিতা। এইসময় আবার কেঁপে উঠল ফারহানের আর্তচিৎকারে।

সাথে সাথে টর্চটা পেছনের দিকে ফেরাল। রবির ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে ফারহান। ওর মুখের উপর টর্চের আলো পড়েছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে, এখনও চেঁচাচ্ছে একনাগাড়ে। ফারহানের ঠিক পেছনেই ছায়ামতো কিছু একটা চোখে পড়ল আদ্রিতার। হঠাৎই লক্ষ করল ফারহান সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেও পারছে না। কেউ যেন ওকে পেছন থেকে টেনে ধরে অন্ধকারে টেনে নিতে চাচ্ছে।

সবাই আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফারহানের দিকে। কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না কেউ! আদ্রিতা টর্চের আলো এদিক-সেদিক ফেলছে। ফারহান দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে রবির দিকে। সেই হাত দুটো শক্ত করে ধরে রেখেছে রবি।

আদ্রিতা দেখল ফারহান একটু একটু করে অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে, সেখানে একটার পর একটা উঁচু মাটির স্তূপ। সেই স্তূপগুলোর উপর বেশ কয়েকবার আলো ফেলল। কিন্তু কিছু দেখা গেল না।

রবি এখনও শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে ফারহানের হাত দুটো। সৌমিক এগিয়ে আসতে চেয়েও পারছে না, ভয়ে আর আতঙ্কে ওকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে কঙ্কা। ফারহানের ফরসা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আদ্রিতা। টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেছে, গলার রগগুলো ফুলে আছে। বোঝা যাচ্ছে শরীরের সব শক্তি দিয়ে নিজেকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারছে না ছেলেটা।

এই অবস্থায় আমার করণীয় কী? ভাবছিল আদ্রিতা। উত্তেজনা আর আতঙ্কের সময় তার বোধবুদ্ধি লোপ পায়। এখনও তাই হয়েছে। কিন্তু এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার মানে নেই। সে রবিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চাইল ফারহানের দিকে।

কিন্তু সেই সময়টুকু পেল না। দেখল চোখের সামনেই গুহার মেঝেতে হঠাৎ করেই মুখ থুবড়ে পড়ল ফারহান। তারপর পেছনের অন্ধকারের দিকে যেতে থাকল। মনে হলো পায়ে দড়ি বেঁধে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

ফারহানের চিৎকারে কান পাতা দায়। আদ্রিতা দৌড়ে এগিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু সাথে সাথে ওর হাত ধরে ফেলেছে রবি। কোনোমতেই ওকে আর এক পা'ও এগোতে দিল না। ওর সাথে ধস্তাধস্তি করেও লাভ হলো না।

ফারহানের দেহটা গুহার অমসৃণ মেঝেতে ঘষটে বড় একটা মাটির স্তূপের পেছনে চলে গেল।

কিছুক্ষণ সব একদম নীরব হয়ে গেল। ফারহানের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

রবি ওর হাত শক্ত করে ধরে আছে। সৌমিক আর কঙ্কাও দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। আদ্রিতা টর্চের আলোটা সেই মাটির স্তূপের দিকে ধরে আছে। হঠাৎ করেই পৃথিবী থেকে সব ধরনের নাড়াচাড়া যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

এরপর যে চিৎকারটা শোনা গেল, তার জন্য পৃথিবীর কেউই বোধহয় প্রস্তুত থাকে না। আতঙ্কে গায়ের সব লোম দাঁড়িয়ে গেল আদ্রিতার। শব্দটা আসছে মাটির স্তূপের পেছন থেকে। মনে হচ্ছে ফারহানের গায়ের চামড়া খুলে নিচ্ছে কেউ! জ্যান্ত অবস্থায়!

'দৌড়া,' রবি ফিসফিস করে বলল।

আদ্রিতা তবু স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'দৌড়া,' এবার চেঁচাল রবি। দৌড় শুরু করল।

সৌমিক কোনোমতে কঙ্কাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, রবি দৌড়াচ্ছে। সবার পেছনে দৌড়াচ্ছে আদ্রিতা। দৌড়াতে দৌড়াতে সে মাঝে মাঝে পেছনে টর্চের আলো ফেলছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কিছু একটা আছে। আসছে। তাকে ধরতে। তাদের ধরতে। জ্যান্ত অবস্থায় গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিতে!



বড় একটা মাটির স্তূপের পেছনে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। কঙ্কা মুখ চেপে ধরে আছে, নিজের আতঙ্ককে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। রবি আর সৌমিক দাঁড়িয়ে আছে দুপাশে। ওদের দুজনকেও দারুণ আতঙ্কিত দেখাচ্ছে। টর্চের আলো নিভিয়ে ফেলেছে আদ্রিতা।

গুহার ভেতর কোনো শব্দ নেই এখন। সব চুপচাপ হয়ে গেছে হঠাৎ করেই। তবে কাছাকাছি কোথাও পানি পড়ার টুপটাপ শব্দ হচ্ছে। ফারহানের শেষ চিৎকার এখনও কানে বাজছে। চোখ বুজে দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করল আদ্রিতা। কেঁপে উঠল নিজের অজান্তেই।

ফারহানের ঠিক কী হয়েছে বুঝতে পারছে না। গুহার ভেতর কী আছে? ভয়ংকর কোনো প্রাণী? নাকি অন্যকিছু? সৌমিকের হাত শক্ত করে ধরে আছে আদ্রিতা। এই মুহূর্তে সবাইকে কাছাকাছি থাকতে হবে, একসাথে থাকতে হবে। বিপদের স্বরূপ বুঝতে না পারলে প্রাণ বাঁচানোর লড়াই করবে কীভাবে?

গুহার ভেতরে গুমোট গরম। পরনের কাপড়চোপড় গায়ের সাথে আঠার মতো লেগে আছে যেন। ঘামে ভিজে গেছে পুরো শরীর। আতঙ্কে গলার ভেতর শুঁকিয়ে এসেছে। সৌমিকের কাছে ব্যাকপ্যাকে অল্প কিছু খাবার আর পানি ছিল। কঙ্কাকে সাথে নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে সেই ব্যাকপ্যাক কোথায় পড়েছে কে জানে! সেটা এখন আনতে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ওরা সবাই স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পরিবেশ থেকে সব ধরনের বিপদের সংকেত নিচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে শব্দ নেই, এমনকি টুপটাপ পানি পড়ার শব্দটাও থেমে গেছে। শব্দহীন, ভ্যাপসা অদ্ভুত এক পরিবেশে নিজেকে কোণঠাসা কোনো এক শিকারের মতো লাগছে আদ্রিতার কাছে। মনে হচ্ছে শিকারি তাকে দেখছে আর প্রস্তুতি নিচ্ছে আক্রমণের। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার ন্যূনতম শক্তি-সামর্থ্য তার নেই। ফারহানকে

যেভাবে অন্ধকারে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যেই চোখের আড়ালে চলে গেল ছেলেটা।

সময় এখানে যেন স্থির। কত দীর্ঘ সময় ধরে ওরা একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তার কোনো ধারণা নেই। আরও কতক্ষণ থাকতে হবে তাও বুঝতে পারছে না। বিপদ কখন আসবে, কোনদিক দিয়ে আসবে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। কিন্তু আদ্রিতার মনে হচ্ছে বিপদ আসবে। এই বিপদ থেকে কারও রক্ষা নেই।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সৌমিকের কাঁধে মাথা রাখল আদ্রিতা। এমনি সময়ে এরকম কিছু করার কথা চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু এখন সামান্য বিশ্রামেরও আলাদা মূল্য আছে। চোখ বুজে ভালো কিছু একটা ভাবতে চাইছিল, কিন্তু অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দে চোখ খুলল সে।

যেখান থেকে দৌড়ে এসেছিল, শব্দটা সেখান থেকে আসছে। গোঙানির শব্দটা এতটাই ভয়ংকর যে দুহাতে কান চেপে ধরল আদ্রিতা। ছলছল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কঙ্কা। এভাবে ওর তাকিয়ে থাকার মানে বুঝতে পারল না আদ্রিতা।

'চল,' চাপা গলায় বলল রবি, 'দেখে আসি।'

'কী দেখবি?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল সৌমিক।

'ওটা ফারহানের গলা, তুই চিনতে পারছিস না?' রবি বলল।

'তুই নিশ্চিত?' সৌমিক বলল।

'আমি নিশ্চিত না, কিন্তু আমি যাব,' রবি বলল।

'তুই যেতে পারবি না,' সৌমিক বলল, 'তুই এখান থেকে বের হলে আমরা বিপদে পড়ব। আমাদের লুকানোর জায়গা চিনে যাবে।'

'কে চিনে যাবে?' রবি জিজ্ঞেস করল।

'যে ফারহানকে মেরেছে,' সৌমিক বলল কোনোমতে, বলতে গিয়ে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে বলে মনে হলো আদ্রিতার কাছে।

'ফারহানকে কোনো মানুষই মেরেছে তা কীভাবে জানলি? বন্য কোনো প্রাণীও হতে পারে।'

'বন্যপ্রাণী? কী ধরনের বন্যপ্রাণী এভাবে মারতে পারে?'

'ভালুক হতে পারে।'

'তোর কী মাথা খারাপ, এখানে ভালুক আসবে কোত্থেকে?'

'কোত্থেকে আসবে জানি না,' রবি বলল, 'কিন্তু হতেও তো পারে।'

'এই তোরা তর্ক করা বন্ধ কর,' কঙ্কা বলল পাশ থেকে, 'রবির সাথে আমিও যাব। ফারহানকে হেল্প করা দরকার।'

'আমি যাচ্ছি না,' সৌমিক বলল, 'তোরাও যাবি না, ব্যস।'

'ব্যস মানে? তুই বললেই হলো,' কণ্ঠে রাগ ঝরে পড়ল রবির। আদ্রিতা কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে জানে রবির যাওয়া উচিত। ওটা যদি সত্যিই ফারহানের কণ্ঠস্বর হয়, তাহলে এখনও হয়তো বেঁচে আছে ছেলেটা। রবি গেলে হয়তো ও বেঁচে যাবে। কিন্তু অন্যদিকে ভয়ও হচ্ছে। ঐ কণ্ঠস্বর হয়তো ফারহানের নয়, কিংবা ফারহানের হলেও ওকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না। মাঝখান থেকে নিরাপদ একটা আশ্রয় হারাতে হবে। এরচেয়ে এখানে থাকা ভালো। এরকম স্বার্থপর একটা চিন্তা আসার পর নিজের উপরও খুব রাগ হচ্ছিল। বুঝতে পারছিল বেঁচে থাকার তাগিদই সবচেয়ে বড় জিনিস। বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব এসব অনেক পরের বিষয়।

গোঙানিটা এখনও শোনা যাচ্ছে। তবে অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের কাছাকাছি দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা হয়নি আদ্রিতার। এরকম একটা অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত নয় সে। কাজেই রবি, সৌমিক আর কঙ্কার কথোপকথনের মাঝে সে নীরব হয়ে রইল।

রবি বেরিয়ে যাচ্ছিল স্তূপটার পেছন থেকে। হাত ধরে ওকে থামানোর চেষ্টা করল সৌমিক, পারল না। এক হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল রবি।

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে আদ্রিতা। রবি এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। অন্ধকারে শুধু গোঙানির শব্দটাকে লক্ষ করে এগোচ্ছে। মেঝেতে জমে থাকা পানিতে পা পড়ে ছপছপ শব্দ হচ্ছে শুধু।

কঙ্কা এসে দাঁড়িয়েছে আদ্রিতার পাশে। শক্ত করে ওর হাত ধরেছে। বলা যায় ওরা তিনজন তিনজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সৌমিক উশখুশ করছে। আদ্রিতা বুঝতে পারছে এমনিতে স্বার্থপরের মতো পেছনে থেকে গেলেও রবির একা একা এগিয়ে যাওয়াটা মানতে পারছে না সৌমিক।

'আমিও যাচ্ছি, তোরা এখানেই থাক,' সৌমিক বলল।

ওদের হাত ছেড়ে দিয়ে রবির ঠিক পেছনেই এগিয়ে গেল সৌমিক।

ঘটনাস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছিল ওরা দৌড়ে। তাই জায়গামতো পৌঁছতে ওদের সময় লাগছে। সৌমিকের হাতে টর্চলাইটটা দিয়েছে আদ্রিতা। এখন এই অন্ধকারে চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো গতি নেই। কিংবা ওরা নিজেরা রবি আর সৌমিকের পিছু নিতে পারে। কঙ্কার দিকে তাকাল আদ্রিতা।

'যাবি?' জিজ্ঞেস করল আদ্রিতা।

'চল,' কঙ্কা বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সৌমিকের পেছনে চলে এলো ওরা দুজন। গুহার মধ্যে গা ছমছমে একটা পরিবেশ। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে অন্ধকারতম স্থানে চলে এসেছে ওরা। সামান্য আলোও যে কতটা সাহস দিতে পারে মানুষকে এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারছে আদ্রিতা।

গোঙানির শব্দটা বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা করে দিচ্ছে। ওটা কি সত্যিই ফারহান? নাকি অন্য কিছু? অন্য কিছু হলে সেটাই বা কী?

এসব নানা প্রশ্ন মাথায় নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকল ওরা। অপেক্ষা করে আছে যেকোনো অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

এরকম একটা দৃশ্য দেখার জন্য মানসিকভাবে কখনো প্রস্তুত ছিল না আদ্রিতা। এই দৃশ্যটা বেঁচে থাকতে কোনোদিন ভুলতে পারবেও না। নৃশংসতা ঠিক কোন পর্যায়ে যেতে পারে সেটা অনুভব করতে গিয়ে বারবার কেঁপে উঠছে। চোখে পানি চলে এসেছে, কোনোমতে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। পারছে না।

একটু দূরে উবু হয়ে বসে একগাদা বমি করে ফেলেছে কঙ্কা। এতে আরও অসুস্থবোধ করতে লাগল আদ্রিতা। চোখ বুজে কোনো এক অন্ধকূপে ঝাঁপ দিয়ে মরে যেতে পারলে ভালো লাগত, এরকম একটা অনুভূতি তাকে গ্রাস করে নিল।

সৌমিকের টর্চটা গুহার মেঝেতে পড়ে আছে। টর্চের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সৌমিক, ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে রবি। দুজনের কেউ কোনো কথা বলছে না। টর্চের তির্যক আলো পড়েছে সামনে, সেখানেই ওদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

একটা মানুষকে এভাবে আঘাত করা যায়, সেটা নিজের চোখে না দেখলে কল্পনা করা কঠিন। অথচ সেটাই দেখতে হচ্ছে। ফারহানের দেহটা টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে। চোখ দুটো এখনও খোলা। মুখটাও হাঁ করা, জিভটার অর্ধেকটা নেই। একটু আগে গোঙানির শব্দ করছিল, কিন্তু ওরা এখানে পৌঁছানোর আগেই সে শব্দ চিরতরে থেমে গেছে।

থকথকে রক্তের ছোটখাটো একটা ফোয়ারা ছুটেছে যেন চারপাশে। টর্চের আলোয় রক্তাক্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ফারহানের দেহটা দেখা যাচ্ছে। ওর ডান হাতটা নেই, কাঁধের কাছ থেকেই নেই। সাদা হাড় আর জমাট রক্ত সেখানে। বাঁ হাত আছে, কিন্তু সেটাও মাঝবরাবর ভেঙে হাড় বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পা দুটো হাঁটুর নিচ থেকে যেন ধারালো কিছু দিয়ে মিহি করে কেটে নিয়েছে কেউ। পরনের টি-শার্টটা শতচ্ছিন্ন।

ফারহান, ওকে নিয়ে কিছুক্ষণ আগেও বিরক্ত ছিল আদ্রিতা। সবসময় সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা-ফাজলামি করা ছেলেটার এরকম পরিণতি কল্পনাও করা যায় না। বান্দরবানের এই ট্যুরের আয়োজন করেছিল এই ছেলেটাই, এখন হয়তো তার মাশুল দিচ্ছে এভাবে প্রাণ হারিয়ে।

আদ্রিতার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এখনও জানে না ঠিক কীসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। হয়তো এরচেয়ে নিদারুণ কোনো মৃত্যু অপেক্ষা করছে তাদের সামনে।

হাত ধরে কঙ্কাকে দাঁড় করাল আদ্রিতা। মেঝে থেকে টর্চ লাইটটা তুলে নিল।

মাথার ভেতর একটা কোথাও ঘুরপাক খাচ্ছিল, মানুষ কী এভাবে মানুষ মারতে পারে! এটা কোনো ধরনের বন্যপ্রাণীর কাজ? নাকি এর পেছনে অন্য কিছু আছে? অতিপ্রাকৃত কিছু?

বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে রবির দিকে ঘুরল আদ্রিতা। সৌমিকের মুখের উপর টর্চের আলো ফেলল।

সৌমিক কাঁদছে। তবে সেই কান্নায় কোনো শব্দ নেই। ফারহানের সাথে ওরই সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক ছিল। রবির চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা, অস্থিরতার ছাপ।

আদ্রিতা মেঝে থেকে টর্চটা তুলে চারদিকে আলো ফেলল। এই জায়গাটা নিরাপদ নয়। যেকোনো সময় আক্রমণ হতে পারে। কঙ্কা এসে দাঁড়িয়েছে আদ্রিতার পাশে। দুজনে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

‘চল,’ আদ্রিতা বলল। ‘এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না।’

‘ওর একটা ব্যবস্থা না করে কীভাবে যাই?’ সৌমিক বলল, ‘কাছের বন্ধু হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে।’

‘কী করতে চাচ্ছিস?’ জিজ্ঞেস করল কঙ্কা।

‘ওকে কবর দেওয়া দরকার।’ সৌমিক বলল, ‘এভাবে ওর মৃতদেহ ফেলে যেতে মন চাইছে না।’

আদ্রিতা সৌমিকের সাথে একমত। কিন্তু কবর খুঁড়বে কী দিয়ে। ওদের কাছে খোঁড়াখুঁড়ি করার মতো কিছুই নেই। একটা কবর খুঁড়তে কত সময় লাগে? এছাড়া এখন কবর খুঁড়তে যাওয়ার সময় আছে বলেও মনে হচ্ছে না।

‘দোস্ত,’ রবি বলল, ‘এখন এসবের সময় নেই। আমিও যদি মরে যাই, আমাকে ফেলে চলে যাস। কিছু মনে করব না। ঠিক আছে?’

ওর কথার প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না সৌমিক। মাঝখানে আদ্রিতা আর কঙ্কাকে রেখে ওর হাঁটতে শুরু করল সেই বড় মাটির স্তূপটার

দিকে। অস্থির হয়ে এদিক-সেদিক টর্চের আলো ফেলছে আদ্রিতা। গুহার মেঝেতে সৌমিকের ব্যাকপ্যাকটা থাকার কথা। কিন্তু সেটা কোথাও চোখে পড়ছে না।

একটু আগেও ওদের কথাবার্তা আর হাঁটাচলা ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না গুহার মধ্যে। এখন আবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে কেউ আছে আশপাশে। তাদের সবাইকে দেখছে, তীক্ষ্ণ নজরে। যেকোনো সময় আক্রমণ চালাবে।

ফারহান যেভাবে মরেছে সেভাবে মরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই আদ্রিতার। খিদে পেটে মাথা বনবন করছে। কিন্তু এই বিপদে মাথা স্থির রাখতে হবে।

রবি জোর পায়ে হাঁটছে। বোঝা যাচ্ছে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, আশপাশের শব্দগুলো ওর কানেও আসছে।

হাঁটতে হাঁটতে সেই বড় মাটির স্তূপটার কাছে চলে এলো ওরা। কেন জানি এই জায়গাটাকেই নিরাপদ মনে হচ্ছে।

স্তূপের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল আদ্রিতা আর কঙ্কা। দুপাশে রবি আর সৌমিক বেশ সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গুহার অন্ধকারের দিকে। বোঝা যাচ্ছে ওরা দুজনেই যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ আশা করছে।

কঙ্কা পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কিছু পড়ছে আর বুকে ফুঁ দিচ্ছে। আদ্রিতা টর্চের আলো ফেলতে লাগল এখানে-সেখানে।

চারপাশে ছোটখাটো আরও অসংখ্য মাটির স্তূপ। এগুলো কি প্রাকৃতিকভাবেই হয়েছে গুহার ভেতর? না কেউ তৈরি করেছে? তৈরি করার কারণ কী? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মাথায়।

কিছুক্ষণের জন্য অসতর্ক হয়ে গিয়েছিল হয়তো, না হলে টর্চের আলোয় হঠাৎ এটা কী দেখা গেল বুঝতে পারল না আদ্রিতা। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল যেন। তবে এতটুকু সময়ের মধ্যেই মানুষের অবয়ব চোখে পড়েছে। শীর্ণ একটা অবয়ব। কামানো মাথা। লম্বাটে ধরনের একটা মুখ। সেই মুখে লাল রক্তের ছাপ স্পষ্ট। হাত দুটো শরীরের তুলনায় লম্বা। ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই, নিম্নাঙ্গে কাপড়ের ছোট টুকরো দিয়ে ঢাকা।

এটা কি মানুষ? নাকি অন্যকিছু? গুহার এই অন্ধকারে এরকম একটা মানুষের কাজ কী?

রবির দিকে তাকাল আদ্রিতা। রবি অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, তাই দেখেনি। ওকে কিছু বলবে কি না বুঝতে পারছিল না। হয়তো উড়িয়ে

দেবে। বলবে অন্ধকারে চোখে ভুল দেখেছে। এখানে এরকম ধরনের মানুষ আসবে কোত্থেকে? ফারহানের মৃত্যুর পেছনে যে এই অদ্ভুত গড়নের মানুষটা দায়ী হতে পারে সেটা হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে।

তবে সৌমিকও কিছু একটা দেখেছে। সেটা ওর আতঙ্কিত চাপা কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার বুঝতে পারছে আদ্রিতা।

'রবি, আমার মনে হয় আমরা খুব খারাপ কিছুর পাল্লায় পড়েছি,' সৌমিক বলল, ঢোক গিলল। ওর ঘামে ভেজা চোখ-মুখ আরও শুকিয়ে গেছে বলে মনে হলো আদ্রিতার কাছে।

'খুলে বল,' রবি বলল।

'দোস্ত, এখানে খুব খারাপ কিছু আছে,' আবার বলল সৌমিক, বলার সময় ওর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

'দ্যাখ, ফাজলামি করিস না,' রবি বলল, 'কী দেখছিস সেটা বল।'

'ঐটা কোনোদিন মানুষ না, মানুষ এমন হতে পারে না,' সৌমিক বলল।

আদ্রিতা বুঝতে পারল সে আর সৌমিক একই জিনিস দেখেছে। তবে সৌমিকের বর্ণনা শোনার জন্য চুপ করে রইল।

'মানুষ না মানে? আমি তো কিছুই দেখিনি, তুই দেখছিস?' আদ্রিতাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল রবি। উত্তর দিল না আদ্রিতা।

'আমরা বাঁচব না,' সৌমিক বলল, 'সবগুলাকে খেয়ে ফেলবে ঐ জিনিসটা।'

'খেয়ে ফেলবে মানে?' রবি প্রশ্ন করল।

টর্চের আলোয় রবির মুখটা ঝাপসা দেখতে পাচ্ছে আদ্রিতা। প্রশ্ন করার সময় রবিও যে সামান্য কেঁপে উঠেছে সেটা তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

'ফারহানের অবস্থা দেখোস নাই? এরচেয়েও খারাপ পরিণতি আছে আমাদের জন্য,' চাপা গলায় বলল সৌমিক।

'আমি এমনে এমনে মরুম না,' রবি বলল।

'ভূত-প্রেতের সাথে তুই লড়াই করবি, রাক্ষসের সাথে লড়াই করবি! হ্যাঁ?' চেঁচিয়ে বলল সৌমিক। ওর কণ্ঠস্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না কোনোমতেই। একপাশ থেকে কঙ্কা এসে ওকে আঁকড়ে ধরল, তবে তাতে লাভ হলো না। সৌমিক মেঝেতে বসে পড়ল। বিড়বিড় করে অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলে যাচ্ছে যার একটা বর্ণও বোধগম্য হচ্ছে না কারও কাছে।

'অ্যাই, তোরা কি ভয় পাচ্ছিস?' রবি বলল, 'আমি কিন্তু পাচ্ছি না।'

রবি হয়তো ওদেরকে সাহস দেওয়ার পাশাপাশি নিজেকেও সাহস দেওয়ার চেষ্টা করছে, ধারণা করল আদ্রিতা। সৌমিকের মতো হাল ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতি নয় সে, ভূত-প্রেত, রাক্ষস যা-ই হোক না কেন, সহজেই মরতে রাজি নয়।

টর্চটা কঙ্কার হাতে দিয়ে সৌমিককে হাতে ধরে দাঁড় করাল আদ্রিতা। ছেলেটা কাঁপছে। প্রাণ হারানোর ভয় সবচেয়ে বড় ভয়। এই ভয়ের মুখোমুখি হলে মানুষ এমন সব কাপুরুষতা করতে পারে কিংবা সাহসিকতা দেখাতে পারে যা সে নিজেই জানত না। সৌমিক হয়তো এই মুহূর্তে ভয়ে কাবু হয়ে আছে, যে ভয়টা এখনও বাকিদের স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু ভয় অতি সংক্রামক বিষয়, যেকোনো সময় ওরাই এই ভয়ে আক্রান্ত হতে পারে। সাহস নিয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে ভয় নিয়ে বেঁচে থাকা হয়তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ, কিন্তু মানুষ কী সবসময় বুদ্ধিমত্তা দেখাতে পারে?

রবি এখনও ভয় পায়নি, কঙ্কাও না। আদ্রিতা ভয়ের স্বরূপ কিছুটা হলেও দেখেছে, তবু নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছে এখন পর্যন্ত। না হলে বাকি দুজনও হয়তো এতক্ষণে সৌমিকের দলে যোগ দিত। একসাথে লড়াই করলে হয়তো প্রাণে বাঁচার একটা সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এভাবে ভয় পেয়ে গেলে সেই সম্ভাবনাও ভেসে যায় খড়কুটোর মতো।

টর্চের আলো এখনও চারদিকে ফেলছে আদ্রিতা। সৌমিক কথা বলছিল না, তবে মাঝে মাঝে ভয়ে কেঁপে উঠছিল। কঙ্কা পায়ে ব্যথা পেয়েছিল, কিন্তু সেই ব্যথা ভুলে এখন সৌমিককে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রবি হঠাৎ করেই ওর মুখের উপর আঙুল দিয়ে সবাইকে একদম নীরব থাকার জন্য ইশারা করল। ও কিছু একটা শুনতে পেয়েছে। আদ্রিতাও কান পাতল। শব্দটা সে পেয়েছে। বীভৎস একটা শব্দ। শব্দটা কীসের সেটা বুঝতে পারার সাথে সাথে গায়ের সবগুলো লোম সরসর করে দাঁড়িয়ে গেছে।

মনে হচ্ছে কতগুলো পশু মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে মৃতদেহ থেকে, উল্লাস করছে। মাংস ছেড়ার শব্দ, রক্তের ছিটকে পড়ার শব্দগুলো গুহার নীরবতার মাঝে খুব বেশি করে কানে বাজছে। ফারহানের মুখটা মনে পড়তে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল আদ্রিতার। এরকম একটা মৃত্যু ওর প্রাপ্য ছিল না।

সৌমিকের কথামতো ফারহানের মৃতদেহের সৎকারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এটা এখন পরিষ্কার যে সেই সুযোগ আসলে ছিল না।

রবির ইশারায় টর্চের আলো নিভিয়ে ফেলেছে আদ্রিতা। ওরা চারজন এখন গাদাগাদি করে পরস্পরের গায়ের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। এর

আগে কোনোদিন কোনো ছেলেমানুষের এত কাছে দাঁড়ায়নি, তবু অস্বস্তি হচ্ছে না। প্রাণভয়ে ভীত শিকারের পালের কাছে প্রাণ বাঁচানোই বড় কথা।

শব্দটা যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবেই থেমে গেল। গুহায় আবার নীরবতা নেমে এলো। তবে সেই নীরবতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

বিকৃত, অদ্ভুত, তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হঠাৎ করেই গুহার নীরবতাকে ভেঙে দিল। মানুষের কণ্ঠ থেকে এরকম অদ্ভুত, তীক্ষ্ণ বাজে শব্দ বের হতে পারে না, মনে মনে বলল আদ্রিতা। দুই কানে হাত দিল। শব্দের তীব্রতা আর তীক্ষ্ণতা এত মারাত্মক যে সেটা গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকল।

পাশ থেকে হঠাৎ করেই কেউ একজন দৌড় দিল। প্রথমে হকচকিয়ে গেল আদ্রিতা। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল কঙ্কা দৌড় দিয়েছে। অন্ধকারে ঠিক কেন, কীসের উদ্দেশ্যে দৌড় দিয়েছে সেটা বুঝতে পারল না। আতঙ্ক আসলে এতটাই আক্রান্ত করে ফেলেছে যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা, ভাবল আদ্রিতা।

কঙ্কার পেছন পেছন রবিও দৌড়াচ্ছে। সম্ভবত ওকে এখানে ফিরিয়ে আনতেই। সৌমিক আদ্রিতার হাত ধরে থাকল, যেন কঙ্কার মতো সেও হঠাৎ দৌড়ে না পালায়।

দুজনের দৌড়ের শব্দ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। যেন গুহার ভেতর কঙ্কা আর রবি বলে কেউ ছিলই না এরকম একটা অনুভূতি আঁকড়ে ধরল আদ্রিতাকে। এই মুহূর্তে পুরো পৃথিবীতে দুজন মানুষ জীবিত আছে। আদ্রিতা নিজে আর সৌমিক।

একটানা কতক্ষণ চুপচাপ দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে জানে না। দুজনের কেউ কোনো কথা বলছে না। সৌমিক কী ভাবছে কোনো ধারণা নেই আদ্রিতার। সে শুধু এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে চায়। আর কিছু না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যদি বেঁচে ফিরতে পারে, তাহলে বাঁচার মতো বাঁচবে। যেসব ভুল করেছে, সেইসব ভুলের পুনরাবৃত্তি আর হবে না।

হঠাৎ করেই আবার একটা শব্দ কানে এলো। গুহার ভেতর জমে থাকা পানির উপর দিয়ে কেউ ধীর পায়ে হাঁটছে। সাবধানী সেই হাঁটার ধরন! রবি! না কঙ্কা! নাকি দুজনেই!

আদ্রিতা দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ দুজনের কেউ নাও হতে পারে। হতে পারে অন্য কেউ! অন্য কিছু!



কঙ্কা একা দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালের ভাজের খাঁজে কোনোমতে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে। হঠাৎ করে কী হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। দৌড় দিয়েছিল। ঠিক কোনদিকে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল শরীরের উপর তার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ভয় এমনভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, শ্বাস নিতেও ভয় হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে যেকোনো সময় যেকোনো জায়গা থেকে আক্রমণ আসবে। নিজের শারীরিক শক্তির উপর কোনো ভরসা নেই। এছাড়া ফারহানের অবস্থা নিজ চোখে দেখেছে। কোনো অশুভ শক্তি যেন ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছিল ছেলেটাকে। সেখানে সে তো সামান্য মেয়েমানুষ!

কঙ্কার নিজেকে সামান্য মেয়েমানুষ ভাবতে ভালো লাগে না। অথচ জীবনের কঠিন সময়গুলোতেই সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। যদিও কোনো না কোনোভাবে সেইসব জটিল আর কঠিন পরিস্থিতিগুলো পার হয়ে এসেছে। কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই এরকম জীবন-মরণ সমস্যা ছিল না। এক্ষেত্রে আদ্রিতাকে মনে মনে প্রশংসা করে। দেখতে নরম-সরম হলেও মানসিকভাবে আদ্রিতা যথেষ্ট শক্তিশালী। এই বিপদের মধ্যেও মুহূর্তের জন্যও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি। রবি আর সৌমিকের চেয়েও ওর সাথে থাকাটাই নিরাপদ হতো বেশি। অথচ, কী থেকে কী হয়ে গেল! ওদেরকে একা ফেলে রেখে সে নিজেই পালাল। এই পালানোটা অনেকক্ষেত্রে তার স্বার্থপর মানসিকতার ইঙ্গিত দেয়। এটা কঙ্কা জানে। বিপদে-আপদে নিজের স্বার্থটাকেই সবসময় বড় করে দেখে এসেছে। এতদিনে এজন্যই হয়তো টিকে আছে এবং আজকে এই স্বার্থপরতার কারণেই হয়তো তাকে মরতে হবে।

মৃত্যুর কথা মনে আসতেই কেমন হাহাকার লাগে কঙ্কার। ইচ্ছে ছিল এখানকার পড়াশোনাটা শেষ করে বাকি ডিগ্রিটা কানাডা কিংবা আমেরিকার

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। ছাত্রী হিসেবে সে যথেষ্ট ভালো। অন্তত বাকি বন্ধুদের তুলনায় তো অবশ্যই।

বিদেশে একটা আলাদা জীবন হতো। নতুন বন্ধু-বান্ধব হতো। আমেরিকা, কানাডায় ঘুরে বেড়ানোর মতো জায়গাও আছে অনেক। ছুটির দিনগুলোতে সেসব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো যেত। অথচ বান্দরবানের এক পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়ে সেসব স্বপ্নই এখন ধূলিসাৎ হওয়ার জোগাড়।

এসব ভাবতে ভাবতেও কঙ্কার সমস্ত ইন্দ্রিয় একদম সজাগ। ধীরলয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন সেই নিঃশ্বাসের শব্দ নিজেকেও শুনতে না হয়। এখানে ঠিক কোথায় বিপদ ঘাপটি মেরে আছে কেউ জানে না।

আদ্রিতারা কী আগের জায়গাতেই আছে, নাকি এরমধ্যে জায়গা বদল করেছে? চাইলেও অবশ্য সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। দৌড়ে ঠিক কতদূর এসেছে কোনো ধারণা নেই কঙ্কার।

ফারহানের মৃতদেহটা এখনও চোখে ভাসছে। এমন কোনো প্রাণী আছে যা ছেলেটার এই অবস্থা করেছে? নাকি সেটা অন্য কিছু? নাকি মং সেনের সেই গল্পটা সত্যি! সেই যুবক সত্যিই এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে! গুহার ভেতর কেউ ঢুকলে তাকে খুন করে রক্ত আর মাংস খায়। যেমনটা ফারহানের সাথে ঘটেছে।

এসব ভাবতেই গা শিউরে উঠছে কঙ্কার। একা একা থাকার প্রতিটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছিল দীর্ঘ নরকবাসের মতো। কেন ওদের ছেড়ে দৌড় দিল? কোনো প্রয়োজন ছিল না।

কান খাড়া করে আছে কঙ্কা। পুরো গুহায় শুনশান নীরবতা। সেই নীরবতা ভাঙল হঠাৎ করেই। খুব কাছেই একটা পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়ল কোথাও। মনে হলো কেউ যেন হেঁটে আসছে।

বুকটা ধকধক করছে। দম আটকে ডানদিকে তাকিয়ে আছে কঙ্কা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না ঘনঘোর অন্ধকারে।

এখন শব্দটা পাওয়া যাচ্ছে বেশ পরিষ্কারভাবে। সত্যিই কেউ আসছে। তবে সেটা শত্রু না বন্ধু বোঝার কোনো উপায় নেই। কোনোমতে কিছুটা উবু হলো কঙ্কা। পায়ের নিচে শুকনো মাটি আর পাথরের মিশ্রণে তৈরি মেঝে। বেশ কিছুক্ষণ হাতড়ে মোটামুটি আকারের একটা পাথরের টুকরো তুলে আনল।

পাথরের টুকরোটা হাতে আসার পর কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। শক্ত করে টুকরোটা ধরে রেখেছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত।

তবে শব্দটা আসছিল ডানদিক থেকে। এখন মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে পেছন দিক থেকে। ঘুরে তাকানোর সাহস হচ্ছিল না কঙ্কার। মনে হচ্ছিল তাকালেই এমন কিছু দেখতে পাবে যা সে সহ্য করতে পারবে না।

শব্দটা আরও এগিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে যেকোনো সময় কঙ্কাকে ধরে ফেলবে কেউ, ছুঁয়ে ফেলবে কেউ। ঠিক ফারহানের পরিণতি হবে। আর যাই হোক, অন্তত ফারহানের মতো বিনা বাধায় কেউ তাকে মারতে পারবে না। শিকারি আঘাত করার আগেই শিকার পালটা আঘাত হানবে।

শব্দটা এখন একদম কাছাকাছি। সময় নেই। যেকোনো সময় আঘাত আসবে। কিন্তু তার আগেই দ্রুতগতিতে ঘুরে দাঁড়াল কঙ্কা, চোখ বুজল। সপাটে হাত চালাল অন্ধকারে, পাথরের টুকরোটি দিয়ে। সেটা যে জায়গামতো লেগেছে বুঝতে অসুবিধা হলো না। চাপা একটা শব্দ হলো। তারপর গুহার মেঝেতে ধপ করে পড়ে গেল কিছু একটা।

চোখ খুলল কঙ্কা।

রবি হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আচমকা এমন আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। মাথার বাপাশে লেগেছে পাথরের টুকরোর একটা অংশ। সে জায়গাটা কেটে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে দরদর করে। দুহাত দিয়ে চেপে রেখেছে জায়গাটা। কিন্তু রক্ত পড়া থেমেছে বলে মনে হচ্ছে না।

তার সামনে স্থির দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কা। ওর হাতে এখনও পাথরের টুকরোটা দেখা যাচ্ছে।

যন্ত্রণা হলেও কোনো শব্দ করছে না রবি। কঙ্কাকে দোষও দিচ্ছে না। বেচারি না জেনে, না দেখেই আঘাত করে বসেছে। আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকলে এমন হয়। আর আতঙ্কিত হওয়ার মতো ঘটনা তো সত্যি সত্যিই ঘটেছে। ফারহানের মৃতদেহ ওরা সবাই দেখেছে। জানে যেকোনো মুহূর্তে ওদের যে কারও তেমন পরিণতি হতে পারে।

কোনোমতে উঠে দাঁড়াল রবি। কঙ্কা এসে ওর হাত ধরল। কাঁদছে।

'চুপ করে থাক, কথা বলিস না,' রবি বলল চাপা গলায়।

'খুব ব্যথা পেয়েছিস?' কোনোমতে জিজ্ঞেস করল কঙ্কা।

'ব্যথা পেয়েছি, তোর হাতে এত শক্তি এটা তো জানা ছিল না,' বলে হাসার চেষ্টা করল রবি। হাসতে গিয়ে টের পেল মাথার ভেতরটা দপদপ করছে যন্ত্রণায়।

কঙ্কা ওর হাত ধরে বড় একটা মাটির স্তূপের আড়ালে নিয়ে গেল। সেখানে হেলান দিয়ে বসল রবি। অন্ধকার হলেও নিজেদের অবয়ব বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

'ওরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কঙ্কা।

'আমি তো তোর পেছনে দৌড়ে এলাম, ওদের সেখানেই রেখে এসেছি,' রবি বলল।

'আমরা ওদের কাছে যাই চল,' কঙ্কা বলল।

'মনে হয় না সেটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' রবি বলল, 'ওরা দুজন নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারবে। আর আমাদেরটা আমাদের দেখতে হবে।'

কঙ্কা কিছু বলল না উত্তরে। আসলে সময় আর পরিস্থিতি অনুযায়ী মাঝে মাঝে স্বার্থপরের মতো সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রবির এই সিদ্ধান্তও নিজেদের ভালোর জন্য। আদ্রিতা আর সৌমিক, দুজনেই বেশ বুদ্ধিমান মানুষ, সাহসীও। কাজেই ওদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

রবি হেলান দিয়ে বসে আছে। ওর পাশে হেলান দিয়ে বসল কঙ্কা। এই ছেলেটার প্রতি তার আলাদা একটা টান আছে। মনে হয় সেই টান রবিরও আছে তার প্রতি। না হলে সে দৌড় দেওয়ার সাথে সাথে ওর পিছু নেওয়ার কথা নয়। সৌমিক আর আদ্রিতা তো পেছনে পেছনে আসেনি। রবি এসেছে।

অন্ধকারে আন্দাজের উপর রবির মুখে হাত বুলিয়ে দিল কঙ্কা। অন্য সময় হলে খুব বিরক্ত হতো রবি। এখন কিছু বলল না। হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে অনুভব করল মাথার একপাশটা ভেজা ভেজা, জমাট বাঁধা রক্তে। পরনের টি-শার্টের নিচের একটা অংশ টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল কঙ্কা। তারপর সেটা বেঁধে দিল রবির মাথায়। এতে রক্ত পড়া থামবে কি না জানে না। তাদের কারও কাছে এই মুহূর্তে কোনো ধরনের ওষুধপত্র নেই। সাথে করে কিছু সাধারণ ওষুধপত্র নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সব আছে ক্যাম্পে।

চারপাশে এখন আর কোনো শব্দ নেই। কঙ্কার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছে খিদেয়। কিন্তু এর বাইরে পরিবেশটা কেন জানি ভালো লাগছে তার। অন্ধকারে বিপদ গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে, যেকোনো সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। তবু রবির সাথে একান্ত নিজের মতো কিছু সময় কাটানো যাচ্ছে। মৃত্যুর আগে এটাই বোধহয় শেষ প্রাপ্তি হতে যাচ্ছে।

বন্ধুদের মধ্যে ভালোবাসা মানেই বন্ধুত্বের সমাপ্তি, মাঝে মাঝে সেই সমাপ্তিটাও হয় খুব বেদনাদায়ক। কাজেই শুরু থেকেই ভালোবাসা আর প্রেম শব্দ দুটোকে আলাদা রেখেছিল ওরা সবাই। কিন্তু মানুষের মন তো। এরমধ্যে কবে, কখন রবির প্রতি আলাদা করে দুর্বলবোধ করতে শুরু করেছে কঙ্কা, সেটা নিজেও মনে করতে পারে না। এমনকি সেটার কোনো

ইঙ্গিত সে কখনো রবিকে দেয়নি। বাকিদের তো নয়ই। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আদ্রিতা ঘুণাক্ষরেও জানে না ওর দুর্বলতার কথা। জানলে কি খুশি হবে? না বিরক্ত হবে? নাকি হিংসা করবে? অদ্ভুত এসব চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেত সবসময়। নিজের অনুভূতি লুকিয়ে রাখার আলাদা ক্ষমতা নিয়ে মেয়েরা জন্মায়। কাজেই রবির প্রতি তার অনুভূতি কেউ কখনো টের পায়নি, এমনকি রবিও না।

রবির হাত ধরে বসে রইল কঙ্কা। বিপদ যদি কোনোদিন কাটে, তখন সে রবিকে মনের কথা বলবে। বন্ধুত্ব থাকুক কি না থাকুক, এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল। বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বুকটা হঠাৎ করেই হালকা হয়ে গেছে যেন।

চোখ বুজে রবির কাঁধে মাথা দিয়ে শুয়ে রইল কঙ্কা। টের পেল না তার ঠিক কাছাকাছিই ঘুরপাক খাচ্ছে মৃত্যুদূত।



পায়ের শব্দটা কাছে এসেই মিলিয়ে গেল আবার। আদ্রিতা নিঃশ্বাস চেপে রেখেছিল। দীর্ঘক্ষণ পর নিঃশ্বাস ছাড়ল।

পাশে দাঁড়ানো সৌমিকের হাতে টর্চলাইট। সেটা নেভানো এই মুহূর্তে। ওর হাত থেকে টর্চলাইটটা নিজের হাতে নিল আদ্রিতা। জ্বালাবে কি না বুঝতে পারছিল না। অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে আলো জ্বালিয়ে শত্রুপক্ষকে আমন্ত্রণ জানানোর কোনো মানে নেই।

ঠিক এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, বিপদ কেটে গেছে কি না সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। সৌমিক কোনো কথা বলছে না। ওকে হালকা একটা ছায়ার মতো দেখছে আদ্রিতা। মনে হচ্ছে সৌমিক বলে কেউ নেই। শুধু আছে একটা ছায়া। এরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবু মনে হচ্ছে।

সৌমিক হঠাৎ খুব কাছে এসে দাঁড়াল। ওর গা থেকে বাজে একটা গন্ধ আসছে। গন্ধটা কীসের ধরতে পারল না আদ্রিতা, এতে তার অস্বস্তি আরও বাড়ল।

'আদ্রিতা, তোর কী মনে হয়, আমরা এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারব?' সৌমিক বলল, কাঁপা গলায়।

'অবশ্যই পারব,' দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলল আদ্রিতা।

'ফারহানের যে অবস্থা দেখলাম, তাতে কোনো ভরসা পাচ্ছি না।' সৌমিক বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে ছিল, অন্তত আশিটা বছর বাঁচব। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব। তোর ভাবি কে হবে সেটাও ঠিক করে রেখেছিলাম।'

'তাই? কাকে ঠিক করেছিলি?'

'তুই চিনবি না।' সৌমিক বলল, 'আমরা একই স্কুলে পড়তাম। ও এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।'

'নাম কী?'

'অজন্তা সাহা, সুন্দর নাম না?'

'হ্যাঁ। সুন্দর নাম।' আদ্রিতা বলল, 'কিন্তু তুই ওর কথা আমাদের কাছে লুকিয়ে রাখলি কী করে?'

'না লুকিয়ে কী করব। ওর সাথে আমার প্রেম নেই, ও আমাকে ঠিকমতো চেনে কি না তাতেও সন্দেহ আছে।' মৃদু হেসে বলল সৌমিক, 'যদি এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারি। তাহলে আর কোনো দ্বিধা করব না। একদম সরাসরি বলে ফেলব। আমাকে না করতে পারবে না।'

'না করতে পারবে না কেন? তুই কী এমন রসগোল্লা?' এই বিপদের মধ্যেও রসিকতা করতে ছাড়ল না আদ্রিতা।

সৌমিক কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। প্রায় অন্ধকারেও আদ্রিতা দেখতে পেল সৌমিকের অবয়বটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। যেখানে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সৌমিকের মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মুখের যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি চোখে পড়ছে। ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আদ্রিতা। সৌমিক খপ করে ওর ডান হাত ধরে ফেলল।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে আদ্রিতার। এক হাতে মাটির স্তূপটা শক্ত করে ধরে রেখেছে, অন্য হাত সৌমিকের হাতে। টর্চলাইটটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল, না হলে সৌমিকের হাত ধরা যেত না। ছেলেটাকে পেছন থেকে কিছু একটা টানছে। টেনে আরও অন্ধকার কোনো গহ্বরে নিয়ে যাবে যেন। সেটা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে সৌমিক।

আদ্রিতাও সর্বশক্তিতে সৌমিকের হাত ধরে রেখেছে। ফারহানের পরিণতি দেখেছে। সৌমিকেরও এমন হোক তা চায় না। কিন্তু এভাবে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেকোনো সময় সৌমিকের হাত ছুটে যাবে। এই পৃথিবীতে একদম একা হয়ে যাবে আদ্রিতা।

ঠিক কতক্ষণ সৌমিকের হাত ধরে রেখেছিল জানে না, একসময় আদ্রিতা টের পেল সৌমিক তার হাত ছেড়ে দিয়েছে। সে এখন একা দাঁড়িয়ে আছে। সৌমিক নেই। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

চিৎকার করতে গিয়েও করল না আদ্রিতা। দমবন্ধ লাগছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে খুব। সৌমিক কোথায়? কে ওকে টেনে নিয়ে গেল? দুজন মানুষের প্রাণপণ চেষ্টার পরেও ওকে ধরে রাখা গেল না।

রবি আর কঙ্কার কোনো খবর নেই। ওরাও কী অন্ধকারে হারিয়ে গেছে?

এখানে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। কিন্তু কোথায় যাবে? হাতে টর্চলাইটটা আছে কেবল।

চুলগুলো শক্ত করে বেঁধে নিল আদ্রিতা। টি-শার্টটা গুঁজে নিল জিন্সের প্যান্টের ভেতর। শরীর এমনিতেই দুর্বল হয়ে আছে, খিদেটা এখন একটানা একটা যন্ত্রণার মতো সুর করে বাজছে পেটের ভেতরে। সেটাকেও একদম গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই মুহূর্তে প্রাণ বাঁচাতে হবে। না খেয়ে কিছু ছেলেপুলে দশ দিন বেঁচে ছিল, রবি বলেছিল। ওরা বাঁচতে পারলে সেও পারবে। তবে ওদেরকে শিকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াতে হয়নি।

গুহায় আবার নীরবতা নেমে এসেছে। টর্চলাইট না জ্বালিয়েই আন্দাজের উপর হাঁটছে আদ্রিতা। বারবার মনে হচ্ছে এই বুঝি তাকে টেনে নিয়ে যাবে অন্ধকারের শক্তিটা। আবার মনে হচ্ছে এই বুঝি রবি, কঙ্কা কিংবা সৌমিকের সাথে দেখা হয়ে যাবে। এরকমও হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই একটা প্র্যাঙ্ক। ফারহানের তৈরি করা কোনো মজা। এসব কাজে ফারহান সিদ্ধহস্ত। যদিও আগে এত বড় আকারের 'প্র্যাঙ্ক' করেনি কখনো। ফারহান হয়তো বেঁচে আছে, ওর যে মৃতদেহ দেখেছিল সেটা আসলে প্রস্থেটিকের কাজ। এখন হয়তো গোপন কোনো জায়গা থেকে তার কাজকর্ম ভিডিওতে রেকর্ড করছে। পরে ওরা এই নিয়ে হাসাহাসি করবে। অসম্ভব কিছু নয়। ফারহানকে দিয়ে সব সম্ভব। রবি, কঙ্কা আর সৌমিকও এর সাথে হাত মিলিয়েছে নিশ্চয়ই। নইলে বলা নেই কওয়া নেই কঙ্কা এরকম হুট করে দৌড় দেবে কেন? রবি-ই বা ওর পেছনে ছুটবে কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর একটাই, পুরোটাই ঐ চারজনের পূর্বপরিকল্পনা। আদ্রিতাকে বোকা বানানোর জন্য। এর সাথে হয়তো মং সেন-ও যুক্ত। কে জানে?

মং সেনের কথা মনে হতেই বিরক্ত লাগল আদ্রিতার। এই লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি। ওর চোখে-মুখে যে ধূর্ততা সেটা বাকিদের কাছে অপ্রকাশিত থাকলেও তার চোখে ধরা পড়েছে। শেষমেশ যে গল্পটা মং সেন শুনিয়েছিল, সেটাও একটা বানানো গল্প। ফারহান আর মং সেন মিলে এই গল্প ফেঁদেছে। ওকে ভয় দেখানোর জন্য।

এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল আদ্রিতা, কিন্তু তার সব ইন্দ্রিয় সতর্ক। এসবই হয়তো তার কষ্টকল্পনা কিংবা উইশফুল থিংকিং। হয়তো এরকম কিছুই ঘটেনি, এখানে যা ঘটছে সবই সত্যি। ফারহান সত্যি সত্যিই মারা গেছে। সৌমিকও এখন আর বেঁচে নেই নিশ্চয়ই। রবি আর কঙ্কার খোঁজ পেলে কিছুটা হলেও নিরাপদ অনুভব করবে আদ্রিতা। কিন্তু ওরা কোথায়? কতদূর চলে গেছে?

গুহাটা একটা গোলকধাঁধার মতো। যদিও পরিষ্কার কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তবুও আদ্রিতার মনে হলো, এই জায়গা দিয়ে সে কিছুক্ষণ আগেই হেঁটে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা করছে। বিশ্রাম নেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই, নিরাপদ কোনো জায়গা নেই। শরীর ভেঙে আসছে যেন। এখন দিন না রাত, কয়টা বাজে সেসব কোনো ধারণাও নেই। উপরের গুহা থেকে পড়ে যাওয়ার পর কতটা সময় কেটে গেছে কে জানে? বাইরে হয়তো এখন ঝকঝকে দিন। অথচ সে এই গুহার আঁধারে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ একটা শব্দে থমকে দাঁড়াল আদ্রিতা। শব্দটা শুনে তার গায়ের সব লোম দাঁড়িয়ে গেছে। কী বীভৎস একটা শব্দ? মনে হচ্ছে কারও শরীর থেকে মাংস ছেঁড়া হচ্ছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কোনোমতে একটা মাটির স্তূপের আড়ালে চলে এলো।

বুক ধড়ফড় করছে। চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী বলছে নিজেই বুঝতে পারছে না আদ্রিতা। কে ওখানে? কার শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে নেওয়া হচ্ছে? এতটা অমানুষিক কাজ কে করতে পারে? মং সেনের গল্পটা কী তাহলে সত্যিই?

দমবন্ধ করে শব্দগুলো শুনেছে আদ্রিতা। বারবার কেঁপে উঠেছে নৃশংসতার কথা চিন্তা করে। কিন্তু এরপরও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। জানে এই মুহূর্তে ভাগ্যের সাথে সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাও খুব জরুরি। শব্দটা যখন থেমে গেল, তখন বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। গুহায় পিনপতন নীরবতা নেমে এলো একসময়। তারও প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মাটির স্তূপের আড়াল থেকে বেরোল আদ্রিতা। শব্দটা যেখান থেকে আসছিল সেদিকে এগিয়ে গেল, পা টিপে টিপে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে আক্রমণের। হাতের টর্চলাইটটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। আঘাত করার জন্য প্রস্তুত। এটুকু আঘাতে শত্রুর কোনো ক্ষতি করতে পারবে কি না জানা নেই। কিন্তু মানসিকভাবে সে প্রস্তুত।

অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই শব্দের উৎসের কাছে চলে এলো। মনে মনে একটা আশা ছিল, হয়তো এমন কিছু দেখবে, যা দেখে কিছুক্ষণের আগের ভয় আর শঙ্কা সব মুছে যাবে। কিন্তু এমন কিছু দেখার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না আদ্রিতা, কেউ প্রস্তুত থাকেও না।

গুহার মেঝেতে যে অবয়বটা দেখা যাচ্ছে সেটা একটা মানুষের মৃতদেহ। আদ্রিতা ওকে চেনে, তাই দেহটা যে সৌমিকের তা চিনতে অসুবিধা হলো না। মাথাহীন দেহটার চারপাশে থকথকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কিছুটা দূর থেকেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আদ্রিতা। ঘণ্টা কয়েক আগেই দুজনে একসাথে ছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওর হাত ধরেছিল ছেলেটা। বাঁচতে পারেনি। নৃশংসভাবে মারা গেছে। ওর মৃত্যুটা ফারহানের মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর।

কিছুক্ষণ আগেও যে 'প্রাঙ্ক'-এর কথা ভাবছিল, সেটা নিমিষেই উবে গেল আদ্রিতার মন থেকে। এই পরিস্থিতি একদম বাস্তব। কিংবা এমন হতে পারে উপরের গুহা থেকে পড়ে যাওয়ার পর সে মারা গেছে। মৃত্যু পরবর্তী কঠিন জীবন দেখছে সে। কোনোকিছুই অসম্ভব নয়।

সৌমিক চেয়েছিল ফারহানের মৃতদেহের সৎকার করতে। ও কি জানত, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে নিজেও মৃতদেহে পরিণত হবে, সেটাও মাথা ছাড়া। শত্রুপক্ষ এতটাই নৃশংস যে মৃতদেহের মাথাটাকে সাথে করে নিয়ে গেছে।

আদ্রিতা মানসিকভাবে প্রস্তুত এখন মৃত্যুর জন্য। আত্মহত্যার জন্য। শত্রুর হাতে এত ভয়ংকরভাবে মরে যাওয়ার চেয়ে নিজে নিজে মরে যাওয়া ভালো। কিন্তু এই অন্ধকারে মরবেই বা কীভাবে? তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। নিজেকে হত্যা করার মতো সিদ্ধান্তে কোনোদিন আসতে হবে ভাবেনি কখনো। অথচ এই মুহূর্তে আত্মহত্যাটাকেই সবচেয়ে যন্ত্রণাহীন সমাধান বলে মনে হচ্ছে।

বড় একটা পাথরের টুকরোর উপর বসল আদ্রিতা। দৃষ্টি এখন সৌমিকের মুণ্ডহীন মৃতদেহটার দিকে। হঠাৎ মনে হলো, মৃতদেহটা নড়ে উঠল যেন। সৌমিকের ডান হাতটা অল্প অল্প নড়ছে, আঙুল নড়ছে। যেন কোনোদিকে ইশারা করছে আঙুলটা।

দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে, নিজেকেই বলল আদ্রিতা। খিদে, শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণা, এই দৃষ্টিভ্রমের কারণ। তবু উঠে দাঁড়াল। আঙুলটা যেদিক দেখাচ্ছে সেদিকে এগোতে থাকল।



রবি কাজের ছেলে নয়। সংসারের কোনো কাজে কোনোদিন হাত বাড়ায়নি, কোনোদিন বাজারে যায়নি। যেতে হয়নি। বাবা আর বড় ভাইই এসব দায়িত্ব সেরেছে। এতে নিজ হাতে কোনো কিছু করার প্রতি কোনোদিন আগ্রহ তৈরি হয়নি রবির। বরং সে সবসময় বাবা আর বড় ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছে।

কিন্তু এখানে পরিস্থিতি ভিন্ন। বাঁচতে হলে নিজেকেই সব করতে হবে। শুধু নিজে বাঁচলে হবে না, তার ভরসায় কিংবা তাদের ভরসায় যে মেয়ে দুটি এতদূর এলো, ওদেরকেও বাঁচাতে হবে। ফারহান এরমধ্যেই মারা গেছে। সৌমিক আর আদ্রিতা কোথায় আছে কোনো ধারণা নেই। ওরা বেঁচে আছে কি না সেটাও বোঝা যাচ্ছে না।

রবি আর কঙ্কা, দুজনের কাছে এমন কিছু নেই যা দিয়ে ওরা আত্মরক্ষা করতে পারে। অবশ্য শত্রুকে ওরা দেখেনি, জানে না শত্রুর শক্তিমত্তা সম্পর্কে, শুধু ধারণা করতে পারে। সামান্য কোনো অস্ত্র দিয়ে এরকম শত্রুকে মোকাবিলা করার কথা চিন্তাও করা যায় না। ফারহানের মতো প্রাণবন্ত একটা ছেলেকে যে নৃশংসতার সাথে খুন করেছে সেটা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

কঙ্কা বেশ কিছুক্ষণ কাঁধে মাথা রেখে বসেছিল। মেয়েটার জন্য মায়া লাগছে খুব। এখন চুপচাপ বসে আছে। ওর হাতে হাত রাখল রবি।

'তুই ভাবিস না,' রবি বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে তোর কিছু হবে না।'

উত্তর এলো না। তবে হাতে মৃদু চাপ অনুভব করল রবি। এই মুহূর্তে কথা বলার চেয়ে হাতের এই চাপটুকুই উত্তর হিসেবে যথেষ্ট। কঙ্কা তার উপর ভরসা করে আছে নিশ্চয়ই, এই ভরসা সে ভাঙতে দেবে না।

ঠিক এখানে কতক্ষণ বসে থাকবে বুঝতে পারছে না রবি। এমন নয় যে সে পথ চেনে। আদৌ এই গুহা থেকে বের হওয়ার কোনো পথ আছে কি না সেটাও নিশ্চিত না। হয়তো আছে। সেই পথ বের করার জন্য সাহস করে পথে নামতে হবে।

উঠে দাঁড়াল রবি, কঙ্কাকে হাত ধরে দাঁড় করাল। ডানে-বামে তাকাল। ঠিক কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না। দুদিকেই হয়তো মৃত্যু ফাঁদ পাতা, কে জানে!

ডানদিকে গুহার পথটা সরু। গুহার ছাদ বেশ নিচে নেমে এসেছে। সোজা হাঁটা যাবে না, কুঁজো হয়ে হাঁটতে হবে। তাই বাম দিকেই পা বাড়াল রবি।

বেশ সতর্ক হয়ে হাঁটছে দুজন। কঙ্কার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। পায়ের নিচে ভেজা ভেজা গুহার মেঝে। অন্ধকারে আন্দাজের উপর ভর করে হাঁটছে দুজন। কান খাড়া করে রেখেছে। এক পা ফেলে অপেক্ষা করছে কিছুক্ষণ, তারপর আবার পা ফেলছে।

হাঁটতে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছে আশপাশের মাটির স্তূপ থেকে অনেকগুলো চোখ উঁকি দিয়ে দেখছে ওদের। এসব ভেবে নিজেকে আরও ভীত করতে চাইছে না রবি। কঙ্কা মাঝে মাঝে বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে পাশ থেকে।

হঠাৎ করেই কিছু একটায় হোঁচট খেল কঙ্কা। শক্ত করে ওর হাত ধরে রেখেছিল রবি। না হলে অন্ধকারে কোথায় পড়ে আঘাত পেত কে জানে। পড়তে পড়তে ওকে কোনোমতে সামলে নিয়েছে। কঙ্কার হোঁচট খাওয়ার শব্দটা যেন গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে।

হাঁটু গেড়ে বসল রবি, ঠিক কীসে হোঁচট খেয়েছে দেখার জন্য। গুহার মেঝেতে হাতড়ে এমন একটা জিনিস পেল, যা হাতে নিয়ে রীতিমতো চমকে গেল।

ব্যাকপ্যাক! এই জিনিসটা কার হতে পারে সেটা জানে রবি! তাই তার বিস্মিত হওয়ার মাত্রাটা অনেক বেশি।

ব্যাকপ্যাকটা আর কারও নয়! মং সেনের। এই ব্যাকপ্যাকটা শেষবার দেখেছিল গুহায় ঢোকার পর। এটা এখানে কীভাবে এলো? মং সেনও কি তাহলে এই গুহায় ঢুকেছে? ঐ প্রাণীটার শিকারে পরিণত হয়েছে? নাকি শিকারি মং সেন নিজেই!

গুহার মেঝেতে ধপ করে বসে পড়ল রবি! এসব হচ্ছেটা কী? মং সেন বাইরে থেকে সাহায্য নিয়ে আসবে, ওদের উদ্ধার করবে, এরকম একটা আশা ক্ষীণভাবে হলেও ছিল। সেই আশা নিমিষেই শেষ হয়ে গেল। মং সেন বেঁচে আছে কি না তা-ই নিয়ে এখন সন্দেহ হচ্ছে।

কঙ্কাও বসে পড়েছে রবির পাশে। দুজন দুজনের হাত ধরে রেখেছে। দিকহারা, উদ্‌ভ্রান্ত দুই পথিক, যারা জেনে গেছে পথের শেষ বলে কিছু নেই। মাকড়সার জালে যেমন পতঙ্গ আটকায়, তারাও সেরকম মৃত্যু ফাঁদে আটকে গেছে। এই ফাঁদ থেকে মুক্তি নেই।

'এটা এখানে এলো কী করে?' দীর্ঘক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল কঙ্কা, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

রবির হাত থেকে ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়েছে। ব্যাগের ভেতর থেকে বড় একটা পানির বোতল বের করে আনল। ঢকঢক করে খেয়ে নিল বেশ খানিকটা। তারপর সেটা বাড়িয়ে দিল রবির দিকে।

পানি খেতে খেতে ব্যাগের ভেতরটা হাতড়াল রবি। ছোট একটা নোটবই, একটা কলম আর এই পানির বোতলটা ছাড়া আরেকটা জিনিস হাতে এলো। ছোট একটা মূর্তি!

পাথরের মূর্তিটার আকার বেশ ছোট। হাতের তালুতে এঁটে যায় এমন। মসৃণ, পিচ্ছিল পাথরের গা। তবে মাঝামাঝি অংশটায় সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে, অন্ধকার বলে দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তিটার পেট থেকে কিছু বেরিয়ে এসেছে। মূর্তিটার গায়ে বেশ কিছুক্ষণ হাত বুলাল। পরিচিত কোনো দেব-দেবতার মূর্তি বলে মনে হলো না। এটা কার মূর্তি! মং সেনকে বৌদ্ধ বলেই ধারণা করেছিল, কিন্তু এটা কোনো বুদ্ধমূর্তি নয়। এই মূর্তিটাকে ছুঁয়ে ভালো কোনো অনুভূতি হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে প্রাচীন কোনো অভিশাপকে ছুঁয়ে ফেলেছে সে।

দুজনে আবার উঠে দাঁড়াল। ব্যাকপ্যাকটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। পানির বোতলটায় এখনও অর্ধেক পানি আছে। ব্যাকপ্যাক থেকে প্রাপ্তি এটুকুই।

মূর্তিটাকে হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছে রবি। একটু আগেও সাথে কোনো অস্ত্র ছিল না বলে মানসিকভাবে দুর্বল লাগছিল। মূর্তিটা হাতের মুঠোয় আসার পর নিজেকে বেশ শক্তিশালী লাগছে। মনে হচ্ছে হাতের কাছে যে-ই আসুক, এই পাথরের মূর্তি দিয়ে জোরেসোরে আঘাত করতে পারলে আর চিন্তার কিছু নেই।

কঙ্কা শক্ত করে ওর হাত ধরে আছে। মেয়েটাকে আশ্বস্ত করতে ইচ্ছে করছে। বলতে ইচ্ছে করছে, এখান থেকে আমরা বেঁচে ফিরবই। এই মূর্তিটা আমাদের পথ দেখাবে। কিন্তু সেরকম কিছু বলার আগেই দারুণ এক চিৎকারে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

চিৎকারটা কার বুঝতে অসুবিধা হলো না রবির। জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করল শব্দের উৎসকে লক্ষ করে। আদ্রিতাকে বাঁচাতে হবে, সৌমিককে বাঁচাতে হবে।



আদ্রিতা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা বেশ অদ্ভুত জায়গা। মুহূর্তের জন্য টর্চের আলো ফেলে জায়গাটা দেখে নিয়েছে। গোলগাল একটা জায়গা। গুহার অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশ শুকনো। মেঝেটা ঝকঝকে পরিষ্কার, দেওয়ালের কাছাকাছি একটা জায়গায় উঁচু একটা বেদি। সেই বেদিতে মাটি কিংবা পাথরে তৈরি বিকৃত আকৃতির একটা মূর্তি। হিন্দু দেব-দেবির মূর্তি কমবেশি দেখেছে। সেগুলোর সাথে এই মূর্তিটার কোনো মিল নেই। মূর্তিটার মাথা অস্বাভাবিক বড়, পা দুটো ছোট। কান লম্বা, পেটটা দুভাগ করা। সেই ভাগ করা পেট থেকে অসংখ্য সাপের মাথা বেরিয়ে এসেছে। দেখেই কেমন গা গুলিয়ে উঠেছে।

জায়গাটার বিশেষত্ব হলো, সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা অসংখ্য কঙ্কাল। এই কঙ্কালগুলো মানুষের নয়। নানা রকম পশু-পাখির। তবে জন্তু-জানোয়ার বা পশু-পাখির প্রতি কোনকালেই আলাদা রকমের আকর্ষণবোধ করেনি বলেই হয়তো, হাড়গোড় দেখে কোনটা কোন প্রাণীর তা বের করা আদ্রিতার জন্য অসম্ভব একটা কাজ।

নানা রকম মাথার খুলি ডানদিকের দেওয়ালে তাক করে সাজানো। অন্যপাশে শরীরের অন্যান্য হাড়গোড়। জায়গাটা দেখে একটা ধারণা এলো আদ্রিতার মাথায়। এই জায়গাটায় সম্ভবত এসব প্রাণীগুলোকে ঐ বিকট মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। এছাড়া এখানে এভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার কোনো কারণ খুঁজে পেল না।

বাম দিকের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল আদ্রিতা। এখানে নানারকম হাড়গোড় সাজিয়ে রাখা হয়েছে দেওয়ালে। ঠিক কোনো প্রাণীর হাড় তা জানে না, কিন্তু প্রায় ইঞ্চি দশেক লম্বা একটা হাড় দেওয়াল থেকে বের করে আনল। হাড়টা বেশ শক্ত। এই হাড় থেকে আরও অনেকগুলো হাড় দুপাশে ছড়িয়ে গেছে। এটা সম্ভবত মেরুদণ্ডের হাড় হবে, ধারণা করল। হাড়ের এক

প্রান্ত বেশ ধারালো, সূচালো, অন্য প্রান্ত ভোঁতা ধরনের। হাড়টাকে হাতে নিয়ে ডানে-বামে তাকাল আদ্রিতা।

মনে হলো দ্রুতগতিতে কিছু একটা সরে গেল। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে ঘুরে দাঁড়িয়েও কাজ হলো না। গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে কেউ তাকিয়ে আছে তার দিকে। মূর্তিটার দিকে তাকাল এক ঝলক। মনে হলো মূর্তিটা তাকিয়ে আছে।

অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে আদ্রিতার। ভয় জিনিসটা সমস্ত শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে। মনে হচ্ছে এক পা'ও নড়তে পারবে না। শরীর শক্ত হয়ে আছে। এক হাতে টর্চ লাইট, অন্য হাতে লম্বা হাড়টা শক্ত করে ধরে আছে।

আবার পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে গেল কিছু একটা। মনে হচ্ছে কালো ছায়ার মতো একটা অবয়ব পাশ দিয়ে চলে গেল। তবে এবার ভয়ে থমকে যায়নি আদ্রিতা, বরং ডান হাত চালিয়েছে। এই হাতে লম্বা হাড়টা ধরা ছিল। হাড়টা সেই ছায়াকে ভেদ করে চলে গেল মনে হলো।

আদ্রিতা জানে এখান থেকে সরে যেতে হবে। না হলে এরকমটা ঘটতেই থাকবে। কঙ্কা আর রবির খোঁজ করতে হবে।

পিছু হটে গোলাকার এই জায়গাটা থেকে বের হচ্ছে আদ্রিতা। মাঝে মাঝে পেছনে ফিরছে। কিন্তু অন্ধকার বলে কিছু চোখে পড়ছে না কোথাও। মনে হচ্ছে অযথাই ভয় পাচ্ছে। এখানে কোথাও কিছু নেই, কেউ নেই।

জায়গাটা থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঠিক শেষ মুহূর্তেই আদ্রিতা টের পেল, পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অনুভূতিটা এত প্রবল, এত বাস্তব যে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সাহস হচ্ছে না।

ঠিক ফুটখানেক দূরত্ব আছে সেই অস্তিত্ব, যার হাতে এরমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছে দুই বন্ধু। নৃশংসতায় যার কোনো তুলনা নেই।

আদ্রিতা প্রস্তুত নয় এভাবে মৃত্যুর জন্য। মৃত্যু নিয়ে কখনো সেভাবে ভাবেনি। শুধু মনে হয়েছে সংসার করবে, চাকরি করবে, দেশ-বিদেশ ঘুরবে, ছেলে-মেয়ে বড় হবে, তারপর একসময় বৃদ্ধ অবস্থায় সব চাওয়া-পাওয়া পূরণ করে মারা যাবে। কিন্তু এত সহজ মৃত্যু তার ভাগ্যে নেই। তাকে মরতে হবে একা একা, সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক পরিবেশ, অদ্ভুত এক শক্তির হাতে, নৃশংসভাবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে শ্বাস ফেলার সাথে সাথেই আক্রমণ হবে। শিকারি যখন খুব সহজে শিকারকে পেয়ে যায়, তখন হয়তো তাকে নিয়ে খেলে, সময় নিয়ে শিকার করে। আমাকে নিয়েও হয়তো খেলছে, ভাবল আদ্রিতা।

গুহার ভেতরের পরিবেশটা গুমোট, চারপাশে নানারকম বিশ্রি গন্ধে পেটের ভেতর এমনিতেই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এসব দুর্গন্ধের পাশাপাশি আরও একটা অচেনা গন্ধ নাকে আসছে। এমনি সময়ে হলে এরকম গন্ধে দম আটকে মারা যেত কিংবা বমি করে ফেলত। কিন্তু এখন এসব করার সময় নয়। এখন চালে সামান্য এদিক-সেদিক হলে মৃত্যু অনিবার্য। এমনিতেই এখানে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। সম্ভাবনা যত কমই থাকুক, মানুষ 'মিরাকল'-এ বিশ্বাস করে। শেষ শয্যায় শুয়ে থাকা চতুর্থ স্তরের ক্যানসারের রোগীও আশা করে হঠাৎ করে এমন কোনো নিরাময় আবিষ্কৃত হবে, যা খেয়ে ফেলার সাথে সাথে রোগমুক্তি ঘটবে। কিন্তু তেমনটা ঘটে না কখনো। রোগী মারা যায়। কিন্তু তবু মানুষ আশা ছাড়ে না। এই আশাই হচ্ছে জীবন। আশাহীন জীবন মৃত্যুর কাছাকাছি একটা কিছু।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নানারকম চিন্তায় প্রায় অস্থির হয়ে পড়েছে আদ্রিতা। পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা এখনও যায়নি। কেন এখনও আক্রমণ করছে না এই চিন্তায় আরও বেশি অস্থির লাগছে। ফারহান কিংবা সৌমিকের সময়ও কী এরকম সময় নিয়েছিল? ওরা কী কিছু টের পেয়েছিল মৃত্যুর আগে আগে?

খসখস করে একটা শব্দ হচ্ছে পেছনে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়নি আদ্রিতা, কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুত। কোথাও একটা পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়ল। সেই সামান্য শব্দটাই গুহার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

টের পাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে কেউ আসছে। ঠিক তার পেছনেই। অন্ধকার সেখানে ঘন হচ্ছে। দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে আদ্রিতা, টের পাচ্ছে ঘামের সরু রেখা কপাল বেয়ে নেমে আসছে ধীরে।

অন্ধকারে চোখ বুজে রাখার কোনো মানে নেই। এক হাতে টর্চলাইট, অন্যহাতে হাড়ের টুকরোটা শক্ত করে ধরে আছে। বেশ কিছুক্ষণ এরকম দমবন্ধ কাটল। মনে হচ্ছিল যেকোনো সময় আক্রমণ হবে। কিন্তু হয়নি। বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াল আদ্রিতা।

সাথে সাথেই টের পেল বিপুল গতিতে কিছু একটা ছুটে আসছে তার দিকে। গাঢ় অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল আদ্রিতা। শরীরের সব শক্তি দিয়ে ভয়কে দূরে সরিয়ে রাখার এই একটা উপায়ই সে জানে। একই সাথে ডান হাত চালাতে দ্বিধা করল না, এত জোরে হাড়টা দিয়ে আঘাত করেছে যে আরেকটু হলে সেটা তার হাতের ভেতরই ঢুকে যেতে পারত।

থপ করে একটা শব্দ হলো। মনে হলো একতাল মাংস পড়ে গেছে গুহার মেঝেতে। হাড়টা ফেলে দিয়ে দ্রুত টর্চলাইটের বোতাম চাপল। শত্রুকে দেখা দরকার। টর্চলাইটের আলো ফেলার সাথে সাথে দেখল মেঝে থেকে মানুষের অবয়বের মতো কিছু একটা ছুটে চলে যাচ্ছে। শুকনো লম্বা একটা শরীর, নগ্ন।

মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে আক্রমণকারী। টর্চের আলো ফেলে ঠিক যেখানে মেঝেতে পড়েছিল সেখানে গেল আদ্রিতা।

মেঝেতে লাল কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। রক্তের ফোঁটা। ছুঁয়ে দেখল। ঘন, গাঢ় রক্ত।

রক্তমাংসের মানুষ না, মানুষের মতো অবয়বের কোনো প্রাণী!

এই সময় আশপাশে কোথাও পদশব্দ পেল আদ্রিতা। হাড়টা মেঝে থেকে তুলে নিয়েছে। সাদা ধবধবে হাড়ের একপাশ রক্তে লাল হয়ে আছে। টর্চলাইট নিভিয়ে একটা দেওয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

এবারও সে প্রস্তুত। আক্রমণ করার জন্য।

কঙ্কার পায়ে ব্যথা, কিন্তু আতঙ্ক, ক্ষুধা আর মৃত্যুভয় সেই ব্যথাকে ভুলিয়ে দিয়েছে অনেক আগেই। সে হাঁটছে কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সামনে রবি হাঁটছে, খুব সাবধানে।

কঙ্কার বারবার মনে হচ্ছে মং সেনের ব্যাকপ্যাক গুহার ভেতরে পাওয়া যাওয়ার বিশেষ গুরুত্ব আছে। উপরের গুহা থেকে যখন বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল, মং সেন তখন এই পথ দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করেছে। তবে স্বার্থপর বলেই হয়তো ওদের কাউকে বলার প্রয়োজনবোধ করেনি। একা একাই বেরিয়ে গেছে। ফারহানের অবস্থা দেখার পর কঙ্কা নিশ্চিত, মং সেন-ও এখন আর জীবিত নেই। যেকোনো সময় ওর মৃতদেহ দেখার অপেক্ষায় আছে সে।

রবি হাঁটছে, বারবার ডানে-বামে তাকাচ্ছে। একটু আগে যে চিৎকারটা শুনেছিল, সেটা আশপাশ থেকেই এসেছে। কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছে এটা আদ্রিতার কণ্ঠস্বর। আশপাশেই আছে মেয়েটা। সৌমিকের কথা জানে না, কিন্তু কঙ্কা নিশ্চিত, আদ্রিতা বেঁচে আছে। এই মেয়ে বিনাযুদ্ধে মরে যাওয়ার মতো মেয়ে নয়।

আদ্রিতার উপর তার এই আত্মবিশ্বাসের আলাদা কারণ আছে। এতগুলো বছর একসাথে চলতে গিয়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলে

নেওয়ার যে দক্ষতা আদ্রিতার মধ্যে দেখেছে, সেটা তার মধ্যে নেই। ক্লাসে হোক কিংবা বাইরে, সবসময়ই কঙ্কার রক্ষক হিসেবে কাজ করেছে আদ্রিতা।

এই মুহূর্তে অবশ্য রবির সঙ্গ তার ভালো লাগছে। কোনোদিন যদি মনের কথা বলতে পারে, কোনোদিন যদি একসাথে বাকি জীবনটা ওর সাথে কাটানোর সুযোগ হয়, তাহলে এখনকার এই পরিস্থিতির কথা কখনো ভুলবে না কঙ্কা। রবি সবকিছু ফেলে, আদ্রিতা আর সৌমিককে ফেলে তার পেছনে ছুটে এসেছে। না হলে এতক্ষণে হয়তো ফারহানের পরিণতি বরণ করতে হতো।

গুহার ভেতরটা বেশ গরম এখন। মনে হচ্ছে দেওয়াল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে কঙ্কার।

রবি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। কঙ্কা ওর হাত ধরে ফেলল দ্রুত। মনে হলো পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে কিছু একটা চলে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের আড়াল হয়ে গেল।

দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সামনে এগোল। জায়গাটা গুহার অন্য অংশের চেয়ে আলাদা। উষ্ণতা এখানে কম, আধো-অন্ধকারে দেওয়ালজুড়ে সাজানো অজস্র হাড়গোড় রবি আর কঙ্কার চোখ এড়াল না। কঙ্কা এখন রবির গায়ের সাথে প্রায় লেগে আছে। আতঙ্কিত। বুঝতে পারছে না এই জায়গাটার আসল রহস্য কী?

দেওয়াল ধরে এগোতে লাগল দুজন। এই সময় পাশ থেকে হঠাৎ এগিয়ে এলো কেউ। কঙ্কার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বেশ কয়েক পা দূরে সরে গেল রবি।

আদ্রিতা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সাদা একটা হাড়, অন্য হাতে টর্চলাইট। মেয়েটাকে এই রূপে কোনোদিন দেখেনি কঙ্কা। রবিও তাকিয়ে আছে বেশ অবাক হয়ে। আদ্রিতার চোখে-মুখে হিংস্রতা ঝরে পড়ছে। তবে তার সামনের মানুষ দুজন যে রবি আর কঙ্কা, বিপজ্জনক কেউ বা কিছু নয়, এটা বুঝতে পেরে চোখ-মুখ নরম হয়ে এলো মুহূর্তের মধ্যেই। দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল কঙ্কা।

রবিও পাশে এসে দাঁড়াল। তারও ইচ্ছে করছিল ওদেরকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু দারুণ এক সংকোচবোধ হলো। এই পৃথিবীর আলো-বাতাস কোনোদিন আর দেখতে পারবে কি না জানে না। এই দুজন মানুষই তার একমাত্র আপনজন। ওদেরকে নিয়ে সে বাঁচবে, এখান থেকে একসাথে বের হয়ে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবে। কিন্তু সৌমিক কোথায়?

রবির চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়েছে আদ্রিতা আর তাতেই সৌমিকের পরিণতি বুঝতে পেরেছে রবি আর কঙ্কা। দুজনের

চোখে-মুখে হতাশা আর বিষাদ নেমে এলো মুহূর্তেই। কঙ্কার কান্না পাচ্ছিল, নিজেকে কোনোমতে সামলাল।

হাড়গোড় সাজানো একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল ওরা তিনজন। মাঝখানে কঙ্কা বসেছে, বাদিকে আদ্রিতার কাঁধে মাথা দিয়ে। রবির হাতে টর্চলাইট। তবে সেটা জ্বালাচ্ছে না। ব্যাকপ্যাক থেকে পানির বোতল বের করে সেটা আদ্রিতার দিকে বাড়িয়ে দিল রবি। পানির বোতল দেখে একই সাথে কৌতূহল আর তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে রইল আদ্রিতা। রবি কিছু বলল না। বাকি পানিটুকু খেয়ে নেওয়ার জন্য ইশারা করল।

সামান্য পানি যে কতটা স্বস্তি এনে দেয় শরীরে, সেটা বুঝতে পারছে আদ্রিতা। কয়েক ঢোক পানি খাওয়ার পর শরীরটা কিছুটা হলেও তাজা লাগছে।

'এই ব্যাগটা মং সেনের না?' চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল আদ্রিতা, কথা না বলে থাকতে পারছে না সে। ব্যাকপ্যাক আর পানির বোতল তার মনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করেছে।

'হুঁ।'

'ঐ শালা এই নিচেই আছে,' আদ্রিতা বলল, 'ফারহান আর সৌমিককে ঐ মেরেছে।'

'কী বলিস এইসব?' রবি বলল, 'ও মারতে যাবে কেন? মেরে ওর লাভ কী?'

'ওর মাথা খারাপ তাই,' আদ্রিতা বলল, 'দেখছিস না এখানে সব জীবজন্তু মেরে হাড়গোড়ের সংগ্রহশালা বানাইছে।'

'তুই নিশ্চিত এটা মং সেনের কাজ?' কঙ্কা জিজ্ঞেস করল।

'একশো পার্সেন্ট,' আদ্রিতা বলল, 'ও একটা পার্ভার্ট। আগে ছেলেগুলোকে মারবে, তারপর তোরে আর আমারে মারবে, বুঝলি?'

'এখানে যা ঘটছে তার পেছনে অন্য কিছু আছে,' রবি বলল, 'ফারহানকে যেভাবে মেরেছে ঐটা কোনো মানুষের কাজ হতে পারে না।'

'তাহলে কীসের কাজ? তুই বল।'

'কোন মাংসাশী প্রাণীর কাজ হতে পারে, ভালুক ধরনের কিছু,' রবি বলল, 'যার চলাচল এই গুহার মধ্যেই। সে অনেক শক্তিশালী। এখানে সে যা পায়, তাই খায়। ঐ হাড়গোড়গুলাই তার প্রমাণ।'

'ব্যাখ্যা একটা দিয়ে দিলি আর হয়ে গেল?' আদ্রিতা জিজ্ঞেস করল। রবির ব্যাখ্যা সে মেনে নিতে পারছে না। আবার অদ্ভুত পৃথিবীতে কত কিছু ঘটে, সবকিছুর তো আবার ব্যাখ্যাও হয় না। এটাই হয়তো সেরকম কিছু। তবু রবির ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে।

'মং সেন যে গল্পটা বলছিল, সেটাও হতে পারে।' কঙ্কা বলল, 'এখানে যা আছে সেটা স্বাভাবিক কিছু না। অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপার আছে।'

'এইটা দ্যাখ, আমার মনে হয়, জিনিসটা এইরকম কিছু একটা হবে,' রবি বলল। মং সেনের ব্যাকপ্যাকে পাওয়া ছোট, মসৃণ পাথরের মূর্তিটা আদ্রিতার হাতে দিল।

মূর্তিটা হাতে নিয়ে কিছুটা কেঁপে উঠল আদ্রিতা। প্রায় অন্ধকারে সে যে অবয়বটাকে হাড় দিয়ে আহত করেছে, ঐ জিনিসটা কী দেখতে এই মূর্তির মতো! কেন জানি মনে হচ্ছে এই মূর্তির সাথে ঐ অবয়বটার কোনো যোগসূত্র আছে। তবে এসব কথা রবি আর কঙ্কাকে বলে ওদেরকে আরও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিতে চায় না।

আদ্রিতা কিছু বলতে যাবে, থমকে গেল। রবি চিৎকার করছে। অন্ধকার থেকে কিছু একটা রবির দুই পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হাতের কাছে মেঝেতে যা আছে তা ধরে নিজেকে আটকাতে চাচ্ছে রবি।

হঠাৎ এরকম একটা ঘটনায় আতঙ্কে স্থবির হয়ে গেছে কঙ্কা। আদ্রিতা দুই হাতে রবির দুই হাত টেনে ধরেছে। চেঁচাচ্ছে, প্রাণপণে। কঙ্কাকে ইশারা করছে ওকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু কঙ্কার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দেওয়ালে নিজেকে চেপে ধরে গোঙাচ্ছে মেয়েটা।

শক্ত করে রবিকে টেনে ধরেছে আদ্রিতা। টের পাচ্ছে তার শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। রবি এখনও চেঁচাচ্ছে, ওর আতঙ্কিত চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে একবার অন্ধকারে হারিয়ে গেলে ওকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

আদ্রিতা দুই হাতে রবিকে টানছিল। এবার এক হাতে মেঝেতে পড়ে থাকা টর্চলাইট তুলে নিল। শত্রুকে চিনে রাখা দরকার। এক হাতে দাঁতে দাঁত চেপে রবিকে টেনে ধরে রেখেছে আর অন্য হাতে টর্চলাইটের বোতাম চাপল।

রবির ঠিক পেছনে টর্চের আলো ফেলার চেষ্টা করল। পারল না। এত টানা-হেঁচড়ার মধ্যে হাতের লক্ষ স্থির রাখা কঠিন। তবু আরেকবার চেষ্টা করল আদ্রিতা।

এরকম একটা দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। রবির ঠিক পেছনেই অন্ধকারে সেই অবয়ব। তবে অবয়ব একটা নয়। বেশ কয়েকটা। হঠাৎ টর্চের আলোয় কিছুটা যেন খেই হারিয়ে ফেলল সেই অবয়বগুলো আর তাতেই রবি সর্বশক্তিতে নিজের পা ছাড়িয়ে নিতে পারল।

মেঝেতে পড়ে থাকা আদ্রিতার লম্বা হাড়টা তুলে নিয়ে অন্ধকারে সেটা তাক করে দাঁড়িয়ে পড়ল রবি। আদ্রিতার হাত থেকে টর্চলাইটটা ছুটে গেছে এরমধ্যে। সেটাও অন্য হাতে তুলে নিল রবি।

অন্ধকারে, যেখানে সেই অবয়বগুলো তার পা ধরে টেনে নিতে চাচ্ছিল সেদিকে আলো ফেলল। আদ্রিতা চোখ বুজে ফেলেছে। ঐ দৃশ্যটা সে আবার দেখতে চায় না।

বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল সে। দেখল রবি দাঁড়িয়ে আছে, টর্চের আলো ফেলছে এদিক-সেদিক। তবে কিছু দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

রবি ফিরে আসার পরও কঙ্কা স্বাভাবিক হয়নি। এখনও গোঙাচ্ছে। ওর মাথায় কোনোমতে হাত বুলিয়ে দিল আদ্রিতা।

'এখানে থাকা নিরাপদ নয়,' রবি বলল, 'চল। উঠে দাঁড়া,' আদ্রিতা আর কঙ্কার উদ্দেশে বলল।

'এখানে কোথাও নিরাপদ নয়,' আদ্রিতা বলল। 'আমি কোথাও যাচ্ছি না। এখানেই থাকব।'

'আরেকটু হলেই আমি শেষ হয়ে যেতাম,' রবি বলল, ধপ করে বসে পড়ল আদ্রিতার পাশে। তারপর দেওয়ালের দিকে তাকাল। সেখানে জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় থেকে বেশ কয়েকটা হাড়ের টুকরো বেছে নিল। আদ্রিতার হাতে ওর লম্বা হাড়ের টুকরোটা দিল।

'আজকে তুই না থাকলে এতক্ষণে আমি শেষ হয়ে যেতাম,' রবি বলল। 'টর্চের আলো ফেলে তুই কিছু দেখেছিস?'

'না,' এক কথায় কোনোমতে জবাব দিল আদ্রিতা। সে যা দেখেছে, ওরা হয়তো এমনিতেই যেকোনো সময় দেখবে। আগেভাগে বলে ভয় দেখাতে চাচ্ছে না।

'আমি মরতে চাই না,' কঙ্কা বলল, 'আমাকে তোরা বাঁচা।'

'তুই একা বাঁচবি না শুধু, আমরা সবাই বাঁচব,' রবি বলল।

রবির আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও নড়বড়ে হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা মুখে স্বীকার করছে না, এটা ভালো লক্ষণ। বিপদকে মাথার উপর চড়তে দিলে সেটা আরও বিপদ টেনে নিয়ে আসে। সাবধান না হলে ওদের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটবে।

আদ্রিতার শুধু চোখে ভাসছে টর্চের আলোয় দেখা হিংস্র সেই প্রাণীগুলোর অবয়ব। সারা শরীর কেঁপে উঠছে অজানা ভয়ে। এতগুলো হিংস্র শিকারির মোকাবিলা কীভাবে করবে জানা নেই।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল। রবি দাঁড়িয়ে আছে। টর্চের আলো ফেলছে এদিক-সেদিক। কঙ্কা এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

আদ্রিতার ইচ্ছে করছিল দৌড়ে ঐ অন্ধকারে হারিয়ে যেতে, কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার আগেই ওরা শেষ করে দেবে।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল আদ্রিতা। তারপর উঠে দাঁড়াল। হাতে ধারালো সেই হাড়টা আছে। রবির দিকে তাকাল। ওর ইশারা বুঝতে পারল রবি। দেওয়াল জুড়ে সাজানো হাড়গোড় থেকে লম্বা একটা হাড় নিজের জন্য বেছে নিল।

'চল,' আদ্রিতা বলল।

'কোথায়?'

'পথ বের করতে হবে, না হলে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে,' আদ্রিতা বলল, 'আমি ধুঁকে ধুঁকে মরতে চাই না।'

টের পেল তার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে কঙ্কা। ওকে সাথে নিয়েই হাঁটতে থাকল সে। রবি এলো পেছন পেছন। টর্চের ম্রিয়মাণ আলোয় সামনের সবকিছু কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে।

ওরা হাঁটতে থাকল।



শরীরে শক্তি বলে আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। আদ্রিতা টের পাচ্ছে গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাঁটতে পারছে না। দেওয়াল ধরে ধরে এগোচ্ছে। কঙ্কা মাঝে মাঝে এত শক্ত করে হাত আঁকড়ে ধরছে যে হাঁটতে বেগ পেতে হচ্ছে। রবি পেছনে আছে। ওর হাতের টর্চলাইটের ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে যেকোনো সময়।

ঠিক কতক্ষণ ধরে হাঁটছে কোনো ধারণা নেই আদ্রিতার। তবে এটুকু বুঝতে পারছে গুহাটা একটা বড়সড়ো গোলকধাঁধার মতো। প্রাকৃতিক খেয়ালে তৈরি হয়েছে যার সন্ধান এখনও হয়তো কেউ জানে না। বাইরের পৃথিবীর কাছে পরিচিত হলে হয়তো এখানে এতদিনে পর্যটকদের ঢল নেমে যেত, কে জানে!

গুহার ভেতরের আতঙ্ক গ্রাস করে আছে এখনও। ফারহান আর সৌমিকের মতো তরতাজা দুটি প্রাণ অযথাই ঝরে গেছে। মং সেনের সাথে এই গুহায় না ঢুকলে এই মুহূর্তে ওরা হয়তো উপরের ক্যাম্পে বসে গল্প করত, কিংবা এতদিনে ঢাকার পথে রওনা দিত। গুহায় আটকে পড়ার পর সম্ভবত দুদিন পার হয়েছে। সময় নিয়ে কোনো ধারণাই নেই ওদের কারও।

কঙ্কা হাঁটতে পারছে না একেবারেই। ওর কারণেই গতি কমাতে হচ্ছে বাকি দুজনকে। চাইলে স্বার্থপরের মতো ওকে ফেলে রেখে যেতে পারে ওরা, কিন্তু তাতেও যে বেঁচে ফিরতে পারবে উপরের পৃথিবীতে তার নিশ্চয়তা নেই। আর বন্ধু হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে এটুকু মানবিকতা না থাকলে, নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতেও দ্বিধা হবে।

অন্ধকারের মধ্যে অনেক দূরে সরু একটা আলোর রেখা চোখে পড়ল আদ্রিতার। সত্যি দেখছে কি না সেটা বোঝার জন্য এক হাতে চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরাল। কোনোমতে চোখ ডলে আবার তাকাল। হ্যাঁ। খুব

সূক্ষ্ম একটা আলোর রেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটাও এখান থেকে অনেক দূরে। ওটা কি সত্যি সত্যি দিনের আলো? না সে ভুল দেখছে?

'রবি, আলো দেখছিস?' চাপা গলায় বলল আদ্রিতা।

রবি হাঁটছে ওদের দুজনের ঠিক পেছনেই, তবে সে বিপরীত দিকে মুখ করে আছে। তাই আদ্রিতা যা দেখছে তা দেখার জন্য তাকে সোজা হতে হলো। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হলো তাকেও।

'আলো নাকি? দিনের আলো?' রবির কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ল।

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে,' আদ্রিতা বলল।

'বেশি দূরে না মনে হয়,' রবি বলল, 'একটু জোরে পা চালা।'

আদ্রিতা জোরে পা চালানোর চেষ্টা করেও পারছে না। কঙ্কার কারণে গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। মেয়েটা পায়ে ব্যথা পেয়েছিল, একটু জোরে হাঁটতে গেলেই ব্যথায় ককিয়ে উঠছে কঙ্কা।

'জোরে হাঁট, বেশি দূরে না,' রবি চাপা গলায় তাড়া দিল।

আদ্রিতা দাঁতে দাঁত চেপে কঙ্কাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অল্প এই পথটুকু এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে।

'দৌড়া,' রবি বলল।

আদ্রিতা দেখল রবির টর্চলাইটটা নিভে গেছে। কেন দৌড়াতে বলল কোনো ধারণা নেই তার। কঙ্কাকে নিয়ে দৌড়ানো কঠিন, কিন্তু সেই কঠিন কাজটাই করছে সে। বিপদ বুঝতে পেরে কঙ্কাও চেষ্টা করছে আদ্রিতার সাথে তাল মেলানোর।

এখানে গুহার মেঝে শক্ত, কিন্তু মসৃণ। পা পিছলে যাওয়ার মতো অবস্থা হচ্ছে দুজনের। রবি একা মানুষ। কাঁধে মং সেনের ব্যাগ এবং এক হাতে টর্চলাইট আর অন্য হাতে লম্বা হাড়টা নিয়ে আদ্রিতাদের পার হয়ে বেশ কিছুটা সামনে এগিয়ে গেল। বন্ধুকে একা ফেলে যাবে না আদ্রিতা। সে কঙ্কারে হাত ধরে রেখেছে এখনও।

রবি কেন দৌড় দিতে বলেছে সেটা এখন বুঝতে পারছে। চারপাশে হুড়োহুড়ির মতো শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেকগুলো শিকারি একসাথে এগিয়ে আসছে। ওরা অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিল। এখন আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। আবার এটাও হতে পারে, সামনে যে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে, সেখানে পৌঁছতে পারলে ওরা এই গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। সেই সুযোগ এই হিংস্র দানবের দল দিতে চাচ্ছে না।

রবি বেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে। কঙ্কাকে সাথে নিয়ে এখনও খাবি খাচ্ছে আদ্রিতা।

'আমাকে রেখে যা,' কঙ্কা চাপা গলায় বলল।

উত্তর দিল না আদ্রিতা। ওকে ফেলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কোনোদিন যদি বেঁচে ফিরতে পারে নিজের কাছে কী জবাব দেবে?

রবি এখন সেই আলোর রেখার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। দুই হাত দিয়ে ইশারা করছে আদ্রিতার দিকে, যেন গতি বাড়ায়। আদ্রিতা গতি বাড়াচ্ছে। লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বুঝতে পেরে কঙ্কাও গতি বাড়াল।

আলোর রেখাটা যেখান থেকে আসছে সেটা রবির ঠিক মাথার কাছাকাছি ছোটখাটো একটা গর্ত। রবি লাফ দিয়ে সেই গর্তটা ছুঁল একবার। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে আনন্দে মন ভরে উঠল আদ্রিতার। রবি এই গর্ত দিয়ে উপরে উঠে যাবে, তারপর তাদের দুজনকে টেনে তুলবে। এই ভয়ানক দুঃস্বপ্নের শেষ হবে। পৃথিবীর কাছে তারা বলতে পারবে এরকম অদ্ভুত এক গুহার কথা, যেখানে লুকিয়ে আছে পৃথিবীর ভয়ংকরতম সব দানবের দল।

কিন্তু আদ্রিতার সেই আশা পূরণ হলো না। চোখের সামনে আদ্রিতা দেখল শুকনো, লম্বা একদল দানবের দল অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে। রবি চেষ্টা করছে গর্তে হাত দিয়ে উপরে উঠে যাওয়ার। কিন্তু সেই সুযোগ পেল না। তার আগেই সেই দানবের দল গুহার গভীর অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেল রবিকে।

রবির চিৎকারে গুহার বাতাস ভারি হয়ে উঠল। চিৎকার কিছুক্ষণের মধ্যে পরিণত হলো গোঙানিতে। কিছুক্ষণ পর সেই গোঙানির শব্দও থেমে গেল। কানে আসছে মাংস ছেড়ার শব্দ আর অদ্ভুত কিছু শব্দ।

ওরা কি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে? ওরা কি বিকৃত কোনো মানুষের দল? নাকি শুধুই হিংস্র প্রাণী? মং সেনের গল্পের সেই পুরুষ? কিন্তু সে তো ছিল একা? নাকি এরা হলিউডের সিনেমায় দেখানো সেই জোম্বিদের মতো কিছু? তাহলে কি সৌমিক, ফারহান আর রবি, ওরাও জোম্বিতে পরিণত হবে?

এসব কেন ভাবছে ব্ঝতে পারছে না আদ্রিতা। মাথা কাজ করছে না। গুহার সেই আলো এখনও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর সে এগোচ্ছে না। কঙ্কা এখনও শক্ত করে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। দুজনই পরিষ্কার বুঝতে পারছে সামনে এগিয়ে যাওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। পেছনে যাওয়া মানেও মৃত্যু। এমনকি এখানে স্থির দাঁড়িয়ে থেকেও মৃত্যুকে ওরা এড়াতে পারবে না। মৃত্যু এখন এক অনিবার্য সত্য। এই সত্যকে এড়ানোর কোনো পথ ওদের জানা নেই।



চারপাশে সুনসান নীরবতা। কিছুক্ষণ আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল ওরা দুজন, এখন সে জায়গা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে সরে এসেছে। এখান থেকে সেই আলোর রেখাটা আর চোখে পড়ে না।

আদ্রিতার কাঁধে মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছে কঙ্কা। দুজনের কেউ কোনো কথা বলছে না। তবে দুজনেই সতর্ক। রবির পরিণতি নিজ চোখে দেখেছে। রবির শেষ মুহূর্তের আর্তচিৎকার এখনও কানে বাজছে।

আদ্রিতা টের পেল তার চোখ ভেজা। কখন চোখ ভিজে গেছে সেটা নিজেও জানে না। এক হাত দিয়ে কোনোমতে চোখ মুছল। পাঁচজনের মধ্যে দুজন অবশিষ্ট আছে। ওরা কি বেছে বেছে সব ছেলেদের আগে শেষ করে দিল? এরকম একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল কিছুক্ষণ ধরে। না হলে পাঁচজনের দলে মেয়ে দুজনই ছিল দুর্বল, অথচ ওরা দুজনই কোনোমতে টিকে আছে এখনও।

মং সেনের ব্যাকপ্যাকটা সাথে আছে এখনও। ধীরে সুস্থে ব্যাগটা খুলল আদ্রিতা। ভেতরে খাবারের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া গেল না। বেশ কিছু কাপড়-চোপড় আছে। অন্যের কাপড়-চোপড়ে হাত দেওয়াটা অসভ্যতা। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো কিছুরই আর কোনো মানে নেই। পৃথিবীর যাবতীয় নিয়ম-কানুনের বাইরে চলে এসেছে ওরা।

মং সেন নিশ্চয়ই আর বেঁচে নেই, বেঁচে থাকার কথা নয়। বেঁচে থাকলে অবশ্যই এরমধ্যে দেখা হয়ে যেত। হয়তো ওর মৃতদেহ এই গুহার কোনো এক কোণায় পড়ে আছে, যেমন পড়ে আছে ফারহান, সৌমিক আর রবির মৃতদেহ। পৃথিবীর কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না কী হয়েছিল তাদের সাথে। ঐ মৃতদেহগুলোর সাথে আর দুটো মৃতদেহ যোগ হওয়ার অপেক্ষায়, অল্প কিছু সময় হয়তো বাকি।

এখানে নিজেদের নিরাপদ মনে করার কোনো কারণ নেই। আদ্রিতা জানে শিকারিরা এখন অপেক্ষা করছে, হয়তো মেরে ফেলার আগে শিকার

নিয়ে খেলার ইচ্ছে ওদের। না হলে এই অন্ধকারে ওদেরকে খুঁজে পাওয়া খুব বড় কোনো সমস্যা নয়। বড় একটা পাথরের খাঁজে দুজন জড়াজড়ি করে বসে আছে। এরচেয়ে অসহায় অবস্থায় নিজেকে আর কোনোদিন আবিষ্কার করেনি আদ্রিতা। করতে চায়ও না। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাক। এভাবে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও বোধহয় অনেক ভালো।

ব্যাগে কিছু নেই, তবে শেষ মুহূর্তে মং সেনের একটা প্যান্টের পকেটে শক্ত কিছু হাতে লাগল আদ্রিতার। গোলগাল একটা জিনিস। সেটা কী হতে পারে ধারণা নেই। পাথরের টুকরো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে পাথরের টুকরো পকেটে নিয়ে ঘোরাঘুরি করার মানে নেই। এটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু।

প্যান্টের পকেট থেকে জিনিসটা বের করে আনল আদ্রিতা। জিনিসটা শক্ত হলেও পাথরের মতো নয়। বরং মসৃণ আবরণের জিনিসটা কী হতে পারে সেটা ভাবতে গিয়েই উত্তেজনা হচ্ছিল অনেক। এরকম জিনিসের ছবি পত্রিকায় দেখেছে, বইয়ের পাতায় চোখে পড়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোনোদিন হাতে পাবে সেটা কোনোদিন ভাবেনি।

অন্ধকার বলে জিনিসটা কী সত্যিই সেই জিনিস তা নিশ্চিত হতে পারছে না আদ্রিতা। কঙ্কার এদিকে কোনো মনোযোগ নেই। তাই ওর হাতে জিনিসটা গুজে দিল আদ্রিতা।

'কী এটা?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল কঙ্কা।

'তুইই বল,' আদ্রিতা বলল।

'কয়েন মনে হচ্ছে,' বেশ কিছুক্ষণ পর বলল কঙ্কা। 'কিন্তু এখানে এরকম কয়েন আসবে কোত্থেকে?'

'মং সেনের প্যান্টের পকেটে পেয়েছি,' আদ্রিতা বলল।

'একটা কথা বলি,' কঙ্কা বলল।

'বল।'

'আমার মনে হচ্ছে এটা সোনার,' কঙ্কা বলল।

'কী করে বুঝলি?'

'জানি না।' কঙ্কা বলল, 'কিন্তু মনে হচ্ছে এটা প্রাচীন কোনো মুদ্রা। স্বর্ণমুদ্রা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'মং সেন স্বর্ণমুদ্রা পাবে কী করে? তামা-টামা হতে পারে,' আদ্রিতা বলল।

'তাও হতে পারে,' কঙ্কা বলল।

'কিন্তু এরকম জিনিস ওর কাছে কেন?' আদ্রিতা বলল, 'তোর কী মনে হয়?'

'জানি না,' কঙ্কা বলল, 'এটা তোর কাছে রাখ। আমার মনে হয় জিনিসটা ভালো না।'

'তোর কাছেই থাক,' আদ্রিতা বলল, 'যদি বেঁচে ফিরতে পারি এটা ভেঙে দুজন দুটা লকেট বানাব।'

কঙ্কা এই কষ্টের সময়েও হেসে ফেলল। সাথে সাথেই গম্ভীর হয়ে গেল। পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠেছে খিদে।

দুজন চুপ হয়ে গেল আবার। কঙ্কার হাতের মুদ্রাটা নিয়ে ভাবছে আদ্রিতা। কেন জানি মনে হচ্ছে ওদের এখানে আটকে পড়ার পেছনে এই জিনিসটার বড় কোনো ভূমিকা আছে। মং সেনকে পাওয়া গেলেই হয়তো এর উত্তর পাওয়া যেত। সে সুযোগ আর আছে বলে মনে হয় না।

গুহায় নীরবতা দানা বাঁধছে। শরীর ক্লান্ত, পেটে খিদে। মনে আতঙ্ক। এরমধ্যেও আদ্রিতা টের পেল কঙ্কা ঘুমিয়ে পড়েছে। নেতিয়ে পড়েছে তার শরীরের উপর। ওর এরকম আরামের ঘুম দেখে আদ্রিতার মনে হলো, ঘুমের চেয়ে নিরাপদ কিছু আর নেই। এরকম পরিস্থিতিতে কঙ্কার ঘুমই বলে দেয় মেয়েটা তার উপর কতটা নির্ভরশীল।

আদ্রিতাও চোখ বুজল। ঘন অন্ধকারে চোখ খুলে তাকিয়ে থাকাটাও অযথা একটা পরিশ্রম। চোখ বুজে আদ্রিতা বাইরের পৃথিবীকে কল্পনা করতে থাকল। সবুজ, হলুদ, লাল, নীল কত রঙ বাইরে। এই গুহার ভেতরটা ধূসর আর কালো। ঠিক তার ভবিষ্যতের মতো।

এখানে এভাবে থাকতে থাকতে একসময় ওরা দুজনই মরে যাবে। ঐ দানবদের দল যদি তাদেরকে নাও মেরে ফেলে, না খেয়েই মারা যাবে দুজন। ব্যাংককের সেই ছেলেগুলো না খেয়ে দশ দিন ছিল। কিন্তু এতদিন ওরা টিকবে না।

আশপাশে কোথাও পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। চোখ খুলে সর্তক দৃষ্টিতে তাকাল আদ্রিতা। অন্ধকারে কোথাও কোনো নাড়াচাড়া চোখে পড়ল না। কঙ্কা এখনও নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছে।

চোখ বুজে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার সাহস হলো না আদ্রিতার। হাতের মুঠোয় লম্বা হাড়ের টুকরোটা শক্ত করে চেপে ধরে সে জেগে রইল।

সময় মাঝে মাঝে স্থির হয়ে যায়। এই মুহূর্তে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে সময় সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই আদ্রিতার। সে শুধু টের পাচ্ছে সারা শরীর জুড়ে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা, ভোঁতা সেই যন্ত্রণায় চিৎকার আসে না বুক

চিরে। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে খুব। মনে হচ্ছে শরীরটা শুধু শুধুই তার আত্মাটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। এই কষ্টের চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

কঙ্কা এখনও ঘুমাচ্ছে। মৃত্যুর মুখোমুখি থেকেও যে মানুষ ঘুমাতে পারে সেটা কঙ্কাকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অন্ধকারে শুধু ওর দেহের উষ্ণতা অনুভব করতে পারছে, এছাড়া এই মৃত্যুপুরীতে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই যেন।

হাতে শক্ত করে ধরে রাখা হাড়ের টুকরোটা আছে। ছোট সেই পাথরের মূর্তিটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল। সেটা ব্যাগ থেকে বের করে আনল আদ্রিতা। মসৃণ পাথরের গায়ে হাত বুলাতে লাগল। মাথার ভেতর, শরীরের ভেতর যে নরম, ভোঁতা যন্ত্রণাটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তাকে, সেটার উপশম হচ্ছে যেন। অদ্ভুত এই মূর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, গুহার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা হিংস্র একদল দানব, এরকম অদ্ভুত একটা পরিবেশে তাকে পড়তে হবে এটা কেউ বললে আগে হেসেই উড়িয়ে দিত। অথচ পরিস্থিতিটা কত বাস্তব! কত নিদারুণ!

আদ্রিতা জানে এখান থেকে বেঁচে আর কখনই ফিরতে পারবে না সবুজ পৃথিবীতে। এখানে একদল হায়নার দল তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে নেবে। এটাই তার পরিণতি। কতগুলো তাজা প্রাণ এভাবে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাবে, কেউ জানতেও পারবে না।

কঙ্কা জেগে উঠেছে। বিড়বিড় করে বলছে কিছু একটা। সম্ভবত ওর মাকে ডাকছে। ঘুম থেকে উঠে এখনও হয়তো বুঝতে পারছে না ঠিক কোথায় আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবে এতক্ষণ স্বপ্নের জগতে ছিল, এখন বাস্তবের দুঃস্বপ্নে ফিরে এসেছে।

ওর গায়ে মৃদু ধাক্কা দিল আদ্রিতা। তাতে যেন সংবিৎ ফিরে পেল কঙ্কা।

'আমরা মারা যাচ্ছি, তাই না রে?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

উত্তর দিল না আদ্রিতা।

'আমার কী মনে হয় জানিস,' কঙ্কা বলল। আদ্রিতা উত্তর দিল না দেখে নিজেই বলে চলল, 'নিয়তিই আমাদের এখানে টেনে এনেছে। মৃত্যু লেখা ছিল, তাই আমরা মরব। তবে আমার একটা আফসোস রয়ে গেল।'

'কী আফসোস?'

'আমি মনে হয় রবিকে পছন্দ করতাম।' কঙ্কা বলল, 'পছন্দ না ঠিক, ভালোইবাসতাম মনে হয়। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'আমার কেন জানি মনে হতো, রবি তোকে বিশেষ পছন্দ করে,' কঙ্কা বলল, 'তাই আর এগোইনি।'

'তোর ধারণা ভুল। এগুলেই পারতি,' আদ্রিতা বলল।

'এগিয়ে লাভ হতো না।' কঙ্কা বলল, 'কতদূর আর যেতাম আমরা। এখানে এই গুহার মধ্যে এসেই আমাদের ভালোবাসার সমাপ্তি ঘটত।'

'তুই বলে দেখতে পারতি।' আদ্রিতা বলল, 'এখন আর আফসোস করে কী হবে।'

'তুই কি ওকে পছন্দ করতি?' কঙ্কা জিজ্ঞেস করল।

কী উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না আদ্রিতা। রবিকে তার কিছুটা পছন্দ ছিল। ছেলেটার প্রতি কঙ্কার মনোভাব বুঝতে সমস্যা হয়নি। তাই কখনই ওকে নিয়ে বিশেষ কোনো চিন্তা মাথায় আনেনি। এখন এই সত্যিটুকু বলারও কোনো মানে নেই।

'না। পছন্দ বলতে সৌমিক, ফারহান আর রবি আমার কাছে একই ছিল, বন্ধু হিসেবে পছন্দ করতাম বলতে পারিস,' আদ্রিতা বলল।

'আমার...' কঙ্কা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওর মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দিল আদ্রিতা। কেন জানি মনে হচ্ছে সে কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছে। খুব কাছাকাছি একটা শব্দ হচ্ছে। খসখস ধরনের শব্দ।

আদ্রিতা টের পেল ঠিক তার ডান পায়ের উপর দিয়ে সরসর করে কিছু একটা উঠে আসছে। শরীর কেঁপে উঠলেও নিজেকে কোনোমতে স্থির রেখেছে। অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও এটা যে একটা সাপ তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। সাপটা বিষধর কি না সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। কাজেই দমবন্ধ করে স্থির হয়ে বসে আছে সে। ঠিক ডান হাঁটুর উপর পর্যন্ত এসে সরসর করে নেমে গেল নিচে। সাপটা বেশ লম্বা, হাঁটু বেয়ে নিচে নামতেও বেশ সময় লাগল। যখন আদ্রিতা টের পেল প্রাণীটা এখন আর ধারে-কাছে নেই তখন সে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

কঙ্কা কিছুই দেখেনি, জানে না, কিন্তু সেও এতক্ষণ প্রায় স্থির হয়ে বসে ছিল।

'কঙ্কা, চল উঠি,' আদ্রিতা বলল।

'কোথায় যাবি?' কঙ্কা বলল।

'জানি না, কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ বসে থাকলে সাপের কামড়েই মারা যাব,' আদ্রিতা বলল, 'চল।'

কঙ্কা কথা বাড়াল না। ওকে হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল আদ্রিতা।

গুহার সেই আলোর রেখাটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার পরিণতি কী হয়েছে সেটা নিজের চোখে দেখেছে। কাজেই এবার অন্য পথ খুঁজতে হবে। এখান থেকে বের হওয়ার একটা পথ যেহেতু আছে, তাহলে অন্য পথও থাকতে পারে। এখানে বসে থেকে বিষধর সাপের ছোবলে যন্ত্রণাময় মৃত্যুর চেয়ে চেষ্টা করে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

যেখানে বসেছিল সে জায়গাটা গুহার অন্য অংশের চেয়ে কিছুটা উঁচু। নামতে বেশ বেগ পেতে হলো দুজনকে।

এখানে গুহার মেঝে সমতল। কঙ্কার হাত ধরে আলোর বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল আদ্রিতা। অন্য হাতে শক্ত করে হাড়টা ধরে রেখেছে।



গুহার দেওয়াল ঘেঁষে হাঁটছে দুজন। শব্দ করছে না একদমই। কঙ্কা এমনিতেই দুর্বল, পায়ে ব্যথা নিয়ে হাঁটতে ওর কষ্ট হচ্ছে। ওকে অবশ্য কোনোভাবেই দোষারোপ করছে না আদ্রিতা। ওরা জানে না ঠিক কোথায় যাচ্ছে, কাজেই দ্রুত যাওয়ারও কোনো মানে নেই। আস্তে ধীরে সবকিছু বুঝে পা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। জানে যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ আসতে পারে। ফারহান, সৌমিক আর রবির মতো প্রাণবান তিনজন ছেলেকে যেভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, তাতে আদ্রিতা আর কঙ্কা তো খুব সহজ শিকার।

গুহাটা ঠিক কতটুকু জায়গা জুড়ে বিস্তৃত তা ধারণা করতে পারছে না আদ্রিতা। শুধু এটুকু বুঝতে পারছে এখন যে অংশটায় আছে এখানে আগে পা রাখেনি। এখানে গুহার দেওয়াল কেমন ভেজা ভেজা। বাতাসে মাটির ভেজা, সোঁদা গন্ধ। গুহার মেঝেও ক্রমে ক্রমে স্যাঁতসেঁতে, শ্যাওলামাখা আর নরম হয়ে আসছে। তাতে খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। স্পোর্টস সুর মতো যে জুতো পরে এসেছে, সেগুলো গুহার মেঝেতে আটকে যাচ্ছে যেন।

দেওয়ালে কান পাতল আদ্রিতা। মনে হলো অনেক দূর থেকে পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ আসছে। শীতকাল এগিয়ে এসেছে, এই সময় পাহাড়ের খাঁজ থেকে বেরিয়ে আসা ঝরনাধারাগুলো ক্ষীণ হয়ে আসে। তবে যে বৃষ্টি হয়েছিল গুহায় আটকে পড়ার আগে, তাতে এই মুহূর্তে পানির ধারা থাকতেও পারে।

কঙ্কা দাঁড়িয়ে পড়েছে। আদ্রিতার হাত শক্ত করে ধরল।

‘একটু থামি, আমি পারছি না,’ কঙ্কা বলল কোনোমতে।

আদ্রিতারও কষ্ট হচ্ছে। কাজেই কঙ্কার প্রস্তাবে সাড়া দিল। এখানে কোথাও বসার সুযোগ নেই। পরনের কাপড় এমনিতেই যথেষ্ট নোংরা

হয়েছে, গুহার মেঝে এমন স্যাঁতসেঁতে সেখানে ঠিক করে বসাও যাবে না। কোনোমতে গুহার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল দুজন। পানি বয়ে যাওয়ার শব্দে পানির তৃষ্ণাটা তীব্র হয়েছে দুজনেরই। মনে হচ্ছে এক বিন্দু পানির অভাবে বুকটা যেকোনো সময় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দুজন। পানি বয়ে যাওয়ার শব্দটা এখনও টের পাচ্ছে আদ্রিতা। ইচ্ছে করছে ছুটে যেতে সেই পানির ধারার কাছে। কিন্তু এটাও জানে পুরো ব্যাপারটাই বিভ্রম হতে পারে। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় মানুষ হেলুসিনেশনে ভোগে। এই সময় অনেক কিছু দেখে, শোনে, যার অস্তিত্ব আসলে নেই।

কঙ্কা উঠে দাঁড়িয়েছে, ওকে দাঁড়াতে দেখে আদ্রিতাও উঠে দাঁড়াল। দেওয়াল ধরে ধরে হাঁটছে, খুব সাবধানে। এই সময় থমকে দাঁড়াল আদ্রিতা। কেন জানি মনে হলো, বিপদ খুব কাছেই। আশপাশে কোথাও মৃদু শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ লুকিয়ে আছে, উঁকি দিয়ে দেখছে ওদের দুজনকে।

এক হাতে লম্বা হাড়, অন্য হাতে মূর্তিটা ধরে আছে, ব্যাগটা কাঁধে ঝোলানো। এই জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। তবু কেন জানি সাথে রেখেছে আদ্রিতা।

হাড়টা শক্ত করে ধরে রেখেছে। কঙ্কা কিছু টের পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। একমনে হেঁটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এভাবে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ওরা এক স্বচ্ছ, সুন্দর, সুবাসিত ঝরনার কাছে পৌঁছে যাবে। নতুন জীবন ফিরে পাবে।

তবে সেটা যে সহজে হওয়ার নয় তা বুঝতে দেরি হলো না আদ্রিতার। আশপাশের শব্দ বেড়েছে। মনে হচ্ছে রবিকে যারা আক্রমণ করেছিল, ওরা এখন ফিরে এসেছে। দলবেঁধে ফিরে এসেছে। কঙ্কা সামনের দিকে মুখ করে হাঁটছে, ওর পেছন দিকটায় বিপরীত দিকে মুখ করে ধীরে ধীরে হাঁটছে আদ্রিতা। এক হাতে উঁচু করে ধরে আছে হাড়টা। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সেও প্রস্তুত।

এইসময় কঙ্কা দৌড় দিল। ঠিক কেন দৌড় দিয়েছে সেটা বুঝতে পারল না আদ্রিতা। তবে কিছু না বুঝলেও ওর পিছু নিল।

এখানে গুহার মেঝে ধীরে ধীরে কাদাময় হয়ে উঠেছে। পরনের জুতোজোড়া দেবে যাচ্ছে। অন্ধ প্রাণীর মতো দৌড়াচ্ছে কঙ্কা। ওকে থামানোর সুযোগ পাচ্ছে না আদ্রিতা। মেয়েটা এমনিতে হাঁটতে পারছিল না ঠিকমতো। এখন এভাবে দৌড়ের শক্তি কী করে পাচ্ছে কে জানে! জীবন-

মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে শরীরও বোধহয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কঙ্কার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

দুজনের দৌড়ানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আদ্রিতা হাঁপাচ্ছে। সরু পথ ধরে দৌড়াতে গিয়ে টের পাচ্ছে সামনের পথ আরও সরু হয়ে আসছে। মাথার উপর গুহার ছাদ ক্রমশ নিচু হয়ে আসছে। উবু হয়ে না দৌড়ালে মাথা ছাদে লেগে যাবে। যে গতিতে দৌড়াচ্ছে এরকম একটা আঘাত পেলে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না।

এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে সরু পথটার একদম শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা। এরপর দুপাশে গুহার দেওয়াল একজায়গায় মিলে গেছে। সেখানে ছোট একটা গর্ত। এই গর্ত দিয়ে ওপাশে যাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে কী আছে কোনো ধারণা নেই। গর্তটাও এত ছোট যে একজন মানুষ পার হওয়া মুশকিল। কিন্তু এসব চিন্তা করার সময় নেই।

কঙ্কা ওর হাতে চাপ দিল। তারপর এগিয়ে গেল গর্তটার দিকে। শুকনো মানুষ কঙ্কা, ওকে খুব একটা বেগ পেতে হলো না গর্তটা পার হতে। এরপর আদ্রিতা এগিয়ে গেল। ব্যাগটা নামাল পিঠ থেকে। তারপর হাড় আর মূর্তিটা গর্তের ওপাশে ছুড়ে দিল কঙ্কার দিকে। দুহাত ঢুকিয়ে দিল প্রথমে, এরপর যখন দুপা গর্তের ওপাশে নিতে যাবে তখন টের পেল বিপদ।

ডান পা আটকে গেছে। বেকায়দা অবস্থায় তাড়াহুড়া করে ঢুকতে গিয়ে ডান পা এমন একটা অবস্থায় আটকে গেছে যে অর্ধেক শরীর গর্তের একপাশে, বাকি অর্ধেক গর্তের অন্যপাশে রয়ে গেছে।

বিপদ একা আসে না। সরু পথ ধরে ওরা যে দৌড়ে আসছে সেটা বুঝতে পেরে আতঙ্কে কেঁপে উঠল আদ্রিতা। ধুপধাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে পুরো গুহা জুড়ে। এরকম বেকায়দা অবস্থায় শিকারকে পেয়ে গেলে ওরা যে তাকে নিয়ে কী করবে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল। কঙ্কা দুহাত ধরে ভেতরের দিকে টানছে তাকে। কিন্তু এতেও সুবিধা হচ্ছে না। কঙ্কার চেয়ে খুব বেশি স্বাস্থ্যবান নয় সে। কিন্তু গর্তটা এতই সরু যে আদ্রিতাকে মাঝপথে আটকে ফেলে ওর স্বাস্থ্যকে কটাক্ষ করছে যেন।

কঙ্কা ওর দুহাত দিয়ে সর্বশক্তিতে আদ্রিতাকে টানছে। দৌড়ের শব্দ কাছে চলে এসেছে। যেকোনো মুহূর্তে ঐ হিংস্র শিকারির দল চলে আসবে। আদ্রিতার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে সে নিজেকে গর্তের ওপাশে নেওয়ার চেষ্টা করল। ডান পা সোজা করার চেষ্টা করেও পারছে না।

বড় করে নিঃশ্বাস নিল এবার। স্থির হওয়ার চেষ্টা করল। আতঙ্কের কারণেই হয়তো আরও বেশি করে আটকে পড়েছে। চোখ বুজে ফারহান,

সৌমিক আর রবির প্রাণময় মুখগুলো ভাবার চেষ্টা করল। ঢাকা থেকে রওনা দেওয়ার সময় ওরা সবাই হাসছিল, খেলছিল। জীবনটা কোথা থেকে কোথায় চলে গেল, হঠাৎ করেই এই দুঃস্বপ্নে বদলে গেল! কে জানত এমন হবে!

চোখ বুজে এসব ভাবতে ভাবতেও আদ্রিতা টের পেল শক্ত একজোড়া হাত তার ডান পা আঁকড়ে ধরেছে। তীব্র এক চিৎকার বেরিয়ে এলো তার বুক চিরে। সেই চিৎকার গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

গর্তটার এপাশে এসে বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আদ্রিতা। যদিও তার চোখ গর্তটার দিকে। বীভৎস একটা মুখ দেখা যাচ্ছে। গর্তটা দিয়ে এপাশে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। কঙ্কার জন্য সহজ হলেও আদ্রিতার জন্য কাজটা ছিল বেশ কঠিন। আর ঐ হিংস্র দানবের জন্য কাজটা আরও কঠিন। কারণ শারীরিক কাঠামোতে ওরা আদ্রিতাদের চেয়ে আকারে অনেক বড়।

মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছে গেলেই সম্ভবত মানুষ তার সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করে। আদ্রিতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার পা ধরে যখন টান দিতে যাচ্ছিল এক দানব, তখনই হঠাৎ ডান পা মুক্ত হয়ে গিয়েছিল আর মুহূর্তের মধ্যে গুহার এপাশে চলে আসতে পেরেছিল। তা না হলে এতক্ষণে ওরা বাকিদের মতো ওকেও ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলত।

কঙ্কা ওর পাশে বসে আছে। দুজনেই তাকিয়ে আছে গর্তটার মুখের দিকে। বীভৎস চেহারার দানবটা চেষ্টা করেই যাচ্ছে। কিন্তু কোনোভাবেই গর্তটা পার হতে পারছে না। অন্ধকারে ঐ হিংস্র মুখটা যতটা সম্ভব দেখে নেওয়ার চেষ্টা করছে আদ্রিতা। মুখটা মানুষের মতোই, কিংবা হয়তো মানুষই। কোনো এক বিচিত্র কারণে এরকম বীভৎস রূপ নিয়েছে। মাথায় এক বিন্দু চুল নেই, ধারালো নাক আর চাপা মুখমণ্ডল। গুহার অন্ধকারে থাকতে থাকতে গায়ের চামড়া কেমন ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে। মুখের চামড়া অমসৃণ, সেখানে অজস্র কাটাকুটির দাগ।

গুহার এই অংশটা বেশ প্রশস্ত। এখনও চারপাশে তাকিয়ে দেখার সুযোগ মেলেনি। মেঝে শক্ত পাথরের, শীতল। এখানে কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। তবে কাছাকাছি কোথাও থেকে পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কঙ্কা আর আদ্রিতা দুজনেই তাকিয়ে আছে গর্তের মুখের দিকে। একটানা অনেকক্ষণ গর্ত দিয়ে এপাশে আসার চেষ্টা করার পর ধীরে ধীরে

বীভৎস মুখটা সরে গেল। এরপর দীর্ঘক্ষণ নীরবতা। এই প্রথমবারের কাছে আদ্রিতার কাছে মনে হলো ওরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে ঐ দানবের প্রবেশের পথ নেই। এই একটা জায়গাই দুজনের জন্য নিরাপদ।

এখানে গুহার ছাদ বেশ উঁচু। দুজনের কেউই মাথা উঁচু করে চলতে পারছে না। অনেকটা উবু হয়ে থাকতে হচ্ছে। এই অবস্থায় চার হাত-পায়ে মেঝের সাথে শরীর মিশিয়ে দিয়ে ওরা দুজনেই সামনের দিকে এগোচ্ছে। কঙ্কা এখনও মাঝে মাঝে গর্তটার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। যদিও আদ্রিতা জানে ঐ পথ নিয়ে এখন আর ভয়ের কিছু নেই।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর আদ্রিতা থমকে গেল। সামনে আর পথ নেই। দুজনের মধ্যে আদ্রিতা সামনে ছিল। হঠাৎ করেই টের পেল হাতে কিছু আটকাচ্ছে না। সামনে শূন্যতা। ফাঁকা। নিকষ অন্ধকার। কঙ্কা তখনও খেয়াল করেনি। এক হাতে ওকে আটকাল আদ্রিতা।

সামনে বেশ বড়সড়ো একটা খাদ। এই খাদ পাড়ি দিয়ে ওপাশে যাওয়ার কোনো পথ খোলা নেই। গুহার ছাদ এখানে আরও নিচু। দমবন্ধ হয়ে আসছে আদ্রিতার। পানি বয়ে যাওয়ার যে শব্দটা আসছে সেটার উৎস এই খাদ। এই খাদের নিচ দিয়ে পানির ধারা বয়ে যাচ্ছে।

পিছু ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। হিংস্র ঐ দানবের দল নিশ্চয়ই গর্তের আশপাশেই আছে। জানে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই ওদের। এখান দিয়েই ফিরে আসতে হবে আবার মূল গুহায়।

কঙ্কা পাশে হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগোলো। ওর হাতে একটা পাথরের টুকরো, সেটা ছুড়ে দিল অন্ধকারে। ওর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারল আদ্রিতা। পাথরের গড়িয়ে পড়ার শব্দ থেকে খাদের গভীরতা বোঝার চেষ্টা করছে। যদিও ওর উদ্দেশ্য সফল হলো না। পাথরের টুকরোটা গড়িয়ে ঠিক কোথায় পড়ল সেই শব্দ কানে এলো না দুজনের কারও। এতে অন্তত একটা ব্যাপার নিশ্চিত হওয়া গেছে। খাদটা অনেক গভীর। এখানে পড়ে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু।

'এখন কী করবি?' জিজ্ঞেস করল আদ্রিতা।

'আমি একটু ঘুমাব,' কঙ্কা বলল, 'খুব ক্লান্ত লাগছে।'

কঙ্কার কথা শুনে বোঝা গেল হাল ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটা। জীবনের বাকি যে সময়টুকু আছে সেটুকু আর কষ্ট করতে চাচ্ছে না। বরং সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতে চাচ্ছে। অবশ্য এছাড়া ভালো কোনো কাজ এই মুহূর্তে চোখে পড়ছে না আদ্রিতার।

মৃত্যু হচ্ছে শেষ ঘুম। তার আগে যদি সাধারণ ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, মন্দ কী! কঙ্কাকে কিছু বলল না। মেয়েটা গুহার মেঝেতে এক হাতে মাথা রেখে চোখ বুজে আছে। বিড়বিড় করে পুরানো একটা গানও গাচ্ছে। ঘুমপাড়ানি গান শেষ কবে শুনেছিল মনে নেই আদ্রিতার। কঙ্কার গানে তার ঘুম আসছে। চোখ জড়িয়ে আসছে। শারীরিক যত দুঃখ-যন্ত্রণা, খিদে আর বন্ধুহারানোর বেদনায় শেষ প্রলেপ হিসেবে এই ঘুমটাই হয়তো কাজে দেবে।

চোখ বুজল আদ্রিতা। অনেক দূরে পানি বয়ে চলার শব্দে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

তবে সেই ঘুম ভাঙতে দেরি হলো না।

ঘুম ভাঙল চাপা একটা শব্দে। শব্দটার উৎস কী হতে পারে বুঝতে পারছিল না আদ্রিতা। ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল ফারহান আর রবি গান গাইছে, তার সাথে হেড়ে গলায় তাল মিলিয়েছে সৌমিক। হঠাৎ করেই সেই গানের মাঝে চেঁচাতে শুরু করেছে কঙ্কা। ওকে নিষেধ করছে আদ্রিতা। কিন্তু মেয়েটা শুনছেই না। চেঁচিয়েই যাচ্ছে। এই চেঁচানোর শব্দেই ঘুমটা ভেঙে গেল যেন।

তবে ঘুম ভেঙে বাস্তবেই কঙ্কার চেঁচানোর শব্দ শুনতে পেল আদ্রিতা। ডান হাত দিয়ে দেখল সেখানে কঙ্কা নেই। জায়গাটা ফাঁকা। খুব কাছ থেকেই কঙ্কার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। দ্রুত ঘুরে তাকিয়ে দম আটকে এলো।

গুহার ভেতর হিংস্র ওরা চলে এসেছে। ওদের একজন কঙ্কাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকজন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে আদ্রিতার দিকে। কঙ্কার চিৎকারে গুহার বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। আদ্রিতা পা দিয়ে লাথি দিচ্ছে ক্রমাগত। তাতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসা হিংস্র প্রাণীটার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। বরং দুহাতে শক্ত করে আদ্রিতার ডান পা ধরে ফেলেছে।

শরীরের সব শক্তি দিয়ে বাঁ পা দিয়ে লাথি দিচ্ছে আদ্রিতা। সেই লাথি গিয়ে মুখের উপর লাগছে। শক্ত জুতোজোড়ার তলার আঘাতে মুখটা রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে হাতের বাঁধন ঢিলে হয়নি। বরং আরও শক্ত হাতে আদ্রিতাকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, কঙ্কার মতো।

এর আগে রবি, ফারহান আর সৌমিকের পরিণতি দেখেছে। কঙ্কারও হয়তো একই দশা হবে। মৃত্যুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত আদ্রিতা। কিন্তু শেষ ঝুঁকিটা সে নিতে চায়।

বাঁ পা দিয়ে ডান পা জাপটে ধরা হাতের উপর প্রচণ্ড জোরে লাথি বসাল আদ্রিতা। তাতে এক মুহূর্তের জন্য হলেও হাতটা ছুটে গেল। এই সুযোগে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল আদ্রিতা।

সামনে অসীম অন্ধকার, অসীম শূন্যতা। পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ। কঙ্কার চিৎকার। এসব অনুভব করতে করতে পড়ে যেতে লাগল আদ্রিতা। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার পূর্ব এই মুহূর্তে তার একটা আফসোস। প্রতিজ্ঞা করেছিল যেভাবেই হোক, বেঁচে থাকবে। কঙ্কাকেও বাঁচাবে। কিন্তু নিজের কাছে কথা রাখতে পারল না। তার আগেই শেষ পরিণতি বরণ করে নিতে হচ্ছে।

আদ্রিতাও চিৎকার করে উঠল। কঙ্কার চিৎকার ছাপিয়ে সেই চিৎকার চারপাশে অনুরণিত হতে লাগল।



শরীর জুড়ে অসহনীয় যন্ত্রণা। মনে হচ্ছিল যন্ত্রণা শরীরের ভেতরে পাক খেতে খেতে মাথার ভেতরের গহীন কোনো কোণে আঘাত করছে। চারপাশ থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসছে, মৃদু সেসব শব্দে মনে হচ্ছে সে বেঁচে আছে সম্ভবত। বিষাক্ত একরকম গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। কীসের গন্ধ এটা? মৃত্যুর? সে কী তাহলে বেঁচে নেই?

মাথার মধ্যে এসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। ধীরে ধীরে চোখ খুলল কঙ্কা। পরিষ্কার বুঝতে পারল না ঠিক কী দেখছে সামনে। সবকিছু কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ একটানা তাকিয়ে থাকার পর কিছুটা স্পষ্ট হয়ে এলো সামনের দৃশ্যটা। ছোট একটা আগুনের শিখা জ্বলছে। তার পাশে কিছু ছায়ামূর্তি। উঠে দৌড় দেওয়ার তাড়নায় দাঁড়াতে গিয়ে টের পেল, নড়তে পারছে না। শক্ত কিছু দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। লম্বা একটা কাঠের খুঁটির সাথে নিজেকে আটকানো অবস্থায় আবিষ্কার করল কঙ্কা। সারা শরীর ঘাম আর রক্তে ভেজা।

আগুনের কাছ থেকে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে। চোখ বুজে ফেলল কঙ্কা। সে জেগে উঠেছে এটা বুঝতে দিতে চায় না। টের পাচ্ছে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে ছায়ামূর্তিটা। তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। চোখ না খুলেও সেই তাকানোটা যেন অনুভব করতে পারছে কঙ্কা।

এরা কারা? কী চায়? ফারহান, রবি, সৌমিককে তো ওরা সুযোগ দেয়নি। আদ্রিতা সেই সুযোগ পায়নি। খাদের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আদ্রিতার শেষ চিৎকার এখনও কানে বাজছে। ওর কথা মনে হতেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল কঙ্কার। এখন পর্যন্ত কঙ্কা বেঁচে আছে আদ্রিতার জন্যই। অথচ নিজেকেই বাঁচাতে পারল না মেয়েটা। অবশ্য সে এভাবে

কতক্ষণ বেঁচে থাকবে তার কোনো ঠিক নেই। ওকে নিয়ে হয়তো এই দানবদের এমন কোনো পরিকল্পনা আছে যা হয়তো আগের সব নৃশংসতাকে ছাড়িয়ে যাবে।

কঙ্কা টের পেল তার মুখের উপর খসখসে হাতের স্পর্শ। নাক, গলা, গাল, কপাল, ঠোঁট এক এক করে সব ছুঁয়ে দেখছে হাতটা। ঐ স্পর্শে রক্তের ছোঁয়া আছে, হত্যা-নৃশংসতা আছে। কঙ্কা কেঁপে উঠছিল ভেতরে ভেতরে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

বেশ কিছুক্ষণ তার পুরো শরীরে হাত চলল নৃশংস দানবটার। এই সময়টার পুরোটা দমবন্ধ করে রেখেছে কঙ্কা। বারবার মনে হচ্ছে এই বুঝি বুক চিরে চিৎকার বেরিয়ে যাবে। কিন্তু একসময় এই যন্ত্রণার শেষ হলো। টের পেল দানবটা উঠে চলে গেছে।

চোখের উপর আগুনের আলোর উত্তাপ টের পাচ্ছিল কঙ্কা। ওরা আশপাশেই আছে, তাই চোখ খুলল না কোনোমতেই। ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ আশা আছে। বন্ধুরা সব মৃত, ওদের সত্যটা পৃথিবীকে জানানোর জন্য হলেও তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

ফারহান, রবি, সৌমিক আর আদ্রিতার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল কঙ্কা। ঘুমিয়ে অনেক অনেক দুঃস্বপ্ন দেখল। প্রতিটা স্বপ্নেই তাকে জীবন্ত অবস্থায় কেটে খেয়ে ফেলছে এই মানবরূপী দানবগুলো।

ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না, খুব সাবধানে অল্প অল্প করে চোখ খুলল কঙ্কা। যে লম্বা কাঠের খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, সেটা বেশ চওড়া আর উঁচু। চারপাশ এখন অন্ধকার। আগুনের শিখা যেখানে জ্বলছিল সেখানে এখন নিভু নিভু আগুন। চারপাশ থেকে শীতল হাওয়া বইছে। উপরের দিকে তাকাল। চমকে উঠল।

দূরে শুকতারা দেখা যাচ্ছে।

তার মানে এখন সে গুহার বাইরে! চারদিকে ভালো করে তাকাল কঙ্কা। হ্যাঁ। সে এখন বাইরে। চারপাশে অন্ধকার বলে তখন খেয়াল করতে পারেনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, চারপাশে ঘন হয়ে আছে গাছপালা। মাঝখানের কিছুটা জায়গা পরিষ্কার আর ফাঁকা।

গুহার বাইরে কীভাবে এলো কোনো ধারণা নেই কঙ্কার। যে গুহা থেকে কোনোদিন জীবিত বের হতে পারবে কি না সন্দেহ ছিল, সেখান থেকে জীবিত বের হয়ে এসেছে। ঐ দানবগুলোই তাকে বের করে এনেছে।

আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কঙ্কা। ভোরের আকাশে শুকতারা দেখতে পাওয়ার মতো সৌভাগ্য আবার হবে কে জানত। আকাশ

ধীরে ধীরে ফরসা হতে শুরু করেছে। চারপাশে পাখির ঝাঁক ডাকাডাকি করছে। নতুন একটি দিনের সূচনা হচ্ছে। কঙ্কা জানে এটা বাইরের পৃথিবীর জন্য নতুন দিনের সূচনা হলেও, তার জন্য হয়তো এটাই শেষ সূর্যোদয়।

পূর্বাকাশে কমলা রঙের সূর্যটা যখন দেখা দিল, কঙ্কা দেখল গাছপালাগুলোর আড়াল থেকে এক এক করে বেরিয়ে এসেছে কিছু অবয়ব। গুহার অন্ধকারে এই অবয়বগুলোই তার বন্ধুদের এক এক করে খুন করেছে। এবার তাকেও খুন করবে।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, গুহার ভেতরে থাকা অবস্থায় কংকর মনে হয়েছিল এই দানবগুলো অন্ধকারের প্রাণী, কিংবা অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তি কিংবা রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা মানবরূপী দানব। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওদেরকে দানব বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওরা বৃক্ষচারী, আদিম কিছু মানুষ। ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই, নিম্নাঙ্গ গাছের পাতা দিয়ে কোনোমতে ঢাকা।

শুকনো, লম্বা অবয়বগুলো এক এক করে কঙ্কার সামনে এসে দাঁড়াল। লম্বাকৃতির মুখমণ্ডলগুলো গুহার অন্ধকারে যতটা ভয়ংকর লাগছিল, এখন ততটা লাগছে না। চোখগুলো বড় বড়, মনে হয় কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে যেকোনো সময়। মুখে সাদা খড়ি দিয়ে রঙ করেছিল সম্ভবত, পানি দিয়ে ধুয়ে এসেছে এখন। তবু মুখের কিছু কিছু জায়গায় সেই সাদা রঙ এখনও লেগে আছে। কালো কালো শরীরগুলোর মাংসপেশিগুলো নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করা পুরুষদের জন্য হয়তো ঈর্ষণীয় বিষয় হবে, কিন্তু কঙ্কার কাছে অবয়বগুলোকে এখনও দানব বলেই মনে হচ্ছে।

ছয়জনের ছোটখাটো একটা দল। এই দলের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা অবয়বটা এগিয়ে এলো কঙ্কার কাছে। হাঁটু গেড়ে বসল।

কঙ্কার মুখটা এক হাতে উঁচু করে ধরল। তাকাতে না চাইলেও ঐ বীভৎস, বিকৃত মুখের দিকে তাকাতে বাধ্য হলো কঙ্কা।

মুখের চামড়ায় অজস্র কাটাকুটির চিহ্ন, গাল বসে গিয়ে হনুর হাড় বেরিয়ে এসেছে। মুখ হাঁ করেছে বলে হলদে, লম্বা, ধারালো দাঁতগুলো দেখতে পেল। বাজে একটা গন্ধ আসছে মুখ থেকে। কঙ্কা টের পেল কিছু একটা বলছে বিকৃত চেহারার মানুষটা।

এরকম ভাষা কোনোদিন শোনেনি, একটা বর্ণও বুঝতে পারল না। তবে এটুকু বুঝতে পারল দলের বাকি সদস্যরা কথাগুলো বুঝতে পেরেছে এবং সবাই একমত প্রকাশ করার জন্য মুখ দিয়ে গো গো করে এক ধরনের শব্দ করল।

বেশ কিছুক্ষণ এক এক করে ওরা ছয়জনই কঙ্কার মুখে, শরীরে হাত বুলাল। মনে হলো বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। সপ্তম ব্যক্তির আবির্ভাব হলো কিছুক্ষণের মধ্যে। এই মানুষটা বেশ বয়স্ক। মাথার চুল সব পাকা। হাতে বড়সড়ো একটা পাথরের টুকরো। কাছে আসতে কঙ্কা বুঝতে পারল ওটা একটা পাথরের মূর্তি। জিনিসটা পরিচিত লাগল তার কাছে। এই মূর্তিটাই রবি আর আদ্রিতার হাতে দেখেছিল। ও সেটা পেয়েছিল মং সেনের ব্যাগে।

মূর্তিটাকে কঙ্কার সামনে রাখল বয়স্ক মানুষটা। এই মানুষটাকে বাকি ছয়জনের মতো ভয়ংকর দেখাচ্ছে না। চোখে-মুখে শান্ত একটা ভাব। দেখে ভয় হলো না, বরং মনে হলো এই লোকটার কাছ থেকে হয়তো সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কঙ্কা কিছু একটা বলতে চাইল। কিন্তু আঙুলে ইশারা করে ওকে চুপ থাকতে বলল লোকটা।

কঙ্কার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে অদ্ভুত ভাষায় কিছু একটা বলল লোকটা। তারপর ওর মাথাটা ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে আনল। এই সময় কঙ্কার ভয় করছিল। কারণ মাথাটা নামানো হচ্ছিল ঠিক মূর্তিটার উপর। পাথরের ঐ মূর্তির সাথে মাথায় আঘাত পেলে মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সেরকম কিছু হলো না। কঙ্কার মাথাটা মূর্তির সাথে ছুঁইয়ে মাথাটা ছেড়ে দিল লোকটা।

মাথা উঁচু করে বসে মনে মনে হাঁপ ছাড়ল কঙ্কা। তবে ওর এই নিশ্চিন্তভাব বেশিক্ষণ রইল না। ছয়জনের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এলো। ওর হাতে ধারালো, বাঁকানো একটা ছুরি। এই ছুরিটা বয়স্ক লোকটার হাতে দিল।

কঙ্কার বুক কাঁপছিল। বুঝতে পারছে কী ঘটতে চলেছে। এই মূর্তিটা নিশ্চয়ই ওদের দেবতা। সেই দেবতার উদ্দেশে ওকে উৎসর্গ করা হবে। হয়তো এই ধারালো ছুরি দিয়ে গলা কেটে ফেলবে শান্তশিষ্ট এই বয়স্ক মানুষটা।

ভয়ে চোখ বুজে ফেলল কঙ্কা।



ছুরি দিয়ে লোকটা নিজের হাতের আঙুল কেটে সেখান থেকে বের হওয়া রক্ত মাখিয়ে দিয়েছে মূর্তিটার মাথায়। হইহই শব্দ করে উঠল বাকি লোকগুলো। শব্দ শুনে চোখ খুলল কঙ্কা। দেখল সে এখনও মারা যায়নি।

এরপরের দৃশ্যটা দেখার জন্য কোনোদিনই প্রস্তুত ছিল না। এক এক করে ফারহান, রবি আর সৌমিকের মৃতদেহ এনে রাখা হলো মূর্তিটার সামনে। রবির চোখ দুটো খোলা। সেই নিষ্প্রাণ চোখের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল কঙ্কা। ঐ চোখে সে নিজের জন্য ভালোবাসা দেখতে চেয়েছিল। তা আর হলো না। ফারহানের দেহটার অবস্থা সবচেয়ে ভয়ানক। ওর শরীর থেকে হাত দুটো আলাদা করে ফেলা হয়েছে। পা দুটোও। সৌমিকের দেহটা অক্ষত থাকলেও মাথাটা যে দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে কঙ্কা। এসব দেহগুলোর মধ্যে আদ্রিতা নেই। হয়তো ওর মৃতদেহ ওরা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি। হয়তো আদ্রিতা ভাগ্যবান, বন্ধুদের মতো নিজের মৃতদেহের উপর কাটাছেঁড়া সহ্য করতে হয়নি।

মৃতদেহগুলো স্তূপ করে সাজিয়ে রেখে বেশ কিছুক্ষণ উৎসব করল নৃশংস মানুষগুলো। কঙ্কার কাছে এরা মানুষ নয়, পশুর চেয়ে ভয়ংকর, দানবের চেয়েও খারাপ কিছু একটা। এদের পেশিবহুল লম্বা ছিপছিপে শরীর, কামানো মাথা, খাড়া নাক, ধারালো চোখ। পার্বত্য অঞ্চলে যে জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বাস করে, কিংবা বার্মার যে মানুষজন দেখে অভ্যস্ত সবাই, তাদের সাথে এদের কোনো মিল নেই। গায়ের রঙ তামাটে, আফ্রিকান বা ইউরোপীয়দের সাথেও গায়ের রঙের মিল নেই। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে উপমহাদেশীয় মানুষদের সাথেও এদের শারীরিক অবয়বের কোনো মিল পাচ্ছে না কঙ্কা। মনে হচ্ছে এরা কোনো ভিন্ন জাতের মানুষ। মানুষের অন্য কোনো প্রজাতি।

লোকগুলোর উৎসব মানে কিছুক্ষণ শরীর দুলিয়ে নাচার চেষ্টা করা এবং ভয়ানক কণ্ঠে আর্তনাদের মতো শব্দ করা। এসব উৎসব শেষ হলো একসময়। কঙ্কা এবার অপেক্ষা করতে থাকল তার মৃত্যুর মুহূর্তের। ঐ মূর্তি বা দেবতার উদ্দেশে বন্ধুদের যেমন উৎসর্গ করা হয়েছে, এবার হয়তো তার পালা। তার সামনে বন্ধুদের মৃতদেহের সামনে এভাবে উৎসব করে ওরা ওকে নিয়ে খেলেছে। মানসিকভাবে ওকে আরও দুর্বল করে তুলেছে।

ভয় পেতে পেতে এখন আর কিছুতে ভয় পাচ্ছে না কঙ্কা। একা ঘুমাতে তার ভয় লাগে, এজন্য এই বড় হওয়ার পরও মা তার সাথে ঘুমায়। ইঞ্জেকশনের সুচকে ভয় পায় সে, ছুরি-কাঁচি থেকে শত হাত দূরে থাকে, যেন কোথাও কেটে না যায়। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ঝগড়া দেখলেই তার কান্না পায়। অথচ গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক ভয়ের স্রোত পাড়ি দিয়ে এসেছে। এখন আর কিছুতেই ভয় হচ্ছে না। মৃত্যুকে সহজে বরণ করে নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হলে, ভয় বলে কোনো কিছুই আর সামনে আসার সাহস পায় না।

এই জিনিসটা এই লোকগুলো হয়তো এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। তাই তাকে ভয় দেখানোর নানা-রকম প্রক্রিয়া ওরা করে গেল। তবে এটাও ঠিক এসব হয়তো নিয়মিতই করে। ওদের দেবতাই হয়তো এরকম, রক্ত ছাড়া তুষ্ট হয় না। কে জানে!

সব আয়োজন, উল্লাস শেষ হলে একজন এসে কঙ্কার বাঁধন খুলে দিল বয়স্ক লোকটার ইশারায়। এবার আমার পালা, ভাবল কঙ্কা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বয়স্ক লোকটার ইশারায় একজন ছাড়া বাকি সবাই কোথায় যেন চলে গেল। কঙ্কার কেন জানি মনে হলো, এই লোকগুলোকে আদ্রিতার খোঁজে পাঠানো হয়েছে। যতক্ষণ আদ্রিতাকে ওরা হত্যা না করবে, ততক্ষণ এরা শান্ত হবে না।

যে লোকটা রয়ে গেল সে কঙ্কার হাত-টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটার হাঁটার গতির সাথে তাল মেলাতে পারছে না কঙ্কা। মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে, সাথে সাথেই তাকে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে লোকটা। সামান্য এটুকুতেই বোঝা যাচ্ছে শরীরে কী আসুরিক শক্তি ধরে লোকটা।

হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছে না কঙ্কা।

যে জায়গাটায় তাকে আনা হয়েছে সেটা ছোটখাটো একটা মাটির ঘর। একজন মানুষ উবু হয়ে কোনোমতে সেখানে ঢুকতে পারে। কঙ্কাকে পেছন

থেকে ধাক্কা দিল লোকটা। বাধ্য মেয়ের মতো উবু হয়ে মাটির ঘরটাতে ঢুকে পড়ল কঙ্কা।

অন্ধকার বলে বুঝতে পারছিল না আসলে ঘরটা কেমন। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার চোখে সয়ে গেল। ঘরটা গোলাকার আর নিচু হলেও ভেতরে অনেকটা জায়গা। ঘরের এক কোণে কেউ একজন বসে আছে বলে মনে হলো কঙ্কার কাছে।

কে ওখানে? এভাবে ঘাপটি মেরে বসে আছে কেন?

অন্ধকার ছায়াটা চার হাত-পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে তার দিকে। চিৎকার করতে গিয়ে কঙ্কা টের পেল তার কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না।



খাদ থেকে পড়ার সময়ই নিশ্চিত মৃত্যুকেই বরণ করে নিয়েছিল আদ্রিতা। কিন্তু যখন শরীরে শীতল পানির স্পর্শ পেল, সাথে সাথেই নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টায় হাত-পা ছুড়তে শুরু করেছিল। পানি খুব গভীর ছিল না। স্বচ্ছ পানি। সাঁতরে পাড়ে পৌঁছতে খুব বেশি কষ্ট হলো না।

আদ্রিতা সাঁতার শিখেছিল। সেই ছোটবেলায় নানা বাড়ির পুকুরে মামাদের কাছে। সেই সাঁতার যে এতগুলো বছর পর কাজে লাগবে তা কে জানত! এই মুহূর্তে সে চোখ বুজে শুয়ে আছে কাদামাখা মাটির উপর। বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এভাবে বেঁচে যাবে তা কল্পনাও করেনি কোনোদিন। কিন্তু বেঁচে আছে।

চোখ খুলে উপরের দিকে তাকাল। যেখান থেকে পড়ে গিয়েছিল জায়গাটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। প্রায় কুড়ি ফুট উপর থেকে পড়েছে। জায়গাটা অন্ধকার বলে এখানে যে স্বচ্ছ পানির একটা ডোবা আছে সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। এই জায়গাটাও উপরের গুহারই একটা অংশ। চারপাশ অন্ধকার। এখানে কোন বিপদ ওত পেতে আছে কে জানে!

কঙ্কা সম্ভবত বেঁচে নেই। বন্ধুদের কেউই আর বেঁচে নেই। ভাবতেই বুকটা খালি খালি লাগল আদ্রিতার। এখান থেকে সে নিজেও বেঁচে ফিরতে পারবে না। বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টাটা দীর্ঘায়িত হচ্ছে শুধু শুধু।

আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর উঠে দাঁড়াল। হয়তো গুহার এই অংশ থেকে বের হওয়ার কোনো না কোনো পথ পাওয়া যাবে। চেষ্টা করতে হবে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে হাঁটুর কাছে। জায়গাটায় হাত দিয়েই বুঝল কেটে গেছে অনেকটা। রক্ত জমে গেছে। এছাড়া শরীরের বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গও যেন বিদ্রোহ করছে একসাথে। মাথার ভেতর ভোঁতা একটা যন্ত্রণা ঘুরপাক খাচ্ছে। কনুইয়ের একপাশ কেটে গেছে কখন টেরই পায়নি। এখন পানির স্পর্শ পেয়ে জ্বলুনি হচ্ছে খুব।

হাড়ের টুকরো আর মূর্তিটা কখন হাত থেকে পড়ে গেছে, কে জানে। এই মুহূর্তে পুরোপুরি নিরস্ত্র আদ্রিতা। নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল।

এখানেও বেশ অন্ধকার। মাঝে মাঝে উঁচু পাথরের স্তূপ। বারবার মনে হচ্ছে সেইসব পাথরের স্তূপের আড়াল থেকে কেউ দেখছে তাকে। ঐসব দানবের দলের অংশ এখানে থাকাটাও বিচিত্র কিছু নয়। যেকোনো সময় হামলা হতে পারে। এখন আর ওদের মোকাবিলা করার জন্য মানসিক কিংবা শারীরিকভাবে প্রস্তুত নয় আদ্রিতা। এখন সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে কোনো ভীরুতা নেই, কাপুরষতা নেই। সেটাই ভবিষ্যৎ। স্বীকার করতে না চাইলেও এভাবেই মরতে হবে, কিছু করার নেই।

হাঁটতে হাঁটতে আদ্রিতা টের পাচ্ছে গুহার পথ বেশ সরু হয়ে যাচ্ছে এবং উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। বাইরের পাহাড়টা কত উঁচু কে জানে! চারপাশে কোনো কিছুর সাড়াশব্দ নেই। আদ্রিতা নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ আর পা ফেলার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ পাচ্ছে না।

খুব সাবধানে হাঁটছে এখন। মাঝে মাঝে থামছে। ডানে-বামে তাকাচ্ছে। কিন্তু কিছু চোখে পড়ছে না। হাঁটতে হাঁটতে খোলা একটা জায়গায় চলে এলো। এখানে গুহার ছাদ মাথার বেশ উপরে। ক্লান্ত লাগছিল বলে একপাশে গুহার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। হাতের কাছে বড়সড়ো একটা পাথরের টুকরো পড়ে আছে। সেটা হাতে নিল। এখন একদম নিরস্ত্র বলা যাবে না তাকে।

টের পেল জ্বর আসছে। শরীর কেঁপে উঠছে প্রচণ্ড শীতে। পরনের কাপড়-চোপড় ভেজা ছিল, শরীরের উষ্ণতায় কিছুটা শুকিয়েছে। গুহার ভেতরটা যথেষ্টই উষ্ণ। এই মুহূর্তে এক কাপ কফি খেতে পারলে খুব ভালো হতো। কঙ্কা খুব ভালো কফি বানায়। এদিক দিয়ে আদ্রিতা বেশ পিছিয়ে আছে। কোনো ধরনের রান্নাবান্নাই তার হাতে ঠিক আসে না। এখানে অন্তত আগুনের ব্যবস্থা করতে পারলেও হতো। আদিম যুগে মানুষ চকমকি পাথর ঘষে ঘষে আগুন জ্বালিয়েছিল। এখানে চকমকি পাথর নেই সম্ভবত, আর থাকলেও সেটা ঘষে ঘষে আগুন জ্বালানোর মতো সামর্থ্য নেই আদ্রিতার। তার এখন ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। এমন একটা ঘুম, যে ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না। এই যন্ত্রণার অবসান হবে তাহলে।

নানা ধরনের স্মৃতি মাথায় উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল আদ্রিতার। এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছে টের পায়নি। ঘুম ভাঙল যখন ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখ খুলে তাকাতেই বুঝতে পারল কিছু একটা ঠিক নেই।

গুহার ভেতরটা অন্ধকার ছিল। কিন্তু এখন আলো দেখা যাচ্ছে। দিনের আলো। ঠিক কোত্থেকে আলো আসছে সেটা দেখার জন্য দ্রুত উঠে পড়ল আদ্রিতা। দ্রুত এগিয়ে গেল।

ডানদিকে গুহার একদম বেশ মাথায় ঢালু হয়ে জায়গাটা উপরের দিকে উঠে গেছে। সেখানেই ছোট একটা ফাঁকা জায়গা। আলো আসছে সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে। আদ্রিতা দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করল। উত্তেজনায় পা পিছলে পড়ে গেল একবার। আবার উঠে দাঁড়াল।

গুহা থেকে বের হওয়ার এটাই একমাত্র পথ। এই সামান্য পথটুকু যেকোনোভাবেই হোক পার হতে হবে। মনের মধ্যে এখনও ভয় আর শঙ্কা কাজ করছে। এর আগে রবিও ঠিক আলোর কাছাকাছি গিয়ে বাঁচতে পারেনি। ওরা হয়তো আশপাশেই ঘাপটি মেরে বসে আছে। ফাঁকা জায়গাটার কাছাকাছি যাওয়া মাত্রই আক্রমণ করবে। তবে এসব ভেবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয় আদ্রিতা। ঝুঁকি নিতেই হবে। খালি হাতে জান বাজি ধরে ঐ ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে উপরের আলো-বাতাসের পৃথিবীতে পা রাখতে হবে।

দৌড় দিল আদ্রিতা। বুকের মধ্যে ধকধক করছে। বারবার মনে হচ্ছে শেষ মুহূর্তে হোঁচট খাবে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। নৃশংস পিশাচের দল তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে নেবে।

দৌড়াতে দৌড়াতে ফাঁকা জায়গার কাছে চলে এলো আদ্রিতা। ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে বাইরের সবুজ পৃথিবীটা কী পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!



ভোরের আলো কী জিনিস সেটা ঢাকায় থাকতে কখনই সেভাবে উপভোগ করা হয়নি। এখানে ভোরের আলো দেখছে কঙ্কা, কিন্তু সেটা উপভোগ করার মতো মানসিক অবস্থা নেই। হাঁটু গেড়ে চুপচাপ বসে আছে মাটির ঘরটার বাইরে। পূর্ব আকাশে কমলা রঙের সূর্যটা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক দূর থেকে কোনো এক শীতল হাওয়া এসে সবগুলো চুল এলোমেলো করে দিয়ে গেল।

কঙ্কা দেখল হাতে একটা কলা নিয়ে এগিয়ে আসছে মানুষটা। মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। মহিলা। শরীরে কোনো কাপড়-চোপড় নেই। কোনো সংকোচও নেই। এটাই ওর কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়তো। তবে মহিলা বলেই দলের বাকি লোকদের মতো ওর চেহারায় নৃশংসতা নেই। বরং মায়াবী একটা ছাপ আছে। সেই ছাপ দেখলে নিজের মা-খালাদের চেহারাটা চোখে ভাসে।

গত রাতে যখন মাটির ঘরটায় ঢুকেছিল এই মহিলা বসেছিল ঘরের কোণায়। কঙ্কাকে দেখে এগিয়ে এসেছিল। আতঙ্কে চিৎকার করতে গিয়েও করতে পারেনি। মহিলা এগিয়ে এসে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত এক ভাষায় কী সব বলেছে তার এক বিন্দু বুঝতে পারেনি কঙ্কা। তবে এটুকু বুঝেছে এই মহিলার কাছ থেকে তার জন্য ভয়ের কিছু নেই। সম্ভবত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার দেখভাল করার জন্যই এই মহিলাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কলাটা হাতে নিয়ে বসে রইল কঙ্কা। প্রচণ্ড খিদে ছিল, সেই খিদে মরে গেছে কখন। এখন ঘোলাটে, ভোঁতা একটা যন্ত্রণা আছে। এই কলাটা খেয়ে সেই যন্ত্রণা মিটবে কি না জানে না। মহিলা ক্রমাগত তাড়া দিয়ে যাচ্ছিল যেন কলাটা খেয়ে ফেলে কঙ্কা। ঝামেলা মেটানোর জন্যই ধীরে ধীরে খোসা ছাড়িয়ে কলাটা খেল। খাওয়ার সময় বারবার রবির মৃতদেহের খোলা চোখ

দুটোর ছবি চোখে ভাসছিল, খাদ থেকে পড়ে যাওয়ার সময় আদ্রিতার চিৎকার কানের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ওর বন্ধুরা সবাই মরে গেছে আর সে একা একা বসে কলা খাচ্ছে। প্রকৃতি কী অদ্ভুত! ওদের বদলে এই মুহূর্তে তারই লাশ হয়ে থাকার কথা। দলের সব সদস্যের মধ্যে দুর্বলতম সদস্যই বেঁচে আছে এখন পর্যন্ত।

ভোর হয়ে গেছে। পাখি ডাকছে, বাতাস বইছে। মাঝবয়সি মহিলাটা আবার কঙ্কার মাথার চুলে হাত বুলাচ্ছে।

ঠিক কখন তাকে উৎসর্গ করা হবে বুঝতে পারছে না কঙ্কা। মনে হচ্ছে এরা কিছু 'রিচুয়াল' বা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। প্রক্রিয়ার কোন ধাপে আছে সেটাও বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে দলের বাকি সদস্যরা হাজির হলো। ওদেরকে খুব একটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কোনো কারণে বিরক্ত। ঘোঁতঘোঁত শব্দ করছিল, নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ওদের নিজস্ব ভাষায়। বয়স্ক লোকটাও এসেছে। লোকটার ইশারায় একজন এসে হাত ধরে দাঁড় করাল কঙ্কাকে। লম্বা, পেটানো শরীরের মানুষগুলোর সামনে এসে নিজের অজান্তেই জড়সড়ো হয়ে যায় সে। এদের চোখে-মুখে নৃশংসতা আছে, লোলুপ দৃষ্টি নেই।

হাত ধরে টানতে টানতে কঙ্কাকে টেনে নিয়ে চলল লোকটা। ঠিক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কোনো ধারণা নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনে তাকাল। দেখল মাথায় হাত দিয়ে মধ্যবয়স্ক মহিলাটা বসে আছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে ছলছল দৃষ্টি। আমার শেষ সময় চলে এসেছে, ভাবল কঙ্কা।

ভাবতে ভাবতে হাঁটছে সে। লোকটার গতির সাথে তাল মেলাতে সমস্যা হচ্ছে। দলের বাকি সদস্যরাও আসছে পেছন পেছন। ওদের সবার হাতে ছোট ছোট ধারালো ছুরি। নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করে শিউরে উঠল কঙ্কা। সবচেয়ে নৃশংস উপায়ে মনে হয় তাকেই খুন করবে এই লোকগুলো।

এসব ভাবতে ভাবতে ছোটখাটো একটা ডোবার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। কঙ্কাকে দাঁড় করাল। এরপর যে ইশারা করল, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না কঙ্কা। চোখের ইশারায় পরনের কাপড় খুলে ফেলতে বলছে লোকটা। এতগুলো বন্যজন্তুর মতো পুরুষ মানুষের সামনে কাপড় খোলা অসম্ভব কাজ। কঙ্কা বসে পড়ল। হাত ধরে তাকে আবার দাঁড় করিয়ে দিল লোকটা। খড়খড়ে গলায় কিছু একটা বলল। সেই ভাষা বোঝার সাধ্য কঙ্কার

নেই, তবু অনুমান করতে পারছে কাপড় না খুললে তার জন্য ভয়ংকর পরিস্থিতি অপেক্ষা করে আছে।

মরতে যখন হবেই তখন অন্তত কিছুটা আত্মমর্যাদা নিয়ে মরা উচিত। কাপড় খুললেও ওরা মারবে, না খুললেও। কাজেই গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কঙ্কা। লোকটা তার উপর হাত তুলতে যাচ্ছিল, বয়স্ক লোকটার বাজখাঁই কণ্ঠের নির্দেশে থেমে গেল। কঙ্কা লক্ষ করল কিছুক্ষণের মধ্যেই বয়স্ক লোকটা ছাড়া আর সবাই চলে গেল। এখন সে একা দাঁড়িয়ে আছে ডোবার সামনে। আর বয়স্ক লোকটা এগিয়ে এলো তার দিকে।ভয়ে পা কাঁপছিল কঙ্কার। শেষ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত।

তবে তেমন কিছু হলো না। বয়স্ক লোকটা ইশারায় কিছু বোঝাল তাকে। শুরুতে বুঝতে না পারলেও ধীরে ধীরে বুঝতে পারল। নিশ্চিত হলো এটা ওদের প্রক্রিয়ার একটা ধাপ। এই ধাপ সম্পন্ন করতে হবে। তবে তাকে আশ্বস্ত করে বয়স্ক লোকটাও চোখের আড়ালে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে রইল কঙ্কা। আশপাশে তাকিয়ে ওদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেল না। এখন কী সে দৌড় দেবে? পালাবে? কাজটা কি খুব বেশি ঝুঁকির হয়ে যাবে না? এরচেয়ে লোকটা যা করতে বলেছে সেটা করাই ভালো হবে সম্ভবত।

পরনের টি-শার্ট খুলে ফেলল কঙ্কা। আর জিন্সের প্যান্টটাও। চারপাশে ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে দ্রুত ডোবায় নেমে গেল। ডোবার পানি বেশ পরিষ্কার আর শীতল। পানিতে নামতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। ছোট ডোবাটার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল। পানিতে ডুব দিয়ে দেখল ডোবার তলায় অজস্র হাড়গোড়, মাথার খুলি। এসব দেখে ধাক্কা খেল তবে ভয় পেল না। ভয় জিনিসটা এখন আর তেমন কাজ করছে না।

ইচ্ছে করছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই পানিতে সাঁতার কাটতে, গা ডুবিয়ে বসে থাকতে। অথচ ডোবার তলায় যা দেখেছে তাতে গা ঘিনঘিন করার কথা। তেমন অনুভূতি হচ্ছে না বলে নিজের উপরই অবাক হলো কঙ্কা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ডোবা থেকে উঠে এসে দ্রুত টি-শার্ট আর জিন্সের প্যান্টটা পরে নিল। ওরা নিশ্চয়ই আশপাশ থেকে দেখেছে ওকে। দেখলেও কিছু করার নেই। এত চমৎকার একটা গোসল করার পর ভোঁতা খিদেটা প্রচণ্ড গতিতে ফিরে এসেছে।

কঙ্কা দেখল কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো দলটা, সাথে বয়স্ক লোকটাও। বেশ সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল লোকটাকে। এবার অন্য একটা লোক কঙ্কার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

ঠিক কোথায় যাচ্ছে এবারও কোনো ধারণা নেই কঙ্কার। তবে বুঝতে পারছে বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে গোসল করানো হয়েছে। দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করার আগে নিশ্চয়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া হয় শিকারকে।

সূর্যের আলোয় চারপাশ এখন আলোময়। দিনের আলোয় চারপাশের সবকিছুই খুব স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে।

কঙ্কা দেখল বেশ শাখা-প্রশাখা ছড়ানো একটা বটগাছের দিকে তাকে নেওয়া হচ্ছে। এই বটগাছটির বয়স কত হবে কে জানে? কত প্রাণ এর পদতলে বলি দেওয়া হয়েছে কে জানে?

বটগাছটার নিচে এসে খুব ভালো লাগল কঙ্কার। রোদ তেতে উঠছিল অল্প অল্প করে আর গাছটার নিচে শীতল ছায়া। বাতাসে গাছের পাতা, শাখাগুলো অল্প অল্প নড়ছিল। গাছের ঠিক গোড়ায় ওদের সেই দেবতার মূর্তি রাখা। কঙ্কাকে মূর্তিটার ঠিক সামনে বসাল লোকটা। কঙ্কা বসল। তারপর ওকে ঘিরে বৃত্তাকারে ওরা সবাই বসল।

বয়স্ক লোকটা বিড়বিড় করে কিছু বলছে। সম্ভবত কোনো ধরনের প্রার্থনা হবে।

কঙ্কা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সব। কিন্তু কিছুই দেখছিল না আবার। সে এখনও রবির মৃতদেহটাকে দেখতে পাচ্ছে, দুচোখ খোলা, নিস্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সৌমিক আর ফারহানের হাসিমাখা মুখগুলো, আদ্রিতার শেষ চিৎকার।

শেষ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত কঙ্কা।



পৃথিবী সুন্দর। বেঁচে থাকা আরও সুন্দর। মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো আনন্দময় আর কিছু নেই। আদ্রিতা যখন ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে বেরিয়ে এলো, তখন তার মাথার মধ্যে এই কথাগুলোই খেলা করছিল।

এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে জানে না আদ্রিতা। শুধু জানে গুহার বিভীষিকাময় অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েছে। আর কোনোদিনই সে ঐ গুহার অন্ধকারে ফিরে যাবে না।

চারপাশে পাখি ডাকছে, সকালের স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। পরনের নোংরা কাপড়-চোপড় শরীরে অসহ্য লাগছিল। কোথাও একটু পানি পাওয়া গেলে ভালো হতো। কিন্তু কোথায় আছে, কোথায় যাচ্ছে কোনো ধারণা নেই আদ্রিতার।

ধীর পায়ে খুব সাবধানে ডানে-বামে তাকাতে তাকাতে এগুতে থাকল আদ্রিতা। এখানে চারপাশে সব সবুজ। পাখির কলকাকলিতে মনোরম একটা পরিবেশ। অথচ এর পাশেই লুকিয়ে আছে ভয়ংকরতম অন্ধকার এক জগৎ। সেই জগৎ থেকে সদ্য মুক্তি পেয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

জায়গাটার দিকে ভালো করে তাকাল। পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় আছে। এটুকু নিশ্চিত ঠিক যে গুহায় ওরা ঢুকেছিল, সেখান থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। এত দূরে এসেছে পথ চিনে সেখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এখানে আশপাশে নিশ্চয়ই মানববসতি আছে। সেখানে সাহায্য চাইলে নিশ্চয়ই সে আবার নিজের জগতে ফিরতে পারবে। কিন্তু বসতি কোথায়? চারদিকে তাকিয়ে মানুষের কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আদ্রিতা টের পেল এখানে পায়ে হাঁটা কোনো পথ চোখে পড়ছে না। মানুষ থাকলে পায়ে হাঁটা পথ থাকবে। তার মানে এখানে কেউ আসে না, কারও আসার প্রয়োজন পড়ে না। গাছগুলো কমবেশি চেনে। বেশিরভাগই গর্জন, সেগুন এই ধরনের গাছ। মাঝে

মাঝে কিছু ফলের গাছ যেমন— আম গাছ, জাম গাছও চোখে পড়ছে। এখন ফলের সময় নয় বলেই কোথাও কোনো ফলের চিহ্ন চোখে পড়ছে না।

ঝোপঝাড় আর গাছগাছালির মাঝ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে বারবার শরীরের এখানে-সেখানে খোঁচা লাগছে। এমনিতেই শরীরের অনেক জায়গা কেটে ছড়ে গিয়েছে। নতুন এইসব আঘাতে এখন আর তেমন কষ্ট পাচ্ছে না।

আশপাশে কোথাও পানির উৎস আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা কোথায় কোনো ধারণা নেই। খিদেও পেয়েছে। মাথার উপর সূর্য সর্বোচ্চ শক্তিতে তাপ ছড়াচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেছে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার মতো তেমন কোনো জায়গা চোখে পড়ছে না।

ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে খোলা একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল আদ্রিতা। ঘাসগুলো এখানে বেশ উঁচু, কার্পেটের মতো বিছানো। একপাশে বড় একটা আমগাছ। সেই গাছের তলায় গিয়ে হেলান দিয়ে বসল। আশপাশে তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এমন একটা জায়গায় চলে এসেছে যার সাথে বাইরের পৃথিবীর কোনো যোগাযোগ নেই। মানুষজনের কোনো চিহ্ন এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি, পাখি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর দেখাও মেলেনি এখন পর্যন্ত।

ক্লান্ত শরীরে কঙ্কা, রবি, সৌমিক আর ফারহানের কথা ভাবছিল আদ্রিতা। এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন চোখ খুলেই বুঝল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ক্লান্ত শরীর বলেই হয়তো অনেক বেশি ঘুমিয়েছে। এরকম খোলা একটা জায়গায় এভাবে ঘুমানোটা মোটেই নিরাপদ কাজ ছিল না। বিপদ-আপদ হতে পারত।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল আদ্রিতা। খিদেয় চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে। কিন্তু এখানে খাবারের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। লোকালয় নেই। মানুষজন নেই। এখানে থাকলে একসময় না খেয়েই মরে যাবে। অন্য কাউকে কিছু করতে হবে না।

হাঁটতে শুরু করল আবার। আকাশে চাঁদ আছে। সেই আলোয় কোনোকিছুই তেমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। ঝিঁঝি পোকা আর ব্যাঙের ডাকে কানে তালা লাগার জোগাড়। সাপ-খোপ নিশ্চয়ই আছে ঝোপে-ঝাড়ে। তাই যতটা সম্ভব সাবধানে পা ফেলছিল।

ঠিক কতক্ষণ হেঁটেছে আন্দাজ করতে পারছে না, কিন্তু একসময় টের পেল সে সামনের দিকটা ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে গেছে। ওখানে কি

কোনো লোকালয় আছে? ঘন গাছপালা ছাড়া আর কিছুই অবশ্য চোখে পড়ছে না।

ঢালটা খাড়া নয়, ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে পারছে তাই। এখানে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঘাস, হাঁটতে গিয়ে সরসর শব্দ হচ্ছে। বারবার ভয় হচ্ছে এই বুঝি সাপের উপর পা দিয়ে বসল। এই প্রাণীটাকে সে দারুণ ভয় পায়।

ঢালের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল আদ্রিতা। ছোট একটা আলোর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে দূরে। চোখের ভুল কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্য হাত দিয়ে চোখ দুটি মুছে নিল। আবার তাকাল।

হ্যাঁ, আলো দেখা যাচ্ছে। তবে বৈদ্যুতিক বাতির আলো নয়। হ্যারিকেন বা কুপিবাতির আলো হতে পারে। আলো মানেই সেখানে মানুষ আছে। আর এই মুহূর্তে মানুষের সন্ধান পাওয়া মানেই মুক্তি, প্রাণ নিয়ে ঢাকায় ফেরার সুযোগ। একই সাথে সাবধান হওয়ারও ব্যাপার আছে। মানুষ মানেই তাকে বিশ্বাস করতে হবে তা নয়। একা একটা মেয়ে মানুষকে হাতের কাছে পেলে মানুষ যে কত হিংস্র হতে পারে, তা প্রতিদিনই খবরের কাগজে উঠে আসে।

আদ্রিতার ইচ্ছে করছিল দৌড় দিতে। কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছে না। এছাড়া মনের মধ্যেও একটা সর্তকতা কাজ করছে। যে বা যারা ওখানে আছে, দূর থেকে আগে দেখবে তাদের। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে সাহায্য চাইবে কি না। এতদূর একা একা এসেছে, আরও বহুদূর যেতে হলে যাবে। কিন্তু ভুল মানুষের হাতে পড়া যাবে না।

আদ্রিতা হাঁটতে থাকল। ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে হচ্ছে বলে এখন আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না। এছাড়া চমৎকার একটা বাতাসও বইছে। বাতাসে চুল উড়ছিল বলে চুল বেঁধে নিল।

আলোটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আদ্রিতার আশা বাড়ছে।

ছোট একটা কুঁড়েঘর। একপাশ খোলা, তিনদিকে বাঁশ দিয়ে আটকানো। সেখানে কেউ একজন শুয়ে আছে। কুপিবাতির আলোয় মানুষটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চিনতে সমস্যা হলো না আদ্রিতার।

মং সেন মারমা!

জীবিত আছে এবং বহাল তবিয়তেই আছে। ওকে দেখেই দৌড়ে ওর কাছে যেতে চাওয়ার ইচ্ছেটা কোনোমতে নিয়ন্ত্রণ করল, আগে দূর থেকে দেখা যাক। একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল আদ্রিতা, এখান থেকে সব বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে বসল মং সেন। একটা কাচের বোতল থেকে পানি ঢেলে খেয়ে নিল ঢকঢক করে। ওটা যে পানি নয়, মদ, দূর থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারল আদ্রিতা। মদ খেয়ে হেলেদুলে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘরটা থেকে বেরিয়ে একটু সামনে এসেই জল বিয়োগ করতে লাগল। দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে মদ খেয়ে একদম মাতাল হয়ে আছে মং সেন। নিজেদের ভাষায় কোনো একটা গানও গাচ্ছে।

জল বিয়োগ শেষে আবার কুঁড়েঘরে ঢুকল মং সেন। বসে বসে কিছু একটা দেখছে। দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল না জিনিসটা কী, তাই ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল আদ্রিতা।

মং সেনের হাতে গোলাকার একটা বস্তু। কুপিবাতির আলোতেও এটা পরিষ্কার যে হলদে রঙা গোলাকার জিনিসটা আর কিছু নয়, স্বর্ণ! এটা কী কোনো ধরনের স্বর্ণমুদ্রা! কিন্তু তা কী করে হয়?

এই মানবজনহীন এলাকায় স্বর্ণ পেল কীভাবে? মং সেনকে শুরু থেকেই পছন্দ ছিল না। এখন একটা সন্দেহ মনের মধ্যে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল।

তাদের এই অবস্থার জন্য এই লোকটাই দায়ী। গুহাতে ওরা আটকে পড়েনি, এই মং সেন তাদের আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছে। কীভাবে করেছে, কেন করেছে এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও আদ্রিতার কাছে নেই। কিন্তু উত্তরগুলো খুব দ্রুতই সে বের করে আনবে। তার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

ঝোপের আড়াল দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আদ্রিতা।



বটগাছের নিচে প্রায় ঘণ্টাখানেক কঙ্কাকে বসিয়ে রাখা হলো। দুপুরের চড়া রোদে বাইরেটা যখন পুড়ে যাচ্ছিল, বটগাছের ছায়ায় তখন চোখ বুজে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল কঙ্কা। শেষ মুহূর্তে এসে তার আফসোস হচ্ছিল না কোনো কিছুর জন্য। চমৎকার শীতল একটা পরিবেশে মরতে যাচ্ছে। বাকিদের তুলনায় ভাগ্য ভালোই বলতে হবে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর কঙ্কাকে হাত ধরে ঝাঁকি দিল ওদের একজন। চোখ খুলে তাকিয়ে কিছুটা থমকে গেল। সামনে থরথরে কলা আর পেয়ারা রাখা, এছাড়া অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে আছে কয়েকটা মৃত চড়ুই পাখি, ছাল-চামড়া ছাড়ানো, দুটো ইঁদুর, একটা খরগোশ। মৃত প্রাণীগুলোর শরীরগুলোতে রক্ত লেগে আছে এখনও। ওরা সম্ভবত ওদের সবচেয়ে চমৎকার সব খাবার ওর সামনে হাজির করেছে। মৃত্যু পথযাত্রীকে এভাবে অতিথি আপ্যায়ন করা হবে এটা কল্পনাও করেনি। কলা আর পেয়ারা ছাড়া আর কোনো খাবারে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। পেয়ারাগুলো বড় নয়, ছোট দেশি পেয়ারার মতো। ভেতরটা একদম গোলাপি রঙের। খেতে খুব ভালো লাগছিল। দেখতে দেখতে দশ-বারোটা পেয়ার আর এক হালি কলা খেয়ে ফেলল কঙ্কা। ওরা সবাই ওর খাওয়া দেখছিল। কঙ্কা শুধু কলা আর পেয়ারা খাচ্ছে, অন্যান্য খাদ্যে হাত দিচ্ছে না দেখে ওদের কাউকে কাউকে হতাশ বলেও মনে হলো। কিন্তু বয়স্ক লোকটার কারণে কেউ সেই হতাশা প্রকাশ করতে পারছে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে কঙ্কা দেখল বাঁশের চোঙ নিয়ে এসেছে ওদের একজন। পানি খাওয়ার জন্য বুকটা হাঁসফাঁস করছিল। বাঁশের চোঙের মধ্যকার টলটলে পানি ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। খেয়েই টের পেল গলা জ্বলে যাচ্ছে। পানির মতো দেখতে তরলটা ধারালো ছুরির মতো গলা বেয়ে সব কাটতে কাটতে যেন পাকস্থলীতে পৌছল। এটা নিশ্চয়ই কোনো ধরনের

মদ হবে। কিন্তু কঙ্কার দরকার পানি। ওরা সম্ভবত কঙ্কার বিপর্যস্ত চেহারা দেখেই আরেকটা বাঁশের চোঙ এগিয়ে দিল। খুব সাবধানে ভেতরে থাকা তরলটা পান করল কঙ্কা। এটা পানি। বেশ সুস্বাদু পানি বলা যায়। এরকম পানি সে অনায়াসে তিন-চার বোতল খেয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু তার জন্য বরাদ্দ এটুকুই।

হিংস্র লোকগুলোকে গতকালকের চেয়ে আজকে একটু কম হিংস্র দেখাচ্ছে। এর কারণ সম্ভবত চোখে-মুখে ওরা যে সাদা খড়ির দাগ দিয়ে রাখে, সে দাগগুলো মুছে ফেলেছে। ওরা সবাই এক দৃষ্টিতে কঙ্কার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কিছু একটা খুঁজছে ওর মধ্যে।

কী খুঁজছে সেটা বুঝতে পারছে না কঙ্কা। তবে এটা বুঝতে পারছে তার মাথা হঠাৎ করেই কেমন ঘুরছে। সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে ঘূর্ণায়মান মনে হচ্ছে। শুধু ওরা নয়, পুরো পৃথিবীটা পাক খাচ্ছে যেন তাকে কেন্দ্র করে। বুকটা একদম হালকা হয়ে গেছে। চোখের সামনে কিছু রঙিন প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেসব প্রজাপতির স্বচ্ছ আয়নার মতো ডানায় কঙ্কা নিজের মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ভালো লাগছে সবকিছু। উড়তে ইচ্ছে করছে। কঙ্কা টের পেল তার পিঠে যেন পাখা বের হচ্ছে অল্প অল্প করে। সে উঠে দাঁড়াল। টের পেল পিঠের পেছনের পাখা দুটো ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। তার পরনে সাদা গাউন, গলায় ঝকমকে মুক্তার মালা। মাথায় রুপালি রঙের একটা মুকুট, মুকুটের মাঝখানে জ্বলজ্বলে একটা হীরার টুকরো। সেই টুকরোতে সূর্যের আলো পড়ে চারপাশ ঝিকমিক করে উঠছে।

পাখাগুলো এখন অনেক বড়। তার পিঠের দুপাশে ছড়িয়ে আছে। কঙ্কা হাসছিল। এত প্রাণখোলা হাসি সে কতদিন হাসে না। শেষবার হেসেছিল রবির সাথে, ফারহানের সাথে, আদ্রিতার সাথে। কিন্তু ওরা তো আর নেই। ওদের কথা মনে রেখে কী হবে? এখন হাসতে হবে নিজের জন্য। এখন সে আর বাকিদের মতো নেই। সে এখন রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াবে।

উড়ে বেড়ানোর জন্য দুপাশের ডানা ঝাপটাতে শুরু করল কঙ্কা। তারপর একসময় অনেক দূরে উড়ে গেল।

বাস্তবে কঙ্কার জ্ঞানহীন দেহটা ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেছে তখন। বয়স্ক লোকটার ইশারায় কয়েকজন মিলে কঙ্কার জ্ঞানহীন দেহটাকে তুলে নিল। তারপর ওকে শুইয়ে রাখা হলো সেই নিচু মাটির ঘরটাতে। যেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল সেই মধ্যবয়স্ক মহিলাটি। ওরা সবাই জানে

কঙ্কার ঘুম ভাঙবে না সহজে। তাই ওরা সবাই নিজেদের কাজে ফিরে গেল। বাকি একটা মেয়ের খোঁজে ওরা তন্নতন্ন করে ফেলছে সবকিছু। যতক্ষণ ঐ মেয়েকে জীবিত বা মৃত উদ্ধার না করতে পারবে, ততক্ষণ ওদের বিশ্রাম নেই।

ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল কোনো ধারণা নেই কঙ্কার। নিচু মাটির ঘরটাতে নিজেকে আবিষ্কার করে বেশ অবাক হলো। তার মাথার কাছেই উবু হয়ে বসেছিল মধ্যবয়স্ক মহিলাটি। তাকিয়েছিল মুখের দিকে। কঙ্কা জেগে উঠেছে দেখে কিছু একটা বলল, সে কথার কোনো অর্থ বোঝা সম্ভব নয় কঙ্কার পক্ষে।

রাত হয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঘর থেকে বেরোনো দরকার। মহিলার দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকাতেই মহিলা ওর সমস্যা বুঝতে পারল। ওকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরে বেশ আলো। চাঁদ উঠেছে। যদিও পুরো পূর্ণিমা নয়। হয়তো দুই-একদিনের মধ্যে পূর্ণিমা, ধারণা করল কঙ্কা। মহিলার পেছন পেছনে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে কোনোমতে ঝামেলাটা মেটাল।

সকালে বাঁশের চোঙে যে তরল পদার্থ খেয়েছিল, ওর মতো শক্তিশালী মদ বোধহয় আর নেই। এত অদ্ভুত কল্পনা মাথায় এসেছিল! এই জিনিসের খোঁজ পেলে শহরের মানুষরা তো পাগল হয়ে যাবে। একই সাথে জিনিসটা ওষুধের কাজও করেছে। ঝরঝরে অনুভব করছে। শারীরিক যে ক্লান্তি, ব্যথাবোধ ছিল সব এক নিমিষেই যেন মিলিয়ে গেছে। জিনিসটা খেতে বিস্বাদ, তবে কার্যকরী, তাতে সন্দেহ নেই। যে মানুষটাকে ওরা যেকোনো সময় দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করবে তাকে এরকম তরতাজা বানিয়ে কী লাভ সেটা বুঝতে পারছে না। হয়তো দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়ার জন্য নীরোগ, তরতাজা পশু বা মানুষ বেছে নেওয়ার নিয়ম রয়েছে, ভাবল কঙ্কা।

খুব বাতাস বইছে। হাওয়ায় চুল উড়ছে কঙ্কার। ওদের কাউকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। ওরা সম্ভবত গুহায় থাকে, কিংবা ওদের থাকার জায়গা আলাদা। ওরা আশপাশে নেই বলেই মানসিকভাবে নিজেকে কিছুটা মুক্ত অনুভব করছে। চাইলে কী তবে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া যাবে? মধ্যবয়স্ক ঐ মহিলা কি তাকে তাড়া করে ধরতে পারবে? কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? চারপাশে গাছপালা আর উঁচু-নিচু পাহাড়ের সারি। এসবের মাঝে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল। তবু পালিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা দূর করতে পারল না কঙ্কা।

কিছুটা দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করছে মধ্যবয়স্ক মহিলাটি। হয়তো টের পেয়েছে কঙ্কার গোপন অভিসন্ধি। শারীরিক কোনো কসরত করতে ভালো লাগে না কঙ্কার। হাঁটাহাঁটি পর্যন্তই সার। দৌড়াদৌড়ি কখনো করেনি। কাজেই দৌড় দেবে কি না এ নিয়ে এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। তবে তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হয়ে গেল যখন দেখল পুরুষদের মধ্যে অল্পবয়স্ক একজন দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছে। এত দূর থেকেই লোকটার তাকানোতে অস্বস্তিবোধ করতে থাকল কঙ্কা।

পালানোর চিন্তা করাই যাবে না, আপাতত। এরচেয়ে ভালো মানুষের মতো চুপচাপ থাকাই ভালো। তাই দ্রুত পায়ে মাটির ঘরের দিকে হাঁটতে থাকল কঙ্কা। পেছনে মধ্যবয়স্ক মহিলাটিও আসছে।



এখানে পৌঁছতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে রফিককে। গুলটু মিয়ার কাছ থেকে এখানে আসার পথ সম্পর্কে জেনেছিল। তখন মনে হয়েছিল খুব কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু আসতে গিয়ে টের পেয়েছে, জায়গাটায় পৌঁছনো আসলেই বেশ কঠিন কাজ।

মায়ানমারের সীমানার এপারের জায়গাটায় অদ্ভুত কারণেই লোকজন নেই। কোনো সীমান্তরক্ষী নেই। টানা সপ্তাহখানেক হেঁটে এখানে পৌঁছেছে। অবশ্য দিনের বেলায় হাঁটেনি, রাত হলেই কেবল বের হয়েছে। ডান পায়ে বেশ বড়সড়ো একটা গর্ত হয়ে গিয়েছিল ছোরার আঘাতে। সাথে স্যাভলনের বোতল থাকায় রক্ষা পেয়েছে। না হলে হয়তো ঘা হয়ে পচে যেতে পারত পা। কেটে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না।

সাথে থাকা শুকনো খাবার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। জঙ্গলে থাকা ফল-মূলই আপাতত প্রধান খাবার। ভাত-মাছের স্বাদ ভুলতে বসেছে চিরকালের জন্য। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে যে কেউ জঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দা বলে ভুল করতে পারে। পরনের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে গেছে, প্যান্টের যা-তা অবস্থা। সাথে যে ব্যাগটা নিয়ে এসেছিল সেটাও কোথাও হারিয়ে গেছে।

তবে মানুষজন নেই বলেই জায়গাটা নিরাপদ। কেন মানুষজন নেই সে ব্যাপারে মাথা খাঁটিয়েও কিছু বের করতে পারেনি। দিন-কাল এমনিতে খুব খারাপ যাচ্ছে না। শুধু বারবার গুলটু মিয়ার চেহারা চোখের উপর ভাসে। স্বর্ণমুদ্রাগুলোকেও বেশ কয়েকবার স্বপ্নে দেখেছে। এছাড়া সেই ছেলেটা আর তার হাতে আঁকা মূর্তির ছবিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মূলত ঐ ছেলেটার কারণেই সে দেশ ছাড়া। ওকে কোনোদিন হাতের কাছে পেলে দেখে নেবে। এর আগের বার আচমকা মুখোমুখি হয়ে যাওয়াতে সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু এরপর আর ছাড়বে না।

এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল রফিক। বয়স হয়েছে, তবে দীর্ঘ বেশ কিছুদিন জঙ্গলে একা একা থাকার ফলেই কি না তার শরীর এখন প্রায়

মেদমুক্ত, ঝরঝরে। আগে কিছুটা পথ হাঁটতেই হাঁপিয়ে যেত, এখন সেরকম হয় না। নিজেকে বেশ তরুণ লাগে। মাঝে মাঝে নিজেকে রবিনসন ক্রুসো মনে হয়। পার্থক্য হলো রবিনসন ক্রুসো জনমানবহীন দ্বীপে আটকে পড়েছিল, আর সে নিজ থেকে বন্দি হয়ে আছে জনমানবহীন এক জঙ্গলে।

খাবার জোগাড়ের কাজটা দিনের মধ্যেই সেরে নেওয়ার চেষ্টা করে রফিক। সন্ধ্যার পর নিরাপদ কোনো আশ্রয় খুঁজে নেয়। তবে আজ সন্ধ্যা হয়ে এলেও নিরাপদ কোনো আশ্রয় খুঁজে পায়নি বলে বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। এমনিতে বড় একটা গাছের উপর মাচা তৈরি করে নিয়েছে একটা, কিন্তু সে জায়গাটা বেশ দূরে ফেলে এসেছে। এখন ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। আশপাশে কোথাও ভালো একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে রাত কাটানোর জন্য। এরপর আর নিজের মাচা থেকে খুব দূরে কোথাও যাবে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল রফিক। জীবন নিয়ে। এমনিতে সে একা একাই থেকেছে এতগুলো বছর। এখনও একা থাকতে তার কোনো সমস্যা নেই। শুধু সাথে করে এতদিনের জমানো বইগুলো নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো। এত এত বই শুধু কেনা হয়েছে, পড়া হয়নি। সে বইগুলো পড়ে ফেলা যেত।

এসব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। খুব সাবধানে হাঁটছে রফিক। এরমধ্যে হঠাৎ দূরে একটা আলো চোখে পড়ল। এতগুলো দিন এখানে এসেছে আগুন বা আলো চোখে পড়েনি। আগুন বা আলো মানেই মানুষ। তার মানে কেউ না কেউ ওখানে আছে। গতি বাড়াল, তবে নিজেকে গাছের আড়ালে রাখতে ভুলল না। যে বা যারা আছে তারা কেমন মানুষ কে জানে! এখন আর কাউকেই বিশ্বাস হয় না।

বেশ কিছুদূর গিয়ে ছোট কুঁড়েঘরটা চোখে পড়ল। সেখানকার বাসিন্দাকে দূর থেকে দেখেও চিনতে ভুল হলো না। ঐ ছেলেটা! বাহ! একদম হাতের নাগালে!

শারীরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী এখন রফিক, তবে সরাসরি আক্রমণে যাবে না। আক্রমণ করতে হবে লুকিয়ে, যাতে নিজেকে বাঁচানোর কোনো সুযোগ না পায় ছেলেটা।

অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। সময় কাটতে থাকল। নিজেকে শিকারের অপেক্ষায় থাকা ধূর্ত শিকারি মনে হতে লাগল রফিকের কাছে। সাথে রিভলভারটা আছে। ওটা কাজ করবে কি না কে জানে। তাই ঝামেলা এড়াতে লম্বা একটা গাছের ডাল সবসময় তার হাতে থাকে। আত্মরক্ষার

জন্য। এই ডাল দিয়ে ঠিক মাথার মাঝখানে জোরে একটা আঘাত করতে পারলেই হলো। এক আঘাতেই ওকে শেষ করে দিতে পারবে কোনো সন্দেহ নেই। আর তা না হলে রিভলভারটা শেষ ভরসা।

সময় কাটতে লাগল। দূর থেকে ছেলেটার কার্যকলাপ দেখল বেশ মনোযোগ দিয়ে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ওর কাছে ধারালো কোনো অস্ত্র থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আরও নিরাপদ সময়ের জন্য অপেক্ষা করা ভালো। সময়ের অভাব নেই রফিকের হাতে।

ছেলেটা যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে। কিন্তু থমকে দাঁড়াল। দেখল ঝোপের আড়াল থেকে একটা মেয়েও বেরিয়ে এসেছে। ছেলেটার দিকে যাচ্ছে। ওর উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। এই মেয়ে এখানে কী করছে? কোত্থেকে এলো? মেয়েটা কী ঐ ক্যাম্পে থাকা ছেলেমেয়েগুলোর কেউ! ওদেরকে দূর থেকে দেখেছিল কয়েকবার। কাছে যাওয়া হয়নি।

মেয়েটার উদ্দেশ্য কী বোঝা যাচ্ছে না। তাই আবার আড়ালে চলে গেল রফিক। সময়মতো সে উপস্থিত হবে। এখনও সময় আসেনি সম্ভবত।



দীর্ঘক্ষণ ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আদ্রিতা। সাপের ভয়টাই বেশি হচ্ছিল। সমস্যা হচ্ছিল মশায়। বেশ বড়সড়ো আকারের জংলি মশা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কামড়ে গেছে একাধারে। কিন্তু মং সেন যেন কিছু টের না পায়, তাই নিঃশব্দে সব সহ্য করে গেছে এতক্ষণ। এখন আর পারল না। ঝোপের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো।

মং সেন ঘুমিয়ে কাদা। হাত-পা ছড়িয়ে খুব আরাম করে ঘুমাচ্ছে। উবু হয়ে মাঝামাঝি আকারের একটা পাথরের টুকরো তুলে নিল আদ্রিতা। তারপর এগিয়ে গেল মং সেনের ঘরের দিকে।

চাঁদের আলোয় বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। পা টিপে টিপে মং সেনের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘুমের মধ্যে কীসব বিড়বিড় করছে, মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ছে। মদ খেয়ে বেশ ভালোই মাতাল হয়েছে। শরীরের উপর খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ নেই এখন। ওকে কীভাবে কাবু করা যায় সেটা ভাবছিল। ঘরটার ভেতরে ঢুকল। দড়ির মতো কিছু দরকার। কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। পাথরের টুকরোটা হাতে আছে, ওটা অস্ত্র হিসেবে একবারই ব্যবহার করা যাবে। অন্য কিছু দরকার। কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ছে না।

ঘরের এক কোণায় ছোটখাটো একটা মাটির চুলো। চুলোর পাশে কিছু হাঁড়ি-পাতিল আছে, আর ছোট একটা বঁটি। লোহার তৈরি বঁটিটা হাতে তুলে নিল আদ্রিতা। ধার পরীক্ষা করে দেখল আঙুল দিয়ে। বেশ ধারালোই মনে হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে এখানে মাঝে মাঝেই আসে মং সেন। নিজেই রান্নাবান্না করে খায়।

এক হাতে পাথরের টুকরো, অন্য হাতে ধারালো বঁটি নিয়ে মং সেনের মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। লোকটাকে এখন বেশ নিষ্পাপ দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বড় আকারের একটা শিশু ঘুমিয়ে আছে। এসব ভাবা যাবে না,

মনে মনে বলল আদ্রিতা। তার চার বন্ধুর নৃশংস মৃত্যুর জন্য দায়ী লোকটার জন্য কোনো ধরনের মায়া নয়, ক্ষমা নয়। এখন ওর কাছ থেকে যা পেতে হবে তা হচ্ছে ব্যাখ্যা। কেন এমন করতে হলো, কেন ওদের দলটাকেই বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য বেছে নিল মং সেন।

ডান পা দিয়ে মং সেনের গায়ে ধাক্কা দিল আদ্রিতা। তাতে অন্যপাশে ঘুরে শুল মং সেন। এখানে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে লোকটা। না হলে এরকম খোলা জায়গায় এতটা আরাম করে ঘুমাতে পারত না।

পা দিয়ে পিঠের কাছে আরেকবার গুঁতো দিল আদ্রিতা। এবার আর নড়ল না মং সেন। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে আদ্রিতা। চোখ খোলেনি। কিন্তু মনে হচ্ছে লোকটা জেগে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কাটল। একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত লাগছিল আদ্রিতার। এবার বেশ জোরে ডান পা দিয়ে পিঠের কাছে গুঁতো দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল শক্ত হাতে তার ডান পা আঁকড়ে ধরেছে মং সেন। হ্যাঁচকা একটা টান দিয়েছে। তাতে ভারসাম্য রাখতে না পেরে বেকায়দা অবস্থায় উলটে পড়ে গেল আদ্রিতা।

হাত থেকে লোহার বঁটি ছুটে গেছে, পাথরের টুকরোটা গড়িয়ে পড়েছে অন্যদিকে। ঘুমন্ত মং সেন কোন ফাঁকে জেগে উঠেছিল কে জানে! এরকম কিছু হতে পারে তার জন্য প্রস্তুত থাকলেও ব্যাপারটা এতটা ত্বরিত গতিতে ঘটেছে যে নিজেকে নিরাপদ দূরত্ব সরিয়ে নিতে পারেনি।

পা থেকে হাত সরায়নি। বরং ঘুমন্ত মং সেন এখন চোখ খুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। নেশাগ্রস্ত বড় বড় চোখ। টলতে থাকা শরীর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আদ্রিতার উপর। সরে যাওয়ার চেষ্টা করেও পারল না। তাকে জাপটে ধরেছে মং সেন। ঠিক মুখ বরাবর এখন মং সেনের মুখ। সেই মুখে এখনও আঠালো লালা লেগে গেছে। দেখে ঘৃণায় কুঁচকে গেল আদ্রিতা।

নিজের শরীর দিয়ে আদ্রিতাকে মাটির সাথে জোরে চেপে ধরেছে মং সেন। দুহাতে শক্ত করে গলা টিপে ধরেছে। শ্বাস নিতে পারছে না আদ্রিতা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাসের অভাবে মরে যাবে, কোনো সন্দেহ নেই। পা দুটো এলোপাথাড়ি ছুড়ছে, হাত দুটোও। কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই মং সেনের। বরং দুহাতে আদ্রিতার গলার উপর চাপ আরও বাড়িয়েছে।

এত কষ্ট করে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এখন এই লোকটার হাতে মরতে বসেছে বলে নিজের উপরই রাগ হচ্ছে আদ্রিতার। দেখতে শুকনো হলে কী

হবে, লোকটার শরীরে অনেক শক্তি। পা দুটো এমনভাবে শরীর দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছে যে তা নাড়াতেও পারছে না আদ্রিতা। হাত দুটো নাড়াচ্ছে। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হচ্ছে না। লোহার বঁটি আর পাথরের টুকরোটা ঠিক কোথায়, কত দূর গিয়ে পড়ছে কোনো ধারণা নেই। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে মাথাটা ডানদিকে সামান্য কাত করল।

দেখল ডান হাতের খুব কাছাকছিই রয়েছে জিনিসটা। আদ্রিতাকে গলা টিপে মারার দিকেই সব মনোযোগ মং সেনের। কাজেই ডান হাতে আদ্রিতা ঠিক কী করতে যাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ডান হাতে কোনোমতে পাথরের টুকরোটার নাগাল পেল আদ্রিতা। মুঠোবন্দি করে হাতটা উঁচু করল। তারপর পাথরের টুকরোটা দিয়ে সরাসরি আঘাত করল মং সেনের মাথায়। আঘাতটা এতটাই জোরে করেছে যে নিজেই কেঁপে উঠল। মনে হলো ঠিক যেখানে আঘাত করেছে সেখানে খুলি ফেটে গেছে। মাটিতে পড়ে গেছে মং সেন।

কোনোমতে উঠে দাঁড়াল আদ্রিতা। মং সেনের দিকে এগোল। মাথার একপাশে হাত দিয়ে মাটিতে শুয়ে আছে লোকটা। যেখানে হাত দিয়ে ধরে আছে সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে হাত ভিজে গেছে। আদ্রিতা বঁটিটা হাতে তুলে নিল। এগিয়ে গিয়ে মং সেনের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল।

'তোকে আমার শুরু থেকেই পছন্দ হয়নি,' 'আমার সবগুলো বন্ধু মরে গেছে তোর কারণে, আদ্রিতা বলল।'

মং সেন কিছু বলল না, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'তোর উদ্দেশ্য কী ছিল? আমাদের ক্ষতি করে তোর কী লাভ? ওরা কারা? ওরা কী মানুষ নাকি অন্য কিছু?'

একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করে থামল আদ্রিতা। তাকিয়ে আছে মং সেনের দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে। রক্ত এখনও বেরোচ্ছে গলগল করে মাথা থেকে। যেকোনো সময় জ্ঞান হারাতে পারে। জ্ঞান হারাক, মরে যাক। তাতে ওর কিছু যায় আসে না। কিন্তু ওর কাছ থেকে আসল কথা বের করে আনতে হবে।

'কথা না বলে পার পাবি না,' আদ্রিতা বলল, 'আমি এক এক করে তোর হাত-পা কাটব।'

অন্য সময় হলে কথাগুলোকে স্রেফ ফাঁকা হুমকি বলে মনে হতো। কিন্তু আদ্রিতা জানে সে এখন ফাঁকা হুমকি দিচ্ছে না। এটা হয়তো মং সেনও বুঝতে পারছে। গুহার মধ্যে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বেঁচে ফিরেছে, তাতে রক্ত, মৃত্যু, যন্ত্রণা এসব এখন আর আদ্রিতার কাছে খুব জটিল কোনো বিষয় নয়।

'শুরুতে তোর পা কাটব, গোড়ালিটা, তারপর ডান হাত,' আদ্রিতা বলল, অল্প একটু এগিয়ে গেছে মং সেনের দিকে। তাতে মং সেন একটু পেছনে সরে গেল। ওর চোখে-মুখে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। বুঝতে পারছে আদ্রিতার কথায় আর কাজে অমিল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

'কুকুরের বাচ্চা কথা বল!' চেঁচিয়ে বলল আদ্রিতা।

'আসলে...' শুরু করতে গিয়েও থেমে গেল মং সেন, চারপাশে তাকাল, 'আসলে ওরা মানুষই। তবে আমাদের মতো নয়।'

'আমাদের মতো নয় মানে?'

'ওরা সভ্য জগতের ছোঁয়া পায়নি, পেতে চায়ও না,' মং সেন বলল, 'কয়েকজন মানুষের একটা গোত্র। শতাব্দী প্রাচীন এই গোত্র ঠিক কোত্থেকে এখানে এসেছে তা জানি না। এদের ভাষাও আমাদের মতো নয়। কিন্তু ওরা অন্যরকম...'

'অন্যরকম মানে?'

'ওরা দেখতে ভয়ংকর, স্বভাবও ওরকম,' মং সেন বলল, 'এখনও ওরা কাঁচা মাংস খায়। সেটা জন্তু-জানোয়ার হোক কিংবা মানুষই হোক।'

'এরকম একটা গোত্র এদের কথা কেউ জানে না?'

'না,' মং সেন বলল, 'ওরা মূলত থাকে ছোট একটা এলাকার মধ্যে। বাইরের মানুষের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। সাত-আটজনের একটা গোত্র।'

'সাত-আটজনের একটা গোত্র হয় কোনোদিন?'

'হয়,' মং সেন বলল, 'যেহেতু বাইরের পৃথিবীর সাথে ওদের কোনো যোগাযোগ নেই, বেশিরভাগ সময় গুহার অন্ধকারেই থাকে, তাই গোত্রটা ছোট। নিজেদের নিয়েই থাকতে ওরা পছন্দ করে।'

'তুই তো বেশ ভালো গবেষণা করেছিস মনে হচ্ছে?'

'গবেষণা না করে উপায় ছিল না,' মং সেন বলল, 'বছর খানেক আগে ওদের হাতে আমি ধরা পড়েছিলাম। এমনিতেই জায়গাটা নিয়ে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করত। কেউ এখানে আসতে চাইত না। বলত এখানে নাকি খারাপ ধরনের দেবতা থাকে। দিনে-দুপুরেও এখানে মানুষ নেই হয়ে যায়। আর ফিরে আসে না। এমনকি লাশ খুঁজেও পাওয়া যায় না। এই এলাকাটা তাই বলা যায় সাধারণ লোকালয়ের হিসাবের বাইরেই থাকে। এমনকি মায়ানমারের সেনাবাহিনীও জায়গাটাকে এড়িয়ে চলে। ওদের কয়েকজনও এখানে এসে হারিয়ে গিয়েছিল। ওরা কয়েকবার পুরো এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কারণ বের করতে পারেনি। তাই...'

'তাই কী?'

'দেবতাদের ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ,' মং সেন বলল, 'সীমানা পাড়ি দিয়ে প্রায়ই আমি মায়ানমারের দিকে যাতায়াত করতাম। একদিন মনে হলো এই এলাকাটা ঘুরে যাই। আমার মামাতো ভাইকে নিয়ে এখানে এসেই ওদের হাতে ধরা পড়ি। ওরা সাথে সাথেই আমার মামাতো ভাইটাকে খুন করে ফেলে। কিন্তু কোনো এক কারণে আমাকে ওরা মারেনি।'

'কী সেই কারণ?'

'বলছি,' মং সেন বলল, 'ওদের দলের একজন নেতা আছে। সেই নেতার কারণেই আমি জানে বেঁচে গেছি। কিন্তু বিনিময়ে একটা কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হলো, সেই সাথে কাজ করে দিলে পুরস্কারও পাব।'

'কী পুরস্কার? স্বর্ণের টুকরা পুরস্কার দিচ্ছে গুহার কিছু ভয়ংকর মানুষ? বোকা পাইছো আমাকে?'

'স্বর্ণের টুকরা না বলে স্বর্ণমুদ্রা বলাই ভালো,' মং সেন বলল, 'ওরা আমাকে ছেড়ে দিল। সাথে দিল একটা স্বর্ণমুদ্রা। এরকম অযাচিতভাবে জীবন ফিরে পেয়ে আমি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম। সীমানা পাড়ি দিয়ে দেশে এসে সেই স্বর্ণমুদ্রা জমা রাখলাম এক ভাইয়ের কাছে। ইচ্ছে ছিল সেগুলো গলিয়ে সোনা বানাব। কিন্তু সেই সুযোগ পেলাম না। তার আগেই আরেকটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম।'

'কী ঝামেলা?'

'থাক, সেটা না জানলেও চলবে আপনার।'

'আচ্ছা, স্বর্ণের বিনিময়ে কি মানুষ সরবরাহ করতে হবে এমন চুক্তি হলো?'

'অনেকটা তাই,' মং সেন বলল, 'তবে ওদের লক্ষ শুধু মেয়েমানুষ। সেই মেয়েমানুষও যে-সে মেয়ে হলে হবে না। বিশেষ একটা মেয়ের খোঁজে আছে ওরা।'

'বিশেষ মেয়ে মানে?'

'মানে যে মেয়ে তাদের গোত্রকে টিকিয়ে রাখবে, তাদের সন্তান দিতে পারবে।'

আদ্রিতা বসে পড়ল। বিবমিষা জাগছিল ঐ অসভ্য, ইতর, বর্বর, নৃশংস মানুষগুলোর অদ্ভুত দাবির কথা ভেবে।

'আচ্ছা। ওদের গোত্রে কোনো মেয়ে নেই?'

'একজন মহিলা আছে মাত্র, সেও সন্তান জন্মদানে অক্ষম,' মং সেন বলল, 'ওরা সেই মহিলার ভরসাতেই ছিল, কিন্তু যখন বুঝতে পারল ঐ মহিলা একদমই অক্ষম, তখন ওরা এই পরিকল্পনা করল।'

'আর তোকে বেছে নিল?'

'হ্যাঁ।'

'এক বছরে এর আগে কতগুলো মানুষকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছিস?' আদ্রিতা জিজ্ঞেস করল।

'আপনাদের নিয়ে দুটো গ্রুপ, এর আগে তিনজনের একটা দল ছিল। সেখানে একটা মেয়ে ছিল। এছাড়া সীমানা পেরিয়ে এপারে আশ্রয় নিতে আসা কিছু মেয়েকেও দিয়েছি।'

'তাতে ওদের কাজ হয়নি?'

'না,' মং সেন বলল, 'বিশেষ একটা মেয়ে দরকার ওদের। সেই বিশেষ মেয়ে না পাওয়া পর্যন্ত ওরা এটা চালাতেই থাকবে।'

'চালাতে থাকলেই তো তোর লাভ,' আদ্রিতা বলল, 'তুই স্বর্ণের মুদ্রা পেতে থাকবি।'

মং সেন কিছু বলল না। কোনোমতে বসে আছে। এখনও এক হাতে মাথার একপাশটা চেপে বসে আছে।

'এই স্বর্ণমুদ্রার উৎস কী?' জিজ্ঞেস করল আদ্রিতা।

'যতদূর বুঝতে পারি, এরকম স্বর্ণমুদ্রা ওদের কাছে অনেক আছে। সম্ভবত ওরা কোনো গুপ্তধন পেয়েছে। এই এলাকার যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণমুদ্রার মালিক হয় আরাকান রাজা, নয় পর্তুগিজ জলদস্যু তিবাও কিংবা মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তাড়া খেয়ে বার্মায় আশ্রয় নিতে আসা যুবরাজ শাহ সুজা।'

'এত তাহলে সাধারণ স্বর্ণমুদ্রা না, এন্টিক ভ্যালুই তো অনেক হবে। কোথাও দেখিয়ে নিশ্চিত হলেই হয়।'

'এটা তো কাউকে দেখানো যাবে না,' মং সেন বলল, 'হয় বিশ্বাস করবে না, ভাববে আমি বানিয়ে বলছি। না হয় আমাকে সরিয়ে দিয়ে একাই এই স্বর্ণমুদ্রার ভাগ নেবে।'

'ওরা যেহেতু বাইরের পৃথিবীর কারও সাথে মেশেনি, স্বর্ণমুদ্রা যে দামি জিনিস সেটা ওরা বুঝল কী করে?'

'সেটা জানি না, আন্দাজ করতে পারি,' মং সেন বলল, 'ওরা হয়তো ওদের পূর্বপুরুষের কাছে শুনেছে। আমি আসলে জানি না।'

'জানা উচিত,' আদ্রিতা বলল, 'এই স্বর্ণের জন্য কতগুলো মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিস বিনা বাধায়, এটা তো হতে দেওয়া যায় না।'

মং সেন কিছু বলল না, এখনও হাত দিয়ে মাথার পাশটা ধরে আছে। তবে ওকে দেখে কোনো মায়া হচ্ছে না আদ্রিতার। বরং ওকে দেখে রাগ আরও বাড়ছে। রবি, সৌমিক, ফারহান, কঙ্কা, চার চারজন তাজা প্রাণ ঝরে গেছে ওর জন্য, যারা ওর বন্ধু ছিল। একসাথে কতগুলো বছর কাটিয়েছে, হাসি-আনন্দে। সেই দিনগুলো আর কখনই ফিরে আসবে না। মং সেনকে শাস্তি পেতেই হবে।

বঁটিটা নিয়ে সামনে এগোলো আদ্রিতা। ওর উদ্যত ভঙ্গী দেখে মং সেন মাটির উপর পড়ে গেল।

'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর কোনোদিন এই কাজ করব না,' মং সেন বলল।

'ছেড়ে দিন বললেই হলো,' আদ্রিতা চিৎকার করল, 'ওরা মরেছে তোর কারণে। তুই ওদেরকে মেরেছিস। ওহো!' কান্না বেরিয়ে আসল আদ্রিতার বুক চিরে। কী যন্ত্রণাময় একেকটা মৃত্যু ছিল।

'আমি ক্ষমা চাই, আমাকে মারবেন না,' মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে বলল মং সেন। রক্ত আর ধুলোয় মাখামাখি হয়ে একাকার অবস্থা।

'তোকে না মারলে ওদের আত্মা শান্তি পাবে না, এটা আমার দায়িত্ব যে তোকে নিজ হাতে খুন করব। আদ্রিতা বলল ।'

'একজন বেঁচে আছে,' মং সেন বলল, 'তাকে বাঁচাতে পারেন, সময় আছে এখনও।'

আদ্রিতা থমকে দাঁড়াল। বঁটিটা নিচু করল। মং সেনের চুল ধরল মুঠি করে।

'কে বেঁচে আছে? কঙ্কা? সত্যি করে বল।'

'হ্যাঁ, সে বেঁচে আছে,' মং সেন বলল।

আদ্রিতা কী বলবে বুঝে পাচ্ছে না। তার বুকটা আনন্দে ভরে গেছে, একই সাথে মনে হচ্ছে প্রাণে বাঁচার জন্য ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করছে মং সেন। ওকে বিশ্বাস করে এখানে এসে ক্ষতি হয়েছে, এবার আর ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

'তুই কি আমাকে বোকা পাইছিস? ওরা কাউকে বাঁচাইয়া রাখে না,' আদ্রিতা বলল, 'তুই একটা মিথ্যাবাদী।'

'তাকে নিয়ে ওদের আলাদা প্ল্যান আছে।'

'আলাদা প্ল্যান আছে মানে?'

'বলছিলাম না ওদের একটা বিশেষ মেয়ে দরকার। আপনার বন্ধু সেই বিশেষ মেয়ে!'

'মানে কঙ্কাকে ওরা ওদের বংশবৃদ্ধির কাজে লাগাবে?'

'হ্যাঁ, এজন্যই তাকে মারেনি।'

'তোর কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' আদ্রিতা বলল, 'কঙ্কা কীভাবে সেই বিশেষ মেয়ে হয়! সেই বিশেষ মেয়ের লক্ষণ কী? বল তুই। আমি মিলিয়ে দেখি।'

'আমি জানি না সে কেন বিশেষ,' মং সেন বলল, 'তার মধ্যে ওরা এমন কিছু দেখছে যেটা অন্য মেয়ের মধ্যে দেখেনি।'

'কী সেটা?'

'আমি জানি না,' মং সেন বলল, 'কিন্তু বিশ্বাস করেন, সে বেঁচে আছে।'

আদ্রিতা বুঝতে পারছে না কী করবে। কঙ্কা যদি সত্যিই বেঁচে থাকে, তাহলে মং সেনকে মেরে ফেলা হবে ভুল একটা কাজ। এই মুহূর্তে মং সেন-ই পারে আদ্রিতাকে সেখানে নিয়ে যেতে। আর যদি মং সেন মিথ্যে বলে, তাহলে অন্তত মনে সান্ত্বনা থাকবে, বন্ধুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ গেছে। পাঁচজন বন্ধুর চারজনই যখন মরে যায়, তখন বাকি একজনের বেঁচে থাকা আর না থাকা একই কথা।

'তুই আমাকে নিয়ে চল,' আদ্রিতা বলল।

'আপনি গিয়ে কী করবেন?' মং সেন বলল, 'ওরা ভয়ংকর। আপনার খোঁজে আছে। পেলে একদম ছিঁড়ে ফেলবে।'

'ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, কঙ্কা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আমাকে ওর কাছে যেতেই হবে,' আদ্রিতা বলল।

'কিন্তু প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না,' মং সেন বলল, 'আমার কোনো সমস্যা নেই। ওরা আমাকে প্রাণে মারবে না।'

'এত কিছু জানি না, চল।'

আদ্রিতা বলল।

মং সেন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওকে সামনে যেতে বলল আদ্রিতা। পেছনে দাঁড়াল সে।

'যদি একটু এদিক-সেদিক করিস, আমি তোকে খুন করে ফেলব,' আদ্রিতা বলল, 'এবার হাঁটতে থাক।'

মং সেন ধীরগতিতে হাঁটতে থাকল। আদ্রিতা হাঁটছে পেছন পেছন। মনে দোলাচল। বারবার মনে হচ্ছে মং সেনের কথা যেন সত্যি হয়। কঙ্কাকে যেভাবেই হোক ঐ নরকের কীটদের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে। তাতে যদি জীবন যায়, যাক।

****

ওদের দুজনের কথাবার্তা সব শুনেছে রফিক, খুব কাছাকাছি ছিল বলেই সব কথা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে। স্বর্ণমুদ্রাগুলো কীভাবে পেয়েছে ছেলেটা সেটা জেনেছে, ক্যাম্পে থাকা বাকি ছেলে-মেয়েগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটাও বুঝেছে। সেই সাথে এটাও ধারণা করতে পেরেছে, এই এলাকায় জনমানব নেই কেন!

মেয়েটার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে, জীবিত বন্ধুকে উদ্ধার করতে চায়। তাতে এই ছেলেটার সাহায্য লাগবে। ওরা হাঁটতে শুরু করেছে।

নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ওদের অনুসরণ করতে শুরু করল রফিক। আরও ঘটনা ঘটবে। ছেলেটা এই মুহূর্তে এমনিতেই দুর্বল। ওকে এই অবস্থায় মেরে লাভ নেই। এরচেয়ে মেয়েটা তার বন্ধুকে উদ্ধার করুক। সে সময়মতো ওর উপর শোধ নেবে। খিদে পেয়েছিল খুব। কিন্তু আপাতত সেই খিদে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। অনেকদিন পর বইয়ের পাতায় ঘটে যাওয়া অ্যাডভেঞ্চার গল্পে যে উত্তেজনা পাওয়া যেত, তেমন উত্তেজনাবোধ হচ্ছে। আপাতত তাই প্রতিশোধের স্পৃহা ভুলে সাবধানে ওদের পিছু নিল রফিক।



রাতে ভালো ঘুম হয়নি কঙ্কার। দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার জেগে উঠেছে। ভোরের দিকে চারপাশ যখন পাখিদের কলকাকলিতে ভরে গেল, তখন ঝাঁপিয়ে ঘুম আসছিল। কিন্তু তাকে মেঝে থেকে টেনে তুলল মধ্যবয়স্ক মহিলাটি।

এই ভোরবেলায় এরকম আচরণ করার কী কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছিল না কঙ্কা। বাধা দিল না। এরা একের পর এক অদ্ভুত কার্যক্রম করে যাচ্ছে। সেসবের শেষ কোথায় কে জানে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। সারা শরীর ভরা কাদামাটি। বয়স্ক লোকটার ইশারায় ওদের একজন এগিয়ে এসে কঙ্কার হাত ধরল। এরপর এক এক করে বাকিরা ঘিরে ধরল ওকে। সাতজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিপন্নবোধ করছিল কঙ্কা। কিন্তু ওরা কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। বয়স্ক লোকটা উচ্চৈঃস্বরে কিছুটা একটা বলছিল। এর সাথে তাল মেলাচ্ছিল ওরা। সবমিলিয়ে অদ্ভুত একটা আবহ তৈরি হয়েছে চারপাশে। এই ভোরবেলাতেও ওদের এই অদ্ভুত উচ্চারণ ভয়ানক একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আশপাশের গাছগুলো থেকে পাখিগুলো উড়ে চলে যাচ্ছে তারস্বরে চিৎকার করতে করতে। একটু আগেও আকাশে উজ্জ্বল আলোর রেখা ফুটছিল, সেই আলোর রেখার বদলে এখন কালো মেঘ জমা হচ্ছে। দূরে কোথাও বজ্রপাত হলো। ভোরেই রাতের অন্ধকার নেমে আসছে যেন।

চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কা। টের পেল তার মুখের উপর খসখসে একটা হাত। চোখ মেলে তাকাল। দেখল হাতটা বয়স্ক লোকটার। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সরাসরি। কিছু একটা ইশারা করল চোখ দিয়ে বাকিদের দিকে।

কঙ্কা টের পেল সবগুলো পুরুষ এক এক করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ঠিক মাঝখানে তাকে ঘিরে ধরেছে সবাই। দুহাত দিয়ে কঙ্কাকে

জড়িয়ে ধরতে চাইছে পুরুষগুলো। কঙ্কার শরীরে আঠার মতো লেগে যাচ্ছে ওদের শরীরে লেগে থাকা কালো কাদাগুলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে কঙ্কার। সাতজন পুরুষের মাঝখানে, ছোট একটা খেলনা পুতুলের মতো লাগছিল নিজেকে। গায়ে গা চেপে ওরা সবাই চেপে ধরেছে কঙ্কাকে। এভাবে চারপাশ থেকে চাপ খেতে খেতে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছিল কঙ্কা। কিন্তু বাতাস কোথায়? তার মুখের কাছে সাতটা বীভৎস মুখ, সেই মুখের ভেতর থেকে আসা বাজে দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। ওদের সবগুলো মুখ, মুখের প্রতিটি রেখা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। তার পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার শরীরের সর্বোত্র এখন কালো কাদা।

দম নিতে পারছে না কঙ্কা। চিৎকার করতেও পারছে না। এই অদ্ভুত কার্যকলাপের মানেও বুঝতে পারছে না। ওরা কী চারপাশ থেকে চেপে ধরে এভাবে মেরে ফেলতে চাচ্ছে ওকে? এরচেয়ে সহজ আরও কোনো পথ বেছে নিতে পারত। নাকি এভাবেই সে বেশি কষ্ট পাবে বলে এই পথটাই বেছে নিয়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত বয়স্ক লোকটা আর ঐ মধ্যবয়স্ক মহিলাটি দিতে পারবে। যদিও তারা দুজনই বেশ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সবকিছু।

চারপাশ থেকে পিষ্ট হতে হতে ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে লাগল কঙ্কার কাছে। এই সাতজনের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলছে। কে কঙ্কাকে পুরোপুরি নিজের মধ্যে দখল করতে পারে। এরমধ্যে চারজন ভেতরের বৃত্তের বাইরে চলে গেছে। এখন প্রতিযোগিতা চলছে তিনজনের মধ্যে। কঙ্কা তিনজনের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। পরস্পরকে আঘাত না করে কীভাবে কঙ্কাকে নিজের কাছে নিতে পারবে সেই প্রতিযোগিতাতে ওরা ব্যস্ত। মাঝখানে যে কঙ্কা মৃতপ্রায়, সে দিকে ওদের কোনো খেয়াল নেই। হয়তো প্রতিযোগিতার নিয়মই এরকম।

তিনজনের মধ্যে বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। ওরা এখন একজন আরেকজনের দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে কঙ্কাকে নিজের কাছে নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কঙ্কার কাছে মনে হচ্ছে তার শরীরের ভেতরের সব হাড় ভেঙেচুরে যাচ্ছে। শরীরের মাংসপেশিগুলো নরম তুলোর মতো হয়ে যাচ্ছে।

এরমধ্যে একজন তিনজনের মাঝখান থেকে সরে গেল। এবার লড়াই হচ্ছে দুজনের মধ্যে। দুজন দেখতে প্রায় একইরকম। কঙ্কা শ্বাস নিতে পারছে না। লড়াইটা থামলে হয়তো সে বাঁচবে। এই লড়াই আর পাঁচ

মিনিট চললে দমবন্ধ হয়েই হয়তো মারা যাবে সে, তখনও হয়তো ওদের লড়াই থামবে না। দুজনেই শক্তিশালী পুরুষ। দুজনের চোখে-মুখে দারুণ নৃশংসতা।

নিজেকে বাঁচানোর জন্যই কাজটা করল কঙ্কা। ডান হাত দিয়ে ঠিক সামনে থেকে চেপে ধরেছে যে মানুষটা, ওর নিম্নাঙ্গ জোরে চেপে ধরল। আচমকা শিকারের এমন আচরণে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিয়ন্ত্রণ হারাল লোকটা আর তাতেই ওকে সরিয়ে কঙ্কাকে পুরোপুরি নিজের দখলে নিয়ে নিল পেছনের জন।

প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটল। নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই কঙ্কার। সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে এই অদ্ভুত চাপাচাপিতে। পেছন থেকে বিজয়ী লোকটা তাকে এতক্ষণ ধরে রেখেছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে মাটিতে পড়ে গেছে কঙ্কা। দৌড়ে এসে তার পাশে উবু হয়ে বসল মধ্যবয়স্ক মহিলাটি। ওর চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

বিজয়ী পুরুষটি এবার নিজের বুকে কয়েকটি ঘুসি মারল, গোঙানির মতো কিছু শব্দ করল। বিজয়কে এভাবেই হয়তো প্রকাশ করে ওরা, ভাবল কঙ্কা। কিন্তু কীসের বিজয় এটা? ওকে নৃশংসভাবে খুন করার অধিকার কি তাহলে এই লোকটার, অন্য কারও নয়? এজন্য এভাবেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল লোকটা?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। বয়স্ক লোকটার ইশারায় ওরা সবাই চলে গেল দল বেঁধে। বাকিদের মধ্যে এখন আর হতাশা নেই, বরং কয়েকজনকে দেখা গেল বিজয়ী পুরুষের পিঠ চাপড়ে দিতে। কঙ্কাকে কোনোমতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়েছে মধ্যবয়স্ক মহিলাটি। সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই উবু হয়ে ঢুকল বয়স্ক লোকটা। নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপ-আলোচনা চালাল। সেসব মাথায় ঢুকলেও কিছুই বুঝতে পারল না কঙ্কা। অবশ্য সে এখন খুশি ঠিকঠাক নিঃশ্বাস নিতে পারছে বলে।

ওরা দুজনেই চলে গেল। ঘরের মধ্যে একা শুয়ে আছে কঙ্কা। সারা শরীর কাদায় মাখামাখি। কাদা জমাট বেঁধে গেছে। যন্ত্রণা হচ্ছে বেশ। শরীর থেকে এই কাদা পরিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যাবে না।

উবু হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কঙ্কা। মধ্যবয়স্ক মহিলাটি কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ওকে ইশারায় নিজের অস্বস্তির কথা বোঝানোর চেষ্টা করল কঙ্কা। এর আগের দিন যে ডোবায় ডুব দিয়েছিল সেটা কাছেই। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ডোবার কাছে চলে এলো।

পরিষ্কার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কঙ্কা। পাগলের মতো পুরো শরীর পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। পুরুষের স্পর্শ বলতে বন্ধুদের হাত ধরা পর্যন্ত সীমিত ছিল, সেই কঙ্কার পুরো শরীর জুড়ে এখন পুরুষের স্পর্শ। শত চেষ্টাতেও সেই স্পর্শ ধুয়েমুছে ফেলা সম্ভব নয়।

তবু যতটুকু সম্ভব নিজেকে পরিষ্কার করে নিল কঙ্কা। তারপর মহিলার সাথে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। আকাশে কালো মেঘ জমে ছিল, সেই মেঘ ডাকছে এখন। বৃষ্টি নামবে যেকোনো সময়।

ঘরের ভেতর ঢুকে এক কোণায় বসে পড়ল কঙ্কা। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এমন একটা বৃষ্টি হোক যেন সবকিছু ভেসে যায়। নিজের অজান্তেই সে কাঁদতে শুরু করেছে। পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মধ্যবয়স্ক মহিলাটি।



সারারাত হেঁটেছে আদ্রিতা। কেন জানি মনে হচ্ছিল মং সেন ঠিক পথে এগোচ্ছে না। কিন্তু ভোরবেলায় যখন দৃশ্যটা দেখল তখন নিজের অজান্তেই চোখে পানি চলে এলো। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখেই গাছের আড়ালে লুকাল। মং সেনও লুকিয়ে আছে একটু সামনেই, একটা গাছের আড়ালে। ওর চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

বৃষ্টি নামল এই সময়। আকাশ কালো হয়ে এসেছিল আগেই, এখন বাতাস বইছে। সেই সাথে বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আদ্রিতার ইচ্ছে হচ্ছিল দৌড়ে ছুটে যেতে। কিন্তু বাঁচতে হলে, বাঁচাতে হলে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে।

মং সেন কিছুটা দূরে একটি গাছের তলায় উবু হয়ে বসে আছে। ওর মাথার একপাশটায় বড় একটা কাঁটা দাগ। সেখানে রক্ত জমে ছিল। এখন বৃষ্টির পানিতে সেই রক্ত তরল হয়ে নেমে যাচ্ছে ওর গাল বেয়ে।

হাতের বঁটিটা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল কঙ্কা।

'ওরা কই?' জিজ্ঞেস করল।

'বলতে পারছি না। এমনিতে ওরা বেশিরভাগ সময় গুহাতেই থাকে,' মং সেন বলল।

'ঐ ঘরে তাহলে কঙ্কা আর ঐ মহিলাটা?'

'হুঁ।'

'এখনই তো ভালো সময়,' আদ্রিতা বলল, 'চল।'

'এখন যাওয়া ঠিক হবে না,' মং সেন বলল, 'ওদের দেখা না গেলেও কেউ না কেউ পাহারায় আছে। দূর থেকে দেখছে।'

'তাহলে?'

'আমি জানি না আপনি কী করতে চাচ্ছেন,' মং সেন বলল, 'ওদের চোখে ধরা পড়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। পথ দেখিয়ে আনার জন্য ওরা আমাকেও ছাড়বে না।'

‘তোকে নিয়ে আমি ভাবছি না,’ আদ্রিতা বলল, ‘আমি নিশ্চিত মৃত্যু নিয়েও ভাবছি না। আমি শুধু চেষ্টা করতে চাই।’

‘কিন্তু ওদের সাথে আপনি পারবেন কীভাবে?’

‘জানি না কীভাবে পারব,’ আদ্রিতা বলল, ‘কোনো-না-কোনো উপায় অবশ্যই আছে।’

‘আমি এগুলোর মধ্যে নেই,’ মং সেন বলল, ‘আমি জায়গামতো আপনাকে নিয়ে এসেছি। আমাকে ছেড়ে দিন।’

‘তোকে ছাড়া যাবে না,’ আদ্রিতা বলল, ‘তুই তো সোনার লোভে এসব করেছিস? ওরা এই সোনা তোকে দেয়। কোত্থেকে দেয়?’

‘জানি না, এমন কোথাও লুকানো আছে সেটা জানা সম্ভব না,’ মং সেন বলল।

‘আমি যদি খুঁজে বের করতে পারি, তাহলে সব সোনা তোর,’ আদ্রিতা বলল, ‘কিন্তু আমাকে আর কঙ্কাকে সাহায্য করতে হবে।’

‘আমার কাছে নিজের জীবন আগে, সোনার খোঁজে জীবন দিতে পারব না,’ মং সেন বলল।

‘বেশ, তাহলে আমিই তোকে মেরে ফেলব,’ আদ্রিতা বলল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মং সেন। এত সহজে এই কথাটা বলা এক ব্যাপার আর সেটা কার্যকর করা আরেক ব্যাপার। নরম-সরম একটা মেয়ে মানুষ এত সহজে কাউকে মেরে ফেলবে এটা বিশ্বাস করা মং সেনের জন্য বেশ কঠিন ব্যাপার। তাই ব্যাপারটা একটু সহজ এবং বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য মং সেনের গলায় ধারালো বঁটিটা ধরল আদ্রিতা। এই সময় তার মুখের দিকে তাকালে যে-কেউ বুঝতে পারবে সে মোটেও ঠাট্টা করছে না, শুধুই ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে না। ধারালো বঁটির ছোঁয়ায় গলায় সূক্ষ্ম আর তীব্র ব্যথা অনুভব করল মং সেন। আতঙ্কে চেঁচাতে পারছে না।

দুই হাত জোর করে ধরল আদ্রিতার সামনে। বঁটিটা সরাল আদ্রিতা।

‘চলেন, চেষ্টা করে দেখি, কিন্তু এখন না,’ মং সেন বলল, ‘রাত হোক। এরমধ্যে আমরা কিছু কাজ এগিয়ে রাখি।’

‘কী কাজ?’

‘অস্ত্র দরকার আমাদের, খালি হাতে ওদের সাথে যুদ্ধ করতে যাওয়া আর আত্মহত্যা করতে যাওয়া একই ব্যাপার।’

‘কিন্তু অস্ত্র আমরা পাব কোথায়?’

‘অস্ত্র পাব না কোথাও, তৈরি করে নিতে হবে,’ মং সেন বলল।

আদ্রিতা বুঝতে পারল না কীভাবে অস্ত্র তৈরি হবে আর সেটা কে তৈরি করবে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে মং সেন হাঁটছে, ওর পেছন পেছন যাচ্ছে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ছোটখাটো একটা বাঁশবনের মধ্যে ঢুকে গেল ওরা। চারপাশে উঁচু সব বাঁশ। সেসবের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট কিছু বাঁশ গাছ। মং সেন আদ্রিতার দিকে তাকাল। ইশারায় বঁটিটা চাইল।

ওকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। তাই কী করতে হবে সেটা ইশারায় বুঝে নিল আদ্রিতা। তারপর নিজেই কাজে নামল। প্রথমে মাঝারি দেখে একটা বাঁশ গাছ বেছে নিল, একদম গোঁড়া থেকে গাছটা কাটল আদ্রিতা। একটানা কোপাতে হলো তাতে। এটুকু করতে গিয়েই ঘেমে নেয়ে একাকার অবস্থা তার। বাঁশ গাছের ঠিক মাঝবরাবর দুভাগ করল। তারপর লম্বা একটা অংশ বের করল। সেই লম্বা অংশটার একপ্রান্ত চোখা করল বঁটি দিয়ে। দেখতে ছোটখাটো একটা বর্শার মতো হলো জিনিসটা। দুই ফুট লম্বা বাঁশের একপ্রান্ত চোখা, অন্য প্রান্তটা ভোঁতা। পরপর এরকম তিনটা বর্শা বানিয়ে ফেলল আদ্রিতা। কাজটা সহজ মনে হলেও কোনোদিন কায়িক পরিশ্রম না করা আদ্রিতা ঘেমে যাচ্ছিল, ক্লান্তিতে থেমে যাচ্ছিল বারবার। কিন্তু থামলে হবে না। চারটা বর্শা বানানোর পর মাটিতে বসে পড়ল। বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

মং সেন তার সামনেই বসে আছে। তাকিয়ে দেখছে।

'এগুলো নিয়ে আপনি কী করবেন?' মং সেন বলল, 'আপনি এখন যে পরিমাণ ক্লান্ত, তাতে চাইলে আমি আক্রমণ করতে পারি। আপনি হয়তো আমাকে ঠেকাতে পারবেন না। কিন্তু আমার কারণে আপনার বন্ধুরা মরেছে। আমি চাই না আপনিও মরে যান, আপনার আরেক বন্ধু যিনি জীবিত আছেন সেও মরে যাক। আমাকে সাহায্য করতে দিন, বিশ্বাস রাখুন।'

'যে সামান্য স্বর্ণের লোভে মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে মেরে ফেলতে পারে, তাকে কীভাবে বিশ্বাস করব?'

'স্বর্ণ সামান্য জিনিস নয়,' মং সেন বলল, 'স্বর্ণের লোভে পৃথিবীতে কত মানুষ মরেছে তার হিসাব নেই। আর জীবনভর অভাবের সাথে লড়াই করতে থাকলে টাকা কী জিনিস সেটা বুঝতে পারবেন।'

মং সেনের শেষের কথাগুলো কিছুটা হলেও স্পর্শ করল আদ্রিতাকে। তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো লোকটাকে। আবার একই সাথে অবিশ্বাস খেলা করছে মাথায়। এই মুহূর্তে এই লোকটাকে বিশ্বাস না করে তেমন উপায়ও নেই। অথচ একটু আগেই এই লোকটার গলায় বঁটি বসিয়েছিল। মং সেন কী সত্যিই তাকে সাহায্য করবে না ওদের হাতে তুলে দেবে আরও স্বর্ণের আশায়?

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে জীবনের অনেক কঠিন একটা সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আদ্রিতা। বিশ্বাস করে মরে যাওয়াও কী ভালো, অবিশ্বাসে বেঁচে থাকার চেয়ে! কে জানে!

বাঁশগাছগুলোর সাথে যথেষ্ট পরিমাণ বেতগাছও ছিল। মং সেন সারা দুপুর বৃষ্টিতে ভিজে যে কাজ করল তা আদ্রিতার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছিল। সে শুধু শুধু বর্শা বানিয়ে সময় নষ্ট করেছে। বাঁশ, বেত, বাঁশের আঁশ, ছোট ছোট বাঁশ এগুলো দিয়ে ধনুক আর তির তৈরি করে ফেলেছে মং সেন। তিরগুলোর অগ্রভাগ এতটাই সুচালো যে ছুঁয়ে দেখতেই ভয় লাগছিল আদ্রিতার।

জীবনে কোনোদিন তির ছুঁড়ে দেখেনি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দুই-একটা তির ছুঁড়েও দেখল আদ্রিতা। বুঝতে পারল তার নিশানা যথেষ্ট খারাপ। এই নিশানা দিয়ে আর যাই হোক, ঐসব লোকের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। যা করার মং সেনকেই করতে হবে।

এই মুহূর্তে পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গেছে। মং সেনকে এখনও অবিশ্বাস করছে আদ্রিতা, কিন্তু সেটা প্রকাশ করছে না। চাইলে মং সেন এখন তার ক্ষতি করে ফেলতে পারে। যে তিরগুলো বানিয়েছে সেগুলো দিয়ে অনায়াসেই তাকে ঘায়েল করতে পারে। সেজন্য ওকে আদ্রিতার কাছেও আসতে হবে না।

বিকেলের দিকে বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমল। কিন্তু বাঁশবন থেকে বেরোল না আদ্রিতা। এখান থেকেই অনেক দূরের মাটির ঘরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আদ্রিতা দেখল ঐ হিংস্র লোকদের মধ্য থেকে একজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। সাথে সাথেই ভেতর থেকে মহিলাটি বেরিয়ে এসে বাকিদের সাথে বাইরে যোগ দিল।

ভেতরে ঐ লোকটার সাথে কঙ্কা এখন একা! কিছু একটা করার জন্য আদ্রিতার হাত নিশপিশ করছিল। সে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু মং সেন হাত ধরে আটকাল।

কঙ্কার সাথে খুব খারাপ কিছু হচ্ছে না তো? দম আটকে আসছিল আদ্রিতার। কিন্তু মং সেন এখনও শক্ত হাতে তাকে ধরে রেখেছে। ছটফট করছিল আদ্রিতা। এই সময় তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল। চিৎকারটা ক্রমাগত আসছে ঘরটা থেকে।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আদ্রিতা।



বাইরে ক্রমাগত বৃষ্টির শব্দে কঙ্কা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখল কুৎসিত একটি মুখ তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শেষ প্রতিযোগিতায় এই লোকটাই জিতেছিল। হয়তো বিজয়ী হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে কঙ্কাকে।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল কঙ্কা। কী করবে বুঝতে পারছে না। কোনোমতে গড়িয়ে ঘরের এক কোণার দিকে চলে গেল। সেখানে বসে দেখছে লোকটাকে। সারা শরীর জুড়ে কিলবিল করছে মাংসপেশিগুলো, কামানো মাথা আর লম্বাটে মুখটাকে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো লাগছে।

তার সাথে কী ঘটতে চলেছে সেটা বুঝতে পেরে অসহায়বোধ করছে কঙ্কা। এরকম কিছুর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। এরচেয়ে মৃত্যুও ভালো।

সাথে কোনো অস্ত্র নেই, শারীরিকভাবেও এই লোকটাকে পরাস্ত করার মতো শক্তি তার নেই। কাজেই ঘরের কোণায় বসে তার স্বরে চিৎকার করতে লাগল কঙ্কা। তাতে লোকটার মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। বরং অল্প অল্প করে তার দিকে এগোচ্ছে। শিকারের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

কোনো কিছুই সহজ হবে না লোকটার জন্য। মানসিকভাবে তৈরি হলো কঙ্কা। আজকে সে মরে যাবে, কিন্তু হার মানবে না।

লোকটা কঙ্কার মাথার চুল মুঠি করে ধরল। তারপর টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এলো। বাইরে গোত্রের বাকি সদস্যরা সারিবেধে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বেশ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কঙ্কার দিকে। যেভাবে চুল ধরে টেনেছে কঙ্কার মনে হচ্ছিল সব চুল ছিঁড়ে গেছে।

ঘরের আড়াল থেকে এখন এসব বর্বর মানুষগুলোর সামনে তাকে চূড়ান্ত অপমান করার প্রস্তুতি নিচ্ছে লোকটা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কঙ্কা কোনোমতে উঠে দাঁড়াল। লোকটা এখন তার ঘাড় ধরে আছে। ব্যথায় শরীর কেঁপে উঠছে।

কঙ্কার যন্ত্রণাকে উপশম করতেই এই সময় ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এলো আবার। তবে তাতে কেউ ভ্রুক্ষেপ করল না।

লোকটা কঙ্কার ঘাড় ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে বাকিরা যাচ্ছে। পাথরের ঐ মূর্তিটার সামনে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কঙ্কাকে। এই জায়গাটায় আগেও এসেছে। এখানেই রবি, সৌমিক আর ফারহানের মৃতদেহের কাটা অংশগুল জড়ো করে রেখেছিল ওরা।

ওদের একজন মাঝারি আকারের একটা গাছের গুঁড়ি নিয়ে এলো কোত্থেকে। সেটা কাদামাখা মাটিতে পুঁতে দিল। তারপর মূর্তিটার দিকে মুখ করে কঙ্কাকে বাঁধল সেই গাছের গুঁড়ির সাথে। সাধারণ দড়ি নয়, গাছের বাকল দিয়ে এক ধরনের দড়ি তৈরি করে নিয়েছে ওরা। সেটা দিয়েই বেঁধেছে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সামনে থাকা মূর্তিটার দিকে তাকাল কঙ্কা। বীভৎস, বিকৃত এই মূর্তিটার সামনে তাকে আবার নিয়ে এসেছে। পরিণতি বাকিদের মতোই হবে সন্দেহ নেই। তবে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে না এই ভেবে একটু সান্ত্বনা পাচ্ছিল মনে মনে।

যে লোকটা কঙ্কাকে জিতে নিয়েছে প্রতিযোগিতায় সে সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাশে এসে দাঁড়াল বয়স্ক লোকটা। বিড়বিড় করে কিছু বলতে লাগল মূর্তিটাকে উদ্দেশ করে।

ওরা সবাই একসাথে আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টি এখনও তুমুল গতিতে পড়ে যাচ্ছে। সম্ভবত বৃষ্টির কারণেই ওরা শেষ ধাপে যাচ্ছে না। কঙ্কা মনে মনে আশা করছে বৃষ্টি যেন না থামে। বৃষ্টিটা থামলেই সব শেষ হয়ে যাবে।

আদ্রিতা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বঁটিটা কোমরে গুঁজে নিয়েছে। তুমুল বৃষ্টিতে সবকিছু কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে। এরমধ্যেই কঙ্কাকে কোথায় নিয়ে গেছে দেখতে পেয়েছে। সেদিকে এগিয়ে গেল সে। মং সেন পেছনেই আছে। সাথে আছে ওর হস্ত নির্মিত তির-ধনুক। ওগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে নিশ্চিত নয় আদ্রিতা। শুধু নিজের সাথে থাকা বঁটিটার উপর ভরসা আছে। কঙ্কাকে বাঁচাতে গিয়ে অন্তত দুই-চারটাকে যে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে পারবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের জীবনের উপর চরম ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটুকু করতেই হবে। পালিয়ে যাওয়া মানে নিজের

সাথে প্রতারণা করা, সারাজীবন আয়নায় নিজের মুখ আর দেখতে পারবে না কখনো।

কঙ্কাকে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে বেঁধে রাখার দৃশ্যটা দেখল আদ্রিতা। ওরা নির্দিষ্ট কোনো একটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই সময়টা সম্ভবত বৃষ্টি শেষেই ঠিক হবে। বড় একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে। পেছনেই মং সেন।

বৃষ্টির গতি কমেনি। বরং বেড়েছে। মনে হচ্ছে পৃথিবী ডুবিয়ে ফেলার মতো বৃষ্টি নেমেছে। পৃথিবী থেকে সব জঞ্জাল মুছে না ফেলা পর্যন্ত এই বৃষ্টি থামবে না।

আদ্রিতা চোখ সরাচ্ছে না কঙ্কার দিক থেকে। ওর মনে এখন কী চলছে কে জানে!

বৃষ্টি থামল না। একাধারে পড়ে গেল। এমনকি একসময় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।



একটানা অদ্ভুত বিরক্তিকর বৃষ্টির কারণেই সম্ভবত একজনকে পাহারায় রেখে বাকি সবাই চলে গেছে।

বৃষ্টিতে ভিজতে কঙ্কার ভালো লাগে। যখনই সুযোগ পায় বৃষ্টিতে ভেজে। বৃষ্টি হলেই সে ছাদে চলে যায়। ক্লাস শেষে বৃষ্টি নামলে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরে। কিন্তু এখনকার বৃষ্টিটা অন্যরকম। একটানা শীতল পানির ফোঁটা শরীরটা যেন অবশ করে দিয়েছে। শীতে কাঁপুনি হচ্ছিল শুরুর দিকে, এখন আর কোনোরকম অনুভূতি নেই। ত্বক যেন রাবারের মতো হয়ে গেছে। একটানা অনেকক্ষণ কেঁদেছে, কেঁদে মন হালকা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মন হালকা হয়নি। বৃষ্টির পানির স্রোতের কাছে তার কান্নার জল যেন হার মেনে গেছে।

একজন মাত্র আছে এখন। ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল যে লোকটা, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে পুরস্কার হিসেবে তাকে পেয়েছে যে। এই বৃষ্টিতে টানা ভিজেও লোকটার মধ্যে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে কঙ্কাকে দেখছে। সেই দৃষ্টিতে লোভ-লালসা দেখেছে কঙ্কা।

মনে হচ্ছে লোকটার কবল থেকে কোনোমতেই বাঁচতে পারবে না। এখন শুধু বৃষ্টি থামার অপেক্ষা।

বৃষ্টি থামল এক সময়। হঠাৎ করেই চারপাশ নীরব হয়ে যাওয়াতে চোখ খুলে তাকাল কঙ্কা। বৃষ্টি সত্যিই থেমেছে। আকাশ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। উপরের দিকে তাকিয়ে মেঘের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ল না। দীর্ঘ এক বৃষ্টিতেই আকাশ তার সব কষ্ট পৃথিবীর বুকে ঢেলে দিয়েছে।

আকাশের বুকে এখন ঝলমলে এক চাঁদ। পূর্ণিমার চাঁদ। অন্যসময় হলে এই চাঁদের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত কঙ্কা। কিন্তু এখন পূর্ণ চাঁদের এই আলোকে অশুভ বলে মনে হতে লাগল।

ধারণা যে ঠিক সেটা বুঝতে পারল কিছুক্ষণের মধ্যে। বয়স্ক লোকটা তার বাকি সদস্যদের নিয়ে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে কিছু বলে যাচ্ছে। কথার অর্থ কিছু না বুঝলেও এটা বোঝা যাচ্ছে চাঁদকে প্রশংসা করছে লোকটা।

মধ্যবয়স্ক মহিলা এগিয়ে এলো কঙ্কার দিকে। ওর মাথায়, সারা শরীরে আর পেটে হাত বুলিয়ে দিল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। এই সময় বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছিল আর সেই অচেনা শব্দের কম্পন নিজের মধ্যে টের পাচ্ছিল কঙ্কা। খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় জোর করে কাদামাখা মাটিতে শুইয়ে দিল। এবার দলের সবগুলো মানুষ একসাথে কিছু একটা বলতে লাগল।

উপরে চকচকে পূর্ণ চন্দ্র, চারপাশ ঘিরে অদ্ভুত সব মানুষ আর তাদের অদ্ভুত সব মন্ত্রোচ্চারণে কঙ্কার মাথা ঘুরছিল। কেমন নেশা নেশা লাগছিল। মনে হচ্ছে অনেক ঘুম আসছে তার। চোখ বুজে আসছে ক্লান্তি, যন্ত্রণা আর ব্যথায়।

এই সময় বিজয়ী লোকটার মুখটাকে নিজের মুখের খুব কাছাকাছি আবিষ্কার করল সে। টের পেল শরীরের আবরণগুলো এক এক করে সরে যাচ্ছে। বাঁধা দেওয়ার মতো কোনো শারীরিক ক্ষমতা যেন নেই হয়ে গেছে শরীর থেকে।

কঙ্কা অপেক্ষা করতে লাগল জীবিত থেকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার জন্য। ওরা নতুন মুখ চায়। এই প্রথম ব্যাপারটা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরে নারী হিসেবে নিজের জন্মের উপরই ঘৃণা লাগতে লাগল কঙ্কার। অজান্তেই চোখ জলে ভরে গেছে। এভাবে চায়নি সে, কোনোদিন না। চোখ বুজল সে।

হুট করে একটা ভারী দেহ শরীরের উপর পড়ে গেলে কেমন অনুভূতি হয় তার কোনো ধারণা নেই কঙ্কার। সে চোখ বুজে ছিল। চোখ খুলেই দেখল লোকটার শরীর তার শরীরের উপর, মাথাটা কাঁধের কাছে চেপে বসে আছে। তবে শরীরের আর কোনো নাড়াচাড়া নেই। টের পেল লোকটার মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে। সেই রক্তে কঙ্কার কাঁধ, পিঠ সব ভিজে যাচ্ছে।

দুহাতে লোকটাকে সরাতে গিয়েও পারল না। এত ভারী শরীর সরানোর মতো শক্তি তার নেই। টের পেল চারপাশে কিছু একটা হচ্ছে। এই সময় লোকটার গলার কাছে চোখ পড়ল। সেখানে সরু, লম্বা একটা তির বিঁধে আছে। সেই তির গলার অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে।

দলের অন্যান্য লোকগুলো হইচই শুরু করে দিয়েছে। একজন এসে কঙ্কার উপর থেকে গলায় তিরবিদ্ধ লোকটাকে সরাল। উঠে বসল কঙ্কা। দেখল কাছাকাছি একটা বড় পাথরের টুকরোর আড়াল থেকে পরিচিত একটা অবয়ব বেরিয়ে এসেছে।

মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছে সে। কিংবা এরমধ্যেই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পৌঁছে গেছে। তাই পরিচিত এই মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে। তা না হলে এটা কীভাবে সম্ভব!

আদ্রিতা!

পেছনে মং সেন। হাতে তির-ধনুক। একের পর এক তির ছুড়ছে। তাতে এরমধ্যেই কয়েকজন বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

বাকিরা তীব্র বেগে দৌড়ে যাচ্ছে আদ্রিতা আর মং সেনের দিকে। এরকম একটা দৃশ্য দেখার জন্য কঙ্কা মোটেও প্রস্তুত নয়। সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেও পারল না। মধ্যবয়স্ক মহিলাটি একপাশ থেকে তাকে ধরে রেখেছে। বয়স্ক লোকটা এবার এগিয়ে এলো কঙ্কার দিকে।

শরীরের সব শক্তিতে চিৎকার করে উঠল সে। আদ্রিতা চলে এসেছে। লড়াই করছে। মরবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। সেও ছাড় দেবে না।

মধ্যবয়স্ক মহিলার হাতে প্রাণপণে কামড় বসাল কঙ্কা। খুঁটি থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। মধ্যবয়স্ক মহিলাটি হাতে কামড় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, এখন নিজেকে সামলে নিয়ে কঙ্কার চুল মুঠি করে ধরেছে আর অন্য হাতে আঁচড়ে-খামচে দিচ্ছে।

বয়স্ক লোকটা কাছে চলে এসেছে। ডান হাতে কঙ্কার মাথায় এত জোরে আঘাত করল যে চোখে অন্ধকার দেখছিল কঙ্কা। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে দেখল আদ্রিতা লড়ছে।

****

লড়াইটা অসম লড়াই। দুজনের বিপরীতে ছয়জন বর্বর, বুনো জন্তুর মতো মানুষ। ওরা এরমধ্যেই রবি, সৌমিক আর ফারহানের মতো ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। আচমকা আঘাতে ওদের একজনকে মং সেন ধরাশায়ী করতে পেরেছে, সেটাও তিরটা সরাসরি একদম গলায় বিদ্ধ হয়েছে বলে। বাকিদের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। দুই-একজনের শরীরে তির বিদ্ধ করতে পারলেও সেগুলোতে ওদের তেমন ক্ষতি হয়নি। বরং এতে ওরা যেন আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে।

এরমধ্যেই মং সেনকে ঘিরে ধরেছে তিনজন। বাকি তিনজন আদ্রিতাকে। বেশিক্ষণ ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না এটা দুজনেই বুঝতে পারছে। লম্বা, আকারে-আয়তনে কিংবা হিংস্রতায় ওরা অনন্য।

আদ্রিতা তার হাতের বঁটিটা বনবন করে ঘোরাচ্ছে। এতে কাছে এসেও ওকে আঘাত করতে পারছে না তিনজন। একজনের হাত কেটেছে বঁটির আঘাতে। কিন্তু তাতে পিছু হটেনি লোকটা। জানে খুব বেশিক্ষণ এভাবে প্রতিরোধ করতে পারবে না। শক্তিক্ষয় হতে থাকবে ক্রমান্বয়ে, ততক্ষন ওরা শুধু চারপাশ থেকে ঘিরে থাকলেই হবে।

মং সেনের অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়। তির শেষ হয়ে গেছে। ধনুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে একপাশে। ওর হাতে এখন লম্বা একটা বাঁশ। সেটাকে লাঠি বানিয়ে ঘোরাচ্ছে। এর মধ্যেই ওকে আহত করে ফেলেছে লোকগুলো। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ওদের আক্রমণে কেটে, ছড়ে গেছে। ওরা খেলছে যেন মং সেনকে নিয়ে। ফাঁদে পড়া শিকারের মতো ছটফট করছে মং সেন। লাঠি ঘোরাচ্ছে। কিন্তু সেই লাঠি দিয়ে আক্রমণকারীদের স্পর্শও করতে পারছে না।

আদ্রিতা তাকাল কঙ্কার দিকে। কিছুক্ষণ আগেও একটা খুঁটির সাথে বাঁধা ছিল। সাথে ছিল এক অর্ধনগ্ন মহিলা আর এক বয়স্ক পুরুষ। ওদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেছে?

বঁটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে আদ্রিতা। চাঁদের আলোয় খোলামেলা জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিছুটা দূরে পাহাড়। কঙ্কাকে কি ঐ পাহাড়ে নিয়ে গেছে ওরা? সেই গুহায়?

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও লড়াই করতে সাহস প্রয়োজন। মং সেন সাহস দেখাচ্ছে, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। এরমধ্যেই টলতে শুরু করেছে। আদ্রিতা সরতে সরতে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

চাঁদের আলোয় দেখল মং সেন ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। চোখের ইশারায় কিছু একটা বলতে চাচ্ছে যেন। ওর ইশারা বুঝতে পারল না আদ্রিতা।

মং সেন হঠাৎ করেই ওর হাতের লাঠিটা ফেলে দিল। দুহাত উপরে তুলে দাঁড়াল, আত্মসমর্পণ করেছে। হঠাৎ ওর এই পরিবর্তন দেখে ওরা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মং সেনের উপর।

আদ্রিতা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল শুধু। তার উপর আক্রমণ করছিল যারা, তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে মং সেনের উপর। ছয়জন বর্বর নৃশংসভাবে চেপে বসেছে মং সেনের উপর।

আদ্রিতা এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখল মং সেন হাত দিয়ে ওকে চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করছে। আদ্রিতা তবু দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে বুঝতে পারছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে সব ধরনের সাহায্যের উর্ধ্বে চলে গেছে মং সেন এখন। আদ্রিতার উপর থেকে ওদের মনোযোগ সরানোর জন্যই আত্মাহূতি দিয়েছে।

শেষবারের মতো মং সেনের দিকে তাকিয়ে দৌড়াতে শুরু করল আদ্রিতা। দৌড়াতে দৌড়াতেই মং সেনের চিৎকারের শব্দ শুনল। সেই চিৎকারে চারপাশ কেঁপে উঠল যেন। স্বর্ণের লোভে মানুষকে একের পর এক মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া লোকটা এখন নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

আদ্রিতার দাঁড়ানোর সময় নেই। সে দৌড়াচ্ছে পাহাড়ের দিকে। গুহায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কঙ্কাকে। কিন্তু গুহায় ঢোকার কোনো পথ তো চোখে পড়ছে না। একবার পেছনে ফিরে তাকাল। ওরা এখনও মং সেনকে নিয়ে ব্যস্ত। তবে ওদের একজন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আদ্রিতাকে দেখল। মং সেনকে রেখে এবার আদ্রিতাকে উদ্দেশ্য করে দৌড়াতে শুরু করল।

লোকটা যে গতিতে দৌড়াচ্ছে তাতে যেকোনো সময় আদ্রিতার কাছে পৌঁছে যাবে। অথচ কী করবে সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আদ্রিতা। যেন তার হাত-পা জমে গেছে সেখানে।

লোকটা কাছাকাছি চলে এসেছে। ওর চোখে-মুখে ভীষণ হিংস্রতা, শরীর জুড়ে কিলবিল করছে অসংখ্য মাংসপেশি। এছাড়া শরীরের এখানে-সেখানে রক্তের ছিটে লেগে আছে।

আদ্রিতা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। নড়তে ভুলে গেছে যেন। হাতের বঁটিটা তুলে ধরবে সেই শক্তিটাও পাচ্ছে না।

লোকটা কাছাকাছি চলে এসেছে। একদম কাছাকাছি। আর মাত্র দুই ফুট দূরে।

****

চোখ খুলে তাকাতে সবকিছু ঝাপসা লাগছিল কঙ্কার কাছে। এটা গুহার সেই জায়গা যেখানে দেওয়ালে অসংখ্য হাড়গোড় সাজানো। একপাশে আছে সেই পাথরের মূর্তিটা। বয়স্ক লোকটা কঙ্কার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দেওয়ালের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মাঝবয়সি মহিলাটি।

বয়স্ক লোকটা হাতের ইশারা করল, তাতে মহিলাটা বের হয়ে গেল গোলাকার জায়গাটা থেকে।

কঙ্কা উঠে বসল কোনোমতে। শরীরে কাপড়-চোপড় নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় নিজেকে অসহায় আর শক্তিহীন বলে মনে হতে লাগল। বয়স্ক লোকটা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। বিড়বিড় করে বলছে কিছু একটা।

কঙ্কা বুঝতে পারছে দলের বাকি সদস্যরা আদ্রিতাকে নিয়ে ব্যস্ত। হয়তো আদ্রিতা এতক্ষণে মরেও গেছে। অন্যদিকে এই লোকটা তার কাজ করবে। সেই কাজটা কী হতে পারে সেটা ভাবতেই গায়ে কাটা দিয়ে উঠল।

পিছাতে লাগল কঙ্কা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল। চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগল একজোড়া শক্ত, খসখসে হাতের, একটা বীভৎস, কুৎসিত শরীরের। অন্যদিকে তার হাত কাজ করছে পেছনে। দেওয়ালে সাজানো হাড়গুলো থেকে একটা তুলে নিয়েছে কোনোমতে। ছোট আকারের হাড়, কতটা কাজ হবে জানে না। কিন্তু শরীরে যতটুকু শক্তি আছে ততটুকুই দিয়ে সে আঘাত করল।

আঘাতটা করেছিল চোখ বুজেই, ধারণার উপরে। বয়স্ক লোকটার গলা বরাবর। কিন্তু টের পেল তার ডান হাত শক্ত করে মাঝপথেই ধরে ফেলেছে লোকটা। এত জোরে ধরেছে যে ব্যথায় ককিয়ে উঠল কঙ্কা। চোখ খুলে দেখল লোকটার চেহারায় হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে। এই কয়দিনে এই লোকটার চেহারায় বাকিদের মতো হিংস্রতা দেখেনি, এই প্রথম সেটা দেখে বুঝল এই লোকটা বাকিদের চেয়েও ভয়ংকর। লোকটার হাতে কামড় দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেও পারল না।

লোকটা দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তাকে। দেওয়ালের সাথে চেপে ধরল। তাতে দেওয়ালে সাজিয়ে রাখা হাড়গোড়গুলো কঙ্কার শরীরে গেঁথে যাচ্ছিল। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছিল।

এই সময় বয়স্ক লোকটা হঠাৎ চিৎকার করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কপাল বেয়ে সরু রক্তের ধারা নেমে এসেছে। লোকটা অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে কঙ্কার দিকে। তারপর কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে নিথর হয়ে গেল।

ঝাপসা আলোয় কঙ্কা দেখল মধ্যবয়স্কা মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বড় একটা পাথরের টুকরো। চোখে-মুখে ঘৃণা, অনুতাপ সব একসাথে খেলা করছে যেন।

কঙ্কাও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলাটির দিকে। আচমকা ওর এরকম দিক পরিবর্তনের মানে বুঝতে পারল না। মহিলাটি নিচু হয়ে বয়স্ক লোকটার খোলা চোখ দুটি বুজিয়ে দিল। মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে বসে রইল, চোখে অশ্রু।

কঙ্কাকে ইশারা করল বেরিয়ে যেতে। কখন আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তাই দেরি করল না কঙ্কা। আন্দাজের উপর দৌড়াতে শুরু করল।

তবে বেশিদূর যাওয়ার আগেই থমকে দাঁড়াল। তার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? মানুষ না অন্যকিছু?



বৃষ্টি শেষে যখন মেয়েটা দৌড়ে গেল, সাথে সেই ছেলেটা, তখন রফিক বুঝতে পারছিল না কী করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছেটা আপাতত সরিয়ে রেখে সে সবকিছু দেখে নিতে চাইছিল।

একদল বুনো লোক একটা মেয়েকে খুঁটির সাথে আটকে রেখেছে। এই দৃশ্যটাও সে দেখেছে। মেয়ে দুটো যে সেই ক্যাম্পের মেয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছেলেগুলো কোথায়? এই লোকগুলো মেরে ফেলেছে? এই লোকগুলোই বা কে? এরকম শারীরিক গড়নের কোনো মানুষ এই এলাকায় থাকে বলে কোনোদিন শোনেনি। এদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে থাকা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে মোটেই মেলানো যাচ্ছে না। তবে এরা যে ভয়ংকর, তা দূর থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে রফিক।

ওরা লড়াই করুক, বাঁচুক কিংবা মরুক, আমার কিছু যায় আসে না, মনে মনে বলল রফিক। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ ধারণা ঘুরপাক খাচ্ছে। কেন জানি মনে হচ্ছে এই বুনো, বর্বর লোকগুলোই ঐ স্বর্ণমুদ্রার উৎস। ছেলেটা ওদের কাছ থেকেই এই মুদ্রাগুলো পেয়েছে কিংবা ওদের কাছ থেকে চুরি করেছে।

লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ছেলেটা তির ছুড়তে শুরু করেছে। এতে খুঁটিতে বাঁধা মেয়েটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া লোকটা মরে গেছে তা নিশ্চিত। অন্য লোকগুলো বঁটি হাতের মেয়েটা আর তির-ধনুক হাতে ছেলেটার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্যদিকে খুঁটিতে বাঁধা মেয়েটাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে অন্য দুজন।

এই লড়াই দেখার চেয়ে ওরা কোথায় যাচ্ছে সেদিকে নজর দেওয়াই সুবিধাজনক মনে করল রফিক। সে পাথর, গাছপালার আড়ালে আড়ালে ওদের অনুসরণ করতে করতে অন্ধকার গুহায় ঢুকল।

বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে ওদের অনুসরণ করতে লাগল। অনেকদূর ভেতরে ঢোকার পর গোলাকার প্রায় খোলা একটা জায়গায় মেয়েটাকে

মেঝেতে শুইয়ে দিল বয়স্ক লোকটা। দেওয়ালের একপাশে মশালের মতো কিছু ছিল। পাথর ঘষে আগুন জ্বালাল লোকটা। তারপর বসে রইল মেয়েটার সামনে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার মুখের দিকে। মহিলাও তাকিয়ে আছে। দুজনের কেউই রফিকের উপস্থিতি লক্ষ করেনি। সে লুকিয়ে আছে খানিকটা দূরে একটা উঁচু পাথরের স্তূপের পেছনে। এই মেয়েকে নিয়ে ওরা কী করবে তা নিয়ে তার আগ্রহ নেই। তার আগ্রহ স্বর্ণমুদ্রায়। কেন জানি মনে হচ্ছে এই মুদ্রা এই গুহার কোথাও আছে। তবে স্বর্ণমুদ্রা তা মূল লক্ষ হলেও মেয়েটা বিনাকারণে মরে যাবে এটা ভাবতেও খারাপ লাগছিল। পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা ছুঁল। তার কি উচিত নয় মেয়েটাকে এই বিপদ থেকে বাঁচানো? রিভলভারটা হয়তো কাজ করবে? কিন্তু কাজ না করলে অনেক বড় ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে। বাঁচতে চাইলে ঝুঁকি নেওয়া চলবে না।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল বলে খেয়াল করেনি। হঠাৎ লক্ষ করল মধ্যবয়স্কা মহিলাটি একটা বড় পাথর হাতে এগিয়ে যাচ্ছে। বয়স্ক লোকটা মেয়েটার উপর চড়াও হয়েছে। এরমধ্যেই মহিলাটি পাথরের টুকরো দিয়ে বয়স্ক লোকটার মাথায় এত জোরে আঘাত করল যে, মাথার শক্ত খুলি যে ভেঙে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই রফিকের। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। কিছুক্ষণ তড়পাল। মেয়েটাকে ইশারায় চলে যেতে বলল মহিলাটি। আর নিজে মৃতদেহ নিয়ে বসে রইল মেঝেতে।

মেয়েটা দৌড়াতে শুরু করেছে। তবে উলটোদিকে। সেদিকে কোনো পথ আছে কি না জানা নেই। তাই রফিকের মনে হলো তারও কিছু একটা করা দরকার।

সে আড়াল থেকে বের হয়ে কঙ্কার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

***

আচমকা এরকম কিছুর আশা করেনি কঙ্কা। সামনে জলজ্যান্ত একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। এখানে অন্ধকার তেমন জাঁকিয়ে বসেনি, লোকটাকে দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। দুই হাত দিয়ে এমনভাবে ইশারা করছে যেন কঙ্কা তাকে ভয় না পায়। এই লোকটার পরনে শার্ট, প্যান্ট, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। মাঝবয়সি একজন মানুষ! এই লোক এখানে কী করছে? লোকটাকে দেখে মোটেও ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। তবে কঙ্কা জানে মানুষ কতটা ভয়ংকর হতে পারে। এই গুহায় পা রাখার পর থেকে এখন পর্যন্ত তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

'আমি জানি বের হওয়ার রাস্তা কোনদিকে,' লোকটা নিচু গলায় বলল, 'ঐদিকে গেলে পথ খুঁজে পাওয়া যাবে কি না কে জানে।'

কঙ্কাও সে কথা জানে। এর আগে যখন ঢুকেছিল বেরোনোর পথ খুঁজে পায়নি। এবারও পাবে সে ভরসা কম।

'আপনি কে?'

'আমার নাম রফিক, এর বাইরে আর কোনো পরিচয় না জানলেও চলবে,' লোকটা বলল, 'বিপদগ্রস্ত মানুষ না হলে এখানে কেউ আসে?'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না,' কঙ্কা বলল।

'সেটা আপনার ইচ্ছা, কিন্তু বাইরে আপনার বান্ধবী এখনও হয়তো বেঁচে আছে,' লোকটা বলল, 'আমি সেটা নিশ্চিত জানি না। কিন্তু এখানে থাকলে ওরা যেকোনো সময় চলে আসবে।'

কঙ্কা দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারছে না কী করবে! কোনো কিছুতেই তার এখন বিশ্বাস হয় না। তবে ভাগ্যের জোরে যেহেতু এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে, তাই ঝুঁকি নেওয়াই যায়।

লোকটাকে পথ দেখানোর জন্য ইশারা করল। লোকটা হাঁটতে থাকলে নিরাপদ দূরত্বে থেকে পিছু নিল কঙ্কা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুহা থেকে বেরোনোর পথে চলে এলো।

বাইরে এখনও আলো আছে। লোকটা গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বের হচ্ছে না। কঙ্কা কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

'বের হচ্ছেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

ইশারায় মুখে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বলল লোকটা, কাছে ডাকল। ইচ্ছে না হলেও কৌতূহলের কাছে হার মানল কঙ্কা। লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কিছুটা দূরেই আদ্রিতাকে দেখতে পেল। রক্তাক্ত একটা বঁটি নিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।



ঠিক সময়মতো জেগে উঠতে পেরেছিল আদ্রিতা। না হলে হয়তো তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলত লোকটা। অথচ এখন লোকটার কাটা মুণ্ডু কাদামাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। রক্ত এসে ছিটকে পড়েছে আদ্রিতার চোখে-মুখে। বঁটিটা সময়মতো কাজ করেছে। লোকটার গলা বরাবর এত জোরে আঘাত করেছে যে এক কোপেই ধড় থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেছে।

জীবনে প্রথমবারের মতো এত ভয়ংকর একটা কাজ করেও কোনো আলোড়ন অনুভব করছে না আদ্রিতা। মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক। বেঁচে থাকতে হলে মারতে হবে, নইলে মরতে হবে।

বাকি লোকগুলো এতক্ষণ মং সেনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এখন ওরা এক এক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকেও ওদের রক্তমাখা শরীরগুলো চোখে পড়ছে আদ্রিতার। ভয়ের বদলে রাগ আর ঘৃণার অসম্ভব এক মিশ্র দোলাচল অনুভব করছে। গুহার ভেতর যাওয়া দরকার। কঙ্কার কী অবস্থা কে জানে!

ওরা ওদের সঙ্গীর করুণ অবস্থা দেখতে পেয়েছে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে আদ্রিতার দিকে।

আদ্রিতা এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। পেছনে যে পাহাড়টা সেটা বেশ উঁচু। গুহায় ঢোকার পথ যেহেতু খুঁজে পায়নি, তাই পাহাড়ে উঠা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই সামনে।

আদ্রিতা পিছু হটছে। ওরাও এগোচ্ছে ধীরে ধীরে। ওদের সবার মনোযোগ আদ্রিতার দিকে।

পিছু হটতে হটতেই কাঁধে হাতের স্পর্শ পেল আদ্রিতা। চমকে গিয়ে ঘুরে বঁটি চালাতে গিয়ে থেমে গেল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কঙ্কা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা।

ও এখনও বেঁচে আছে? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না আদ্রিতা।

'তুই শালা অনেকদিন বাঁচবি!' আদ্রিতা বলল।

'আমি বাঁচলে তুইও বাঁচবি,' কঙ্কা বলল।

'কিন্তু বাঁচব কী করে? ওদের দ্যাখ,' আদ্রিতা বলল।

কঙ্কা ওর হাত শক্ত করে ধরল।

দুই শিকারকে একসাথে দেখে ওদেরকে আরও বেশি উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। হাত ধরাধরি করে দুজন দৌড়াতে থাকল। কঙ্কা এক মুহূর্তের জন্য গুহার প্রবেশমুখের দিকে তাকাল। লোকটাকে দেখতে পেল। ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের। স্বার্থপর একটা মানুষ। দুদুটো মেয়ে বিপদে পড়েছে, মরতে চলেছে সেটা দেখেও এগিয়ে আসছে না। হয়তো ওর লক্ষ অন্য কিছু।

দৌড়ে পাহাড়ের উঁচুতে উঠছে দুজনে। ওরাও দৌড়ে আসছে। পাহাড়ের ঢালটা বেয়ে উপরে উঠা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে দুজনের জন্য। হয়তো ওদের জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না। দূরত্ব কমে আসছে দ্রুত।

পাহাড়ের উপরে উঠেই বা কী লাভ! মৃত্যুকে কি এড়াতে পারবে ওরা। এই মানুষের মতো অমানুষগুলো কি কোনোভাবেই ছেড়ে দেবে তাদের। কখনই না। তবু চেষ্টা করা যাক!

ভেজা মাটি পিচ্ছিল, মাঝে মাঝে শক্ত পাথরের টুকরো, এর মাঝে দৌড়াতে গিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছে দুজনে। পেছনে ফিরে তাকাল আদ্রিতা। দেখল ওরা চলে এসেছে পাহাড়ের গোড়ায়। উঠতে শুরু করছে। যে গতিতে উঠে আসছে খুব বেশি সময় লাগবে না।

কঙ্কার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। দুজনের গতিপথ পালটে গেল মুহূর্তেই। দুজন দুদিকে উঠছে। ওরা যেন দুজনকে একসাথে ধরতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা।

ওরাও দুই ভাগ হয়ে গেছে, কঙ্কার পেছনে যাচ্ছে দুজন, আদ্রিতার পেছনে বাকি তিনজন। দৌড়ে ওদের সাথে দুজনের কেউই পারবে না। সেটা দুজনই বুঝতে পারছে। তবে শেষ চেষ্টা না করে কেউ হাল ছাড়বে না।

যে জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছে এরকম জায়গা কেবল কল্পনাই করা যায়। বাস্তবে এত চমৎকার কোনো জায়গা থাকতে পারে তা আদ্রিতার ধারণার বাইরে। বলা যায় পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেছে সে। এখানে জায়গাটা

খানিকটা সমতল। যে প্রান্ত বেয়ে উপরে উঠে এসেছে সে প্রান্ত তুলনামূলকভাবে কম খাড়া। বিপরীত প্রান্তটা একদম খাড়া হয়ে সোজা নিচে নেমে গেছে। পাহাড়ের মাঝবরাবর একটি ঝরনা, সেই ঝরনার পানি পড়ছে নিচে। অনেক নিচে সরু একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। শীতকাল কাছাকাছি বলেই হয়তো ঝরনার পানির গতি বেশ কম। তবে সেই পানি কণা বাতাসে ভেসে উপরে আসছে, তার শীতল স্পর্শে অদ্ভুত একটা ভালো লাগা কাজ করছে। এগিয়ে গিয়ে নিচের অংশটা একঝলক দেখল। এমনিতেই তার উচ্চতা ভীতি আছে। কিন্তু যে বিপদ যাচ্ছে কিছুদিন ধরে তাতে এসব ভীতি এখন আর কাজ করছে না। ভয় পাওয়ার বোধই যেন লোপ পেয়ে গেছে।

আদ্রিতা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। যে তিনজন তার পেছনে আসছিল ওরা যেকোনো সময় চলে আসবে। তারপর কী হবে? ওদের হাতে কোনোমতেই ধরা দেবে না সে। কঙ্কা কোথায়?

কঙ্কার খোঁজে ডানে-বামে তাকাল আদ্রিতা। কিছুটা দূরেই টলতে টলতে কঙ্কাকে আসতে দেখতে পেল। ওর খুব কাছাকাছিই আছে দুজন লোক। যেকোনো সময় ধরে ফেলবে। এত দূর থেকে কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু ওরা দুজন ধরে ফেলার আগেই কঙ্কা পৌঁছে গেল আদ্রিতার কাছে। জড়িয়ে ধরল ওকে।

'এখন?'

'জানি না,' আদ্রিতা বলল কোনোমতে।

তার সাথে কোনো অস্ত্র নেই। উপরে উঠতে গিয়ে হাত থেকে বঁটিটা কখন পড়ে গেছে, সেটা তুলে নেওয়ারও সময় পায়নি। আর তিনজন বর্বরের সাথে একা সে পেরেও উঠত না। কাজেই অস্ত্র থাকা না থাকা একই কথা।

ওরা পাঁচজনই উঠে এসেছে উপরে। একসাথে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে আদ্রিতা আর কঙ্কার দিকে। যেকোনো সময় আক্রমণ করবে। আদ্রিতা উবু হয়ে পায়ের জুতো জোড়া খুলে ফেলল। ওর দেখাদেখি কঙ্কাও তাই করল। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন ওরা।

যেকোনো সময় কিছু একটা ঘটবে।

পাঁচজনের মধ্যে একজন এগোল। লোকটা বাকিদের তুলনায় একটু খাটো, তবে চেহারায় বাকিদের চেয়ে বেশি কুটিলতা, হিংস্রতা ফুটে উঠেছে। এগোচ্ছে কঙ্কার দিকে। কঙ্কা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আদ্রিতার দিকে। ওর হাতেও কিছু নেই। খালি হাতে এই খাটো লোকটার সাথে লড়াই করতে যাওয়ার কোনো মানে নেই। এর চেয়ে...

লোকটা এগিয়ে আসছে। এখন খুব কাছাকাছি। কঙ্কার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আগেই বিকট এক শব্দ হলো কোথাও। সেই শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। কান চেপে বসে পড়ল কঙ্কা, আদ্রিতাও।

দেখল খাটো লোকটা মাটিতে পড়ে গেছে। ঠিক গলার মাঝখান দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। লোকটা ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে নিচে। ওকে থামানোর লক্ষণ কারও মধ্যে দেখা গেল না।

শব্দের উৎসের দিকে তাকাল আদ্রিতা।

দেখল অচেনা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রিভলভার।

লোকটাকে দেখামাত্র কঙ্কা উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখে-মুখে আশা দেখতে পেল আদ্রিতা। সেও উঠে দাঁড়াল। নতুন এই চরিত্রের আবির্ভাব কোত্থেকে হলো সে বুঝতে পারছে না।

'এই লোকটা বাঙালি, নাম রফিক, আমার সাথে গুহার মধ্যে দেখা হয়েছিল,' চাপা গলায় বলল কঙ্কা।

আদ্রিতা কিছু বলার আগেই দেখল বাকি চারজন আদ্রিতা আর কঙ্কার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। ওদের সবার নজর এখন রফিকের দিকে। তবে ওরা কেউই এগোচ্ছে না সেদিকে। একটু আগে তাদের এক সঙ্গীর কী অবস্থা হয়েছে সেটা নিজ চোখে দেখছে।

রিভলভার উঁচিয়ে রফিক খুব সাবধানে এসে দাঁড়াল কঙ্কা আর আদ্রিতার পাশে। কঙ্কা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওকে ইশারায় থামতে বলল।

কড়া দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রফিক। কাজটা ঠিক হয়নি। স্বর্ণমুদ্রা খোঁজা বাদ দিয়ে এই মেয়ে দুটোকে রক্ষা করতে আসা মোটেই ঠিক কাজ হয়নি। বোকারা অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে মরে। সে নিজে বোকা, তাই এই বোকামি করেছে। কিন্তু এখন আর ফেরার পথ নেই। একজনকে পরপারে পাঠিয়েছে, বাকিদের এক এক করে পরপারে পাঠালেই ঝামেলা শেষ। এদের আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। থাকলে এতক্ষণে চলে আসত।

মেয়ে দুটোকে দুপাশে রেখে দাঁড়িয়ে আছে রফিক। রিভলভার তাক করে আছে। সময়মতো রিভলভারটা কাজ করেছে এটাও একটা ভালো দিক। না হলে মেয়েগুলোকে কোনোভাবেই বাঁচানো যেত না।

চারজন হিংস্র, বর্বর লোক এই সময় দৌড় শুরু করল। রিভলভারের ট্রিগার চাপল রফিক।

কাছে থেকে গুলির শব্দ এতটা ভয়াবহ হতে পারে কল্পনাও করতে পারেনি আদ্রিতা। রফিক একের পর এক গুলি করল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল তিনজন লোক পরপর পড়ে গেল মাটিতে। চতুর্থ জন এখনও এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সঙ্গীদের দুরবস্থা দেখেও সে পিছু হটেনি, বরং আরও দৃঢ় সংকল্প চোখে-মুখে। রফিকের দিকে তাকাল আদ্রিতা। বুঝতে পারছে রিভলভারে আর গুলি নেই কিংবা থাকলেও কাজ করছে না। এই চতুর্থ ব্যক্তিকে দূর থেকে ঘায়েল করার কোনো উপায় নেই আর।

লোকটা দৌড়ে এসেই রফিককে দুহাতে ধরে তুলে ফেলল মাটির উপর থেকে। দুহাতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে রফিক। কিন্তু কোনোভাবেই নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। পাশ থেকে আদ্রিতা আর কঙ্কা তাকিয়ে দেখছে শুধু। গুলিতে আহত তিনজনের মধ্যে একজন এখনও এগিয়ে আসছে। আদ্রিতার দিকে।

চতুর্থ লোকটার হাতে-পায়ে আঘাত করে রফিককে নিচে নামানোর চেষ্টা করেও পারল না ওরা দুজন। এরমধ্যে গুলিতে আহত লোকটাও এগিয়ে আসছে। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি অবস্থা। তবু এগিয়ে আসছে। যেন ওদেরকে নিজ হাতে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি পাবে না।

রফিক বেশ কয়েকবার চেষ্টা করল নিজেকে ছাড়ানোর। শেষে হতাশ দৃষ্টিতে তাকাল কঙ্কা আর আদ্রিতার দিকে। এরপর কী হবে বুঝতে পেরে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল আদ্রিতা।

শক্তিশালী লোকটা রফিককে ছুড়ে ফেলে দিল পাহাড়ের উপর থেকে। রফিকের আর্তচিৎকার পাহাড়ে পাক খেতে খেতে হাওয়ায় মিশে গেল। ওদেরকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিতে হলো মানুষটাকে।

আহত লোকটা কঙ্কাকে জড়িয়ে ধরেছে। লোকটার কাঁধে গুলি লেগেছিল, সেখানে অনবরত আঘাত করছিল আদ্রিতা, কঙ্কাকে ছাড়ানোর জন্য। পারছিল না। আহত হিংস্র প্রাণীর মতো ওর একমাত্র লক্ষ্য কঙ্কা। আদ্রিতার আঘাতে ককিয়ে উঠলেও কঙ্কাকে এত শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে আছে যে, কোনোভাবেই ছাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না আদ্রিতার পক্ষে। তবু আদ্রিতা হাল ছাড়ছে না।

আহত লোকটা এখন কঙ্কার গলা টিপে ধরেছে। শ্বাস নিতে পারছে না কঙ্কা। ওর চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। আদ্রিতা চোখের কোণা দিয়ে দেখল যে লোকটা রফিককে ফেলে দিয়েছিল, সে এখন তার দিকে আসছে। সময় বেশি হাতে নেই। যেভাবে কঙ্কার গলা টিপে ধরেছে তাতে যেকোনো সময় মেয়েটা মরে যাবে।

লোকটা এগিয়ে আসছে। আদ্রিতা দেখছে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে কঙ্কা। চিৎকার করে উঠল সে। তাতে আগুয়ান লোকটা একটু দাঁড়াল। যে লোকটা কঙ্কার গলা টিপে ধরে আছে ওর হাতে কামড় বসাল আদ্রিতা। এত জোরে কামড় বসিয়েছে যে কঙ্কার গলা থেকে হাত সরিয়ে দিতে বাধ্য হলো লোকটা। কিন্তু আদ্রিতার কামড় ছাড়াতে পারেনি। পা দিয়ে জোরে লাথি দিল আদ্রিতার পেট বরাবর। এত জোরে পেটে লাথি খেয়ে দম বেরিয়ে যাচ্ছিল আদ্রিতার, কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল সে। এরমধ্যেই সে তার কাজ করে নিয়েছে, তার মুখভরতি এখন ঐ লোকটার হাত থেকে ছিঁড়ে আসা এক টুকরো মাংস। সেটা থু দিয়ে ফেলে দিল আদ্রিতা। তার মুখ এখন রক্তের নোনতা স্বাদে ভরে গেছে। পুরো মুখ ভরে গেছে রক্তে।

আদ্রিতা জানে তাকে এখন মানুষখেকো কোনো জন্তু-জানোয়ারের মতো লাগছে। জানোয়ারের সাথে লড়াই করতে নামলে জানোয়ারই হতে হবে। লোকটা আগেই আহত ছিল, এখন হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে, ককাচ্ছে। সেখান থেকে রক্তের ধারা বেয়ে পুরো হাত ভিজিয়ে দিয়েছে।

কঙ্কা এখনও মাটিতে শুয়ে আছে। গলায় হাত দিয়ে দেখছে, দম নিতে ওর এখনও কষ্ট হচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। অন্য যে লোকটা আসছিল সে আদ্রিতার দিকে না এসে এখন কঙ্কার দিকে যাচ্ছে। অল্প অল্প করে পিছাচ্ছে কঙ্কা। কয়েক ফুট দূরেই পাহাড়ের ঢাল। এই ঢাল বেয়ে পড়ে গেলে বাঁচার আর কোনো উপায় থাকবে না। রফিকের মৃতদেহের সাথে আরেকটা দেহ যোগ হবে।

আদ্রিতা চিৎকার করছে, কিন্তু ওদের দুজনের লক্ষ্যই এখন কঙ্কা। আহত লোকটা আবার কঙ্কার গলা টিপে ধরেছে। অন্য লোকটা ধরেছে কঙ্কার দুই পা। ওদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারছে আদ্রিতা। আগে কঙ্কাকে শেষ করবে। তারপর তার পালা।

কিন্তু এত সহজে হাত মানার পাত্রী নয় আদ্রিতা। রক্তাক্ত মুখে দুহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল সে। চিৎকার করছে শরীরের সব শক্তি দিয়ে।

দৌড়ের গতি বাড়ছে। ওরা দুজনই তাকিয়ে আছে আদ্রিতার দিকে। শুরুতে মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ছিল, কিন্তু সেই হাসি দ্রুতই মুছে গেল ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে।

দুই হাতে দুজনকে ধাক্কা দিল আদ্রিতা। এত জোরে ধাক্কা দিল যে ঘটনার আকস্মিকতায় দুজনের কেউই তাল সামলাতে পারল না। ওদের

হাত থেকে কঙ্কা ছুটে গেল। বাকি তিনজন উঁচু পাহাড়ের ঢাল থেকে দ্রুতগতিতে নিচের দিকে পড়তে থাকল।

তিন তিনটি আর্তচিৎকার পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ভেসে বেড়াতে লাগল। আর তখন দুই হাতে কান চেপে বসে রইল কঙ্কা।



সময় গড়াল অনেক। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তারপর রাত। সেখানেই স্থির বসে আছে কঙ্কা। বেঁচে আছে বিশ্বাস হচ্ছে না এখনও। তাকে বাঁচাতে গিয়ে চোখের সামনেই জীবন দিয়ে দিল আদ্রিতা। অথচ সে কিছুই করতে পারেনি।

লোকালয়ে ফিরবে? কী করবে? কেন বেঁচে থাকবে? কেন বেঁচে থাকতেই হবে? কঙ্কার মাথার ভেতরে হাজার হাজার প্রশ্ন গিজগিজ করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই ঝাঁপ দিতে পাহাড় থেকে। নিচে পড়ে একদম মিশে যেতে এই বুনো পাহাড়ের সাথে। এখানেই তার বন্ধুরা সব মরেছে। সে একা বেঁচে কী করবে? মানুষের মুখোমুখি হবে কী করে? কীভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবে?

এসব ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল কঙ্কা। ঘুম থেকে যখন জেগে উঠল তখনও ভোরের প্রথম আলো ফোটেনি। তবে আকাশের এক কোণায় কমলা রঙের ঝাপসা ছাপ ফুটে উঠছে। যেকোনো সময় সূর্যটা উঁকি দেবে দূর পাহাড়ের গায়ে। হঠাৎ টের পেল কেউ যেন ককাচ্ছে। দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

গুলি খেয়ে যে তিনজন পড়েছিল, তাদের একজন নড়ছে অল্প অল্প করে। প্রায় অন্ধকারেই ধীর পায়ে এগিয়ে গেল কঙ্কা। উবু হয়ে বড় একটা পাথরের টুকরো তুলে নিল। মানুষটা বেঁচে আছে এখনও। অসহায় চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে। এই দৃষ্টিতে তাকালে যে কারও মন আর্দ্র হতে বাধ্য। কিন্তু কঙ্কা এখন এসবের ঊর্ধ্বে।

লোকটার মাথা বরাবর বড় পাথরের টুকরোটা নামিয়ে আনল। খুলি ভাঙার শব্দে অদ্ভুত এক আনন্দ হলো। তার পরের মুহূর্তেই নেতিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখান থেকে আর উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয় তার পক্ষে। উঠে দাঁড়াতে চায়ও না। এখানেই মরতে চায়।

রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় চিৎকার করে উঠল কঙ্কা। সেই চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। চোখ বুজে শুয়ে রইল সে। আকাশে পাক খাচ্ছে কয়েকটা পাখি। শকুন হতে পারে। ঐ শকুনের দল তাকে খুবলে খুবলে খেয়ে যাক। বাধা দেবে না।

হঠাৎ চমকে উঠে বসল কঙ্কা। অস্ফুট কণ্ঠে কেউ যেন ডাকছে তাকে। চারপাশে তাকাল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বচরাচরে জীবিত মানুষ সে একাই। আর কেউ নেই।

অস্ফুট কণ্ঠটা আবার শুনতে পেল। এবার উঠে দাঁড়াল। এই যাত্রায় আসার পর থেকেই অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, এটাও হয়তো সেরকম কিছু। বসে পড়তে যাবে তখন কণ্ঠস্বরটা আবার শুনতে পেল। কেউ যেন অনেক দূর থেকে নাম ধরে ডাকছে তাকে।

কণ্ঠস্বরটা অনেক চেনা, অনেক আপন। কিন্তু...

পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকাল। কণ্ঠস্বরটা ওখান থেকেই আসছে। উঠে দাঁড়াল কঙ্কা, দৌড়ে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের ঢালের অনেক অনেক নিচে হাত-পা ছড়ানো রক্তাক্ত দেহগুলো চোখে পড়ল। এরমধ্যে একটা দেহ আদ্রিতার। বুক ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল কঙ্কা। সব শেষে মনের গহিন কোণে ছোট একটা আশা ছিল। হয়তো আদ্রিতা বেঁচে আছে। হয়তো এখনই তাকে নাম ধরে ডাকবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হওয়ার নয়। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে গেছে মেয়েটা।

আদ্রিতা মরেনি। যতদিন কঙ্কা বেঁচে থাকবে, আদ্রিতাও বেঁচে থাকবে তার সাথে সাথে। স্মৃতি ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে যায়, ম্লান হয়ে যায় প্রিয় মানুষের মুখ। কিন্তু আদ্রিতার মুখ সে কি কোনোদিন ভুলবে? বাকি সব বন্ধুদের?

ঢাকায় যদি কোনোদিন ফিরতে পারে, তাহলে কি এই সব দিনগুলোর কথা ভুলে নতুন করে সব শুরু করতে পারবে?

কঙ্কা জানে না। শুধু এটুকু জানে, আদ্রিতা চেয়েছিল কঙ্কা বেঁচে থাক। তাই সে বেঁচে থাকবে।

ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠল তখন। পাহাড়ের বুকজুড়ে বয়ে যেতে থাকল অদ্ভুত শীতল এক হাওয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামল।

কঙ্কা একা সেই বৃষ্টিতে ভিজতে থাকল। চোখে অশ্রু, তবে বৃষ্টি সেই অশ্রুকে ঢেকে দিয়েছে যেন। বেঁচে ফিরতে পারার আনন্দ, বন্ধুদের হারানোর গ্লানি, হতাশা, রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা আর ভালোবাসা এই বৃষ্টির জলে মিশে যেতে থাকল।



শরীফুল হাসানের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ময়মনসিংহে। ব্রহ্মপুত্রের তীরকে ছোটবেলায় আপন করে নিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে তিনি সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে তিনি একটি স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।
শরীফুল হাসানের প্রথম উপন্যাস 'সাম্ভালা' প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। পরবর্তীতে এই কাহিনির ধারা বজায় রেখে আরও দুটো বই প্রকাশিত হয় এবং সম্পন্ন হয় 'সাম্ভালা' ট্রিলোজি। উক্ত ট্রিলোজি দেশের পাঠকমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'সাম্ভালা' সিরিজের বইগুলো ভারত থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। থ্রিলার এবং ফ্যান্টাসির মাধ্যমে অভিষেক ঘটলেও বর্তমানে শরীফুল হাসান কাজ করছেন বিভিন্ন ধরন ও আঙ্গিকের গল্প নিয়ে। পাঠকমনে সেসব বিশেষ স্থান লাভ করেছে। বাংলাদেশ ছাড়াও শরীফুল হাসানের বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে।

২০১৭-তে "অদ্ভুতুরে বইঘর" বইটির জন্য তাঁকে কালি ও কলম পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বর্তমানে সহধর্মিণী নিপা ইসলাম এবং আদরের কন্যা আরিয়া তাসনিয়া হাসানকে নিয়ে তিনি ঢাকায় বসবাস করছেন। তাঁর বাবা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা মো. আব্দুর রশীদ, মা সেলিনা রশীদ।